পালি সাহিত্যে নারী

ডঃ রাণী-চট্টোপাধ্যায়

এম এ, পি এইচ্-ডি, ডিপ্-ল্যাঙ্গ,

সাহিত্য-ভারতী, কাব্যতীর্থ, স্মৃতি-বিশারদ রচিত

এবং

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন পালি বিভাগীয়-প্রধান ও

অবসরপ্রাপ্ত রীডার ডঃ সুকুমার সেনগুপ্তের

ভূমিকা সম্বলিত।

পুনশ্চ

শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সেরা প্রকাশক

১১৪ এন, ডাঃ সুরেশ চন্দ্র ব্যানার্জী রোড,

কলকাতা-৭০০০ ১০

প্রথম প্রকাশ
বুদ্ধপূর্ণিমা
২৫শে বৈশাখ, ১৩৯৭

প্রকাশক
সন্দীপ নায়ক
পুনশ্চ
১১৪ এন, ডাঃ এস সি ব্যানার্জী রোড
কলকাতা-৭০০০ ১০

মুদ্রাকর
যশোদা মাইতি
লিপি মুদ্রণ
৫২/১ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ
অরুণ চট্টোপাধ্যায়

প্রাপ্তিস্থান
গ্রন্থতীর্থ
৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০ ৭৩

৪০ ০০ টাকা

WOMAN IN PALI LITERATURE

(পালি সাহিত্যে নারী)

Dr. Bani Chatterjee, M A., Ph D, Dip-Lang,
Sahitya-Bharati, Kavyatirtha, Sutta-visarada.

With a foreward by

Dr. Sukumar Sengupta, Sometime Head and (Retd) Reader,
Department of Pali, Calcutta University.

PUNASCHA

New Horizon in Publication world
114 N, Dr. Suresh Chandra Banerjee Road.
Calcutta-7000 10

First Published
Buddha Purnima
9th May, 1990

Published by
Sandip Nayak
114N, Dr S C Banerjee Road
Calcutta-10

Printed by
Lipi Mudran
Joshada Maity
52/1 Sitaram Ghosh Street,
Calcutta-9

Designed by
Arun Chatterjee

Selling Counter
Grantha Tirtha
65/3A, College Street,
Calcutta-700073

Rs 40 00

।। উৎসর্গ পত্র ।।

আমার পরম-পূজনীয় শিক্ষা-গুরু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের অবসর প্রাপ্ত প্রফেসর ও ফ্যাকালটি অব আর্টসের প্রাক্তন ডীন্ এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট ডঃ অনুকূল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধার্ঘ্যের নিদর্শন-স্বরূপ নিবেদন করা হ'ল।

মুখবন্ধ

প্রাচীন ভারতে নারীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা কেমন ছিল, সামাজিক জীবনে কেমন ছিল তাঁদের মান-সম্মান প্রতিষ্ঠা, যশগৌরব ইত্যাদি এবং আধ্যাত্মিক জীবনে তাঁরা কতখানি উন্নত ছিলেন সে সব বিষয়ে আমরা বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যের মাধ্যমে কিছু কিছু ধারণা করতে পারি। বহু কুশলী সাহিত্য-শিল্পী উপোরন্ত সাহিত্যে উল্লিখিত নারীগণের প্রসঙ্গে নিজ নিজ রচনার মাধ্যমে নানা তত্ত্ব ও তথ্য প্রকাশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য—পালিসাহিত্যও প্রাচীন ভারতের নারীদের সম্বন্ধে প্রচুর উপাদান ও উপকরণে সমৃদ্ধশালী এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন ভারতের নারীদের সর্বস্তরের জীবন সম্বন্ধে একখানি সুন্দর, স্বচ্ছ আলেখ্য চিত্রিত করা যায়। ডঃ শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত, ডঃ শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা, ডঃ শ্রী এ এস আলতেকর, আই বি হোরণার প্রভৃতি সুধীবৃন্দ প্রাচীন ভারতীয় নারীজাতি সম্বন্ধীয় কিছু কিছু গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনায় অগ্রসর হয়েছেন এবং তাঁদের রচিত গ্রন্থগুলি যে প্রাচীন ভারতের সামাজিক ইতিহাস চর্চায় বিশেষ প্রয়োজনীয়, উপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকে না।

এই প্রসঙ্গে আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনের একটি প্রবল তৃষ্ণার উল্লেখ করছি, সে তৃষ্ণা হল—জ্ঞানতৃষ্ণা। বালিকা বয়স থেকেই বিদ্যার্জনের দিকে ঝোঁক ছিল, যদিও কৈশোর কালেই আমার বিবাহ হয়, তবুও যখনই যা কিছু শেখার সুযোগ-সুবিধা পেয়েছি সাংসারিক ও সামাজিক সকল দায়-দায়িত্ব যথাসাধ্য পালন করে তা গ্রহণ করার যে চেষ্টা করেছি তার মূলে ছিল আমার স্বামীর সহৃদয়তা। এই তৃষ্ণার তাড়নায় আমার জীবনের এক পরম শুভদিনে (১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩) উপস্থিত হলুম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারে, প্রবেশ করলুম সেই জ্ঞানমন্দিরে—আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকবৃন্দের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ধন্য হলুম। সেই সময়ে পালিবিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন ডঃ শ্রীযুক্ত অনুকূল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্যান্য অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল বড়ুয়া, ডঃ শ্রীযুক্ত হেরম্ব চট্টোপাধ্যায়, ডঃ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি।

আমার মনোগত বাসনা ছিল পালিসাহিত্যের অন্তর্গত উপকরণ নিয়ে প্রাচীন ভারতের নারীগণের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু রচনা লেখার। আমার এই আন্তরিক বাসনা সেইদিন রূপায়িত হবার সুযোগ পেল, যেদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় ডঃ শ্রীঅনুকূল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এবং উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার শ্রদ্ধেয় ডঃ শ্রীসুকুমার সেনগুপ্ত মহাশয় পালি-

সাহিত্যে উল্লিখিত নারীগণের সম্বন্ধে একটি গবেষণামূলক নিবন্ধ রচনা করার জন্য আমাকে নির্দেশ দেন। আনন্দাপ্লুত চিত্তে তাঁদের নির্দেশ শিরোধার্য করে "পালি সাহিত্যে নারী" নামক প্রবন্ধটি লিখতে প্রয়াসী হই।

বক্ষ্যমান নিবন্ধটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত :- প্রথম অধ্যায়ে জায়া, জননী ও কন্যারূপে বৌদ্ধযুগের নারীগণের সামাজিক জীবনচিত্রের ওপর আলোকপাতের প্রয়াস করা হয়েছে এবং কিছু কিছু আলোচনা করা হয়েছে সেই যুগের বিভিন্ন শ্রেণীর নারী, ক্রীতদাসী, নর্তকী ও বারবণিতাদের জীবন ও জীবিকা সম্বন্ধে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বৌদ্ধযুগের নারীদের শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করে হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বৌদ্ধযুগের ধর্মানুরাগিনী নারীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ভিক্ষুণী-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাপর্ব এবং ভিক্ষুণীদের জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে কয়েকজন খ্যাত নাম্নী থেরীর পুণ্যময় জীবনকথা সংক্ষিপ্ত ভাবে বলা হয়েছে এবং পঞ্চম অধ্যায়ে কয়েকজন বিশিষ্টা বৌদ্ধ উপাসিকার জীবনীর ওপর আলোকপাতের চেষ্টা করা হয়েছে।

"পালি সাহিত্যে নারী" নামক নিবন্ধটি রচনায় আমার পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক (অধুনা অবসর প্রাপ্ত) ডঃ শ্রীযুক্ত অনুকূল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নির্দেশ ও উপদেশ দানে আমায় অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেছেন এবং তাঁরই তত্ত্বাবধানে ও পর্যবেক্ষণায় এই গ্রন্থের প্রথম থেকে শেষ অধ্যায় পর্যন্ত রচিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আরও একজন অধ্যাপকের নাম ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করছি—তিনি হলেন পালিবিভাগের রীডার (অধুনা অবসর প্রাপ্ত) শ্রদ্ধেয় ডঃ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনগুপ্ত মহাশয়, যিনি আমার এই নিবন্ধ রচনায় সহৃদয়তার সঙ্গে নানাভাবে আমাকে প্রভূত সাহায্য করেছেন। এর জন্য আমি আমার এই শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকদ্বয়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

পালিবিভাগের সঙ্গে আমার হার্দিক সম্পর্ক আজও নিবিড় ও গভীর আন্তরিকতাপূর্ণ। বর্তমানে এই বিভাগে যাঁরা নিযুক্ত আছেন তাঁরা হলেন—ডঃ শ্রী দীপক কুমার বড়ুয়া (প্রঃ), ডঃ শ্রীমতী আশা দাস (রীডার), ডঃ শ্রীকানাইলাল হাজরা অধ্যাপক প্রধান (রীডার) এবং ডঃ শ্রীমতী বেলা ভট্টাচার্য (লেকচারার), এঁদের কাছে আমি সর্বদা সর্বরকম সহযোগিতা পেয়ে থাকি।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব পালি বিভাগীয় প্রধান ও অবসরপ্রাপ্ত রীডার (Reader) ডঃ সুকুমার সেনগুপ্তের লিখিত মূল্যবান ও তথ্য সমৃদ্ধ ভূমিকা সংযোজিত হওয়ায় এই গ্রন্থের মর্যাদা ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁকে জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। আমার ভ্রাতৃকল্প বন্ধু শ্রী দেবব্রত চক্রবর্তীর কাছ থেকে এই গবেষণা-গ্রন্থের ব্যাপারে অনেক প্রকার সাহায্য পেয়েছি। তাঁকেও জানাই আমার আন্তরিকতা-পূর্ণ স্নেহ ও শুভেচ্ছা।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আমার শুভানুধ্যায়ী পুত্রপ্রতিম শ্রী শ্যামল রায় এই গ্রন্থের মুদ্রণ থেকে আরম্ভ করে পাণ্ডুলিপি সংশোধন ও সূচিবিন্যাস প্রভৃতি সকল প্রকার দায়দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তাঁর উৎসাহ ও নিঃস্বার্থ সাহায্যের জন্য গ্রন্থটির মুদ্রণ ও প্রকাশনা সম্ভব হয়েছে। তাঁকে আমার শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জানাচ্ছি। এই সুযোগে শ্রীমান বরুণ কুমার পাল ও শ্রীমতী লিপিকা পালকেও আমার ধন্যবাদ ও আশীর্বাদ বর্ষণ করছি, কারণ তারাও এই গ্রন্থপ্রণয়নে আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ ও সাহায্য দান করেছে।

'গ্রন্থতীর্থের' স্বত্বাধিকারী শ্রীশঙ্করী ভূষণ নায়ক ও শ্রীসন্দীপ নায়ককেও আমার অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাঁদের সহযোগিতা, উৎসাহ ও প্রচেষ্টার ফলে আমার এই গ্রন্থখানি প্রকাশের আলোকে আনা সম্ভব হয়েছে।

৬১-এল / ৪, ডক্টর এস সি ব্যানার্জি রোড,
কলিকাতা-৭০০০ ১০
২৬ শে বৈশাখ, ১৩৯৭,
বুদ্ধপূর্ণিমা,
ইং ৯ই মে, ১৯৯০।

ডঃ বাণী চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

ভূমিকা

আমার ছাত্রী ডঃ বাণী চট্টোপাধ্যায় তাঁর "পালি সাহিত্যে নারী" শীর্ষক গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেছেন। এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও মনোরঞ্জক। আমার কিছু লেখা এই গ্রন্থের সহিত সংশ্লিষ্ট হবার সুযোগ লাভ করে আমি তাঁর প্রস্তাবে আনন্দে সম্মতি দিলাম এবং আমার লেখা শুরু করলাম। ভূমিকা লেখার পূর্বে এই গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করে আমার মনে হ'ল যে এই গ্রন্থের সহিত আরও কিছু অতিরিক্ত তথ্য বিভিন্ন দিক্ থেকে আলোচনার মধ্যে সংযোজন করবার অবকাশ রয়েছে, যেগুলি পাঠক-পাঠিকাদের পক্ষে খুবই উপযোগী। এগুলি স্বল্পপরিসর কয়েক পাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নয়; তাই এই ভূমিকার কলেবর কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হয়ে পড়েছে।

কন্যাসন্তানের জন্ম ঃ

প্রাচীন ভারতে কন্যাসন্তানের জন্মকে যে শুভাগমনের বিষয় বলে গণ্য করা হত না, এই চিরন্তন সত্য বৌদ্ধ সাহিত্যেও স্বীকৃত। কোসল সংযুক্ত (সংযুক্ত নিকায়, ১ম খণ্ড; Kindred Sayings, Vol I p 111) থেকে জানা যায় যে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ "রাজমহিষী মল্লিকাদেবী এক কন্যা সন্তান প্রসব করেছেন" এই সংবাদ শুনে বিমর্ষচিত্ত হয়ে পড়েন। বুদ্ধ জানতে পেরে রাজ সমীপে উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে নানাকথায় সান্ত্বনা দিলেন—"কন্যাসন্তানের জন্ম হেতু কারও দুঃখ পাওয়া উচিত না; কন্যা যদি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন, ধর্মপ্রাণ এবং স্বামী ও শাশুড়ীর প্রতি শ্রদ্ধাশীলা হয়, তাহলে কন্যাসন্তান ও পুত্রাপেক্ষা শ্রেয়সী হবার যোগ্যতা রাখে; এমন কি এই কন্যাসন্তান রত্নগর্ভা হতে পারে; তার গর্ভজাত পুত্রসন্তান ভবিষ্যতে মহৎ কার্য সম্পন্ন করতে পারে এবং সুবিশাল রাজ্যের অধীশ্বর হতে পারে"। ভগবান বুদ্ধের বাণী শুনে প্রসেনজিৎ নতুন আশার আলোকে উদ্ভাসিত হলেন। অবদানশতকের একটি কাহিনীতে দেখা যায় যে, রোহিণ নামক এক ধনী বিত্তশালী শাক্য নিঃসন্তান ছিলেন। পুত্রই হোক বা কন্যাই হোক যে কোন প্রকার সন্তানাকাঙ্ক্ষায় বিভিন্ন দেবতার পূজো ও আরাধনা করতে আরম্ভ করলেন সন্তান লাভের জন্য। অতঃপর তাঁর সহধর্মিণী অপূর্ব সুন্দরী শুভ্রবস্ত্র-পরিহিতা এক কন্যা প্রসব করলেন; রোহিণ প্রথমে কন্যাসন্তানের জন্ম হেতু ক্ষোভে ফেটে পড়লেন; অবশ্য তারপর কন্যার অলৌকিক রূপসৌন্দর্য ও শুভ্র-বস্ত্রপরিধান লক্ষ্য করে মুগ্ধ ও বিস্ময়াপন্ন হলেন (শুক্লা-অবদান)।

কট্ঠহারি জাতকে দেখা যায় বারণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত গান্ধর্বমতে এক কাষ্ঠহারিণীকে বিবাহ করেন; এই রমণীকে গর্ভবতী জেনে বিদায় নেবার প্রাক্কালে স্বনামাঙ্কিত একটী অঙ্গুরী দিয়ে বলেছিলেন—"যদি কন্যা প্রসব কর, তবে এটা বিক্রী করে সন্তানটীর ভরণ-পোষণ করবে; আর যদি পুত্র প্রসব কর, তবে তাকে অঙ্গুরীসহ আমার কাছে নিয়ে আসবে"। উদ্দালক জাতকেও (সংখ্যা ৪৮৭) এই উক্তিরই অনুরণন শোনা যায় এক ব্রাহ্মণ রাজপুরোহিতের কণ্ঠে। এই দুইটী জাতকে পুত্র ও কন্যাসন্তানের মধ্যে পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। চেতিয় জাতকের (৪২২) বর্ণনানুযায়ী মহাপুরোহিত কপিল চেতিরাজ অপচরকে তার মিথ্যাভাষণের জন্য অভিসম্পাত ও ভীতিপ্রদর্শন সূচক কথা প্রকাশ করেন কতকগুলি গাথার মাধ্যমে। একটী গাথার বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হল :—

"জানি শুনি যেই জন, করে অবিচার, পুত্র না জন্মিবা শুধু কন্যা জন্মে তার।
সত্য যদি বল, তবে পাইবে আবার সমস্ত ঐশ্বর্য, পূর্বে যা ছিল তোমার।"

"থিয়ো তস্স পজায়ন্তি, ন পুমা জায়রে কুলে" (পুত্র না জন্মিয়া শুধু কন্যা জন্মে তার)—এই বাক্যাংশটির ভাবার্থ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সাধারণতঃ লোকেরা কন্যাজন্মকে অবাঞ্ছনীয় ও দুর্ভাগ্যজনক বলে মনে করতেন।

যদিও তখনকার দিনে সকলেই পুত্র কামনা করতেন। তথাপি কন্যা সন্তান জন্মালে তাকে অবহেলা বা অবজ্ঞার চক্ষে দেখা হতনা। বাস্তব সত্যের দিক দিয়ে বিচার করলে বলতে হয় পুত্র-কন্যা নির্বিশেষে সকল সন্তান সমান স্নেহ-যত্নাদরে মাতা-পিতা কর্তৃক লালিত-পালিত হোত। অবদান শতকের (সুপ্রিয়া অবদান, সংখ্যা ৭২) একটা কাহিনীতে দেখা যায় শ্রাবস্তীর অনাথপিণ্ডদ গৃহপতির একটী কন্যা সন্তান জন্ম নিলে পরিবারবর্গ সকল লোক এমনকি সকল শ্রাবস্তীবাসীদের কাছেও ইহা আনন্দের কারণ হয়ে উঠেছিল। এই মেয়েটি যেহেতু সকলের প্রিয় ছিল, তাই এর নাম রাখা হয়েছিল সুপ্রিয়া।

নগরশোভিনী বা বারবণিতা রমণীগণ কন্যাসন্তানই (পুত্র নয়) কামনা করতেন এবং কন্যাসন্তান জন্মালে তাদেরকে স্নেহ-যত্নাদি দিয়ে লালন পালন করতেন, কারণ মেয়ে-সন্তানই ভবিষ্যতে তাঁদের চিরাচরিত বৃত্তি রক্ষা করে উপার্জনের পথ সুগম করবে। "নগরসোভিনিয়ো হি ধীতরং পটিজগ্গন্তি, ন পুত্তং। ধীতরা হি তাসং পবেণি ঘাটীয়তি" (ধম্মপদ-ট্ঠকথা, ১ম খণ্ড, উদেন বত্থু, পৃঃ১৭৪)।

কন্যাসন্তান ও যে ভ্রাতার অবর্তমানে সমস্ত পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় থেরী গাথার (সংখ্যা ৬৯) বর্ণিত সুন্দরী থেরীর জীবন-বৃত্তান্ত থেকে। সুন্দরীর ভ্রাতার মৃত্যুর পর তাঁর পিতা সুজাত বৌদ্ধসংঘে ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করেন। সুতরাং তাঁর কন্যা সুন্দরী পিতার ভূসম্পত্তি

ও ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারিণী (দায়াদ) হন। তাঁর মাতা কন্যাকে ভিক্ষুণীধর্ম গ্রহণ না করে বিবাহ করে বিরাট সম্পত্তি ও ঐশ্বর্য ভোগ ও সুখে সংসারজীবন নির্বাহ করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু সুন্দরীর ভোগসম্পত্তি ও সংসারজীবনের প্রতি কোন আকর্ষণ ছিলনা; সন্ন্যাসধর্মই শ্রেয়ঃ মনে করে সুন্দরী ভিক্ষুণী-সংঘে প্রবেশ করেন।

কন্যার বিবাহের পূর্বে মাতাপিতার দায়িত্ব ঃ

নারীদের চারিত্রিক শুচিতা ও সতীত্ব ছিল ভারতীয় সমাজের চিরন্তন আদর্শ। বিবাহের পূর্বে যৌবনে পদার্পণ করলে মাতা-পিতা বা অন্যান্য অভিভাবকবৃন্দ কুমারী কন্যাদের ওপর সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। রাজগৃহের জনৈক শ্রেষ্ঠীকন্যা সুন্দর—কুণ্ডলকেসী ১৬ বৎসর পর্যন্ত অবিবাহিত ছিল এবং তার বসবাসের ব্যাপারে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া হোত, কারণ এই বয়সে মেয়েরা পুরুষের সঙ্গলাভের জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে (পুরিসলোলা হোন্তি পুরিসজ্ঝাসয়া —ধম্মপদট্ঠকথা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৭)। পানিক (সংখ্যা-১০২) এবং সেগ্গু (২১৭) জাতক দুইটি থেকে জানা যায় যে তৎকালে কন্যাকে সৎপাত্রে অর্পণ করবার পূর্বে কন্যা কুমারীধর্ম রক্ষা করিতেছে কিনা অর্থাৎ কুমারীর চরিত্রগত শৈথিল্য আছে কিনা এবিষয়ে পিতা নিজে কন্যার চরিত্র পরীক্ষা করে দেখতে কোন কুণ্ঠা বোধ করতেন না, কারণ কুমারীরা যদি অসতী হয়, তাহলে স্বামিঘরে গিয়ে মাতাপিতার লজ্জার কারণ হয়ে থাকে।

বিসাখার উক্তি থেকে (ধম্মপদট্ঠকথা—বিসাখায় বত্থু) স্পষ্ট বোঝা যায় যে মা-বাবারা বিবাহের পূর্বে কন্যাদের দৈহিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির দিকে যথেষ্ট নজর দিতেন। তারা তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুষ্ঠুভাবে সংস্থাপন করে সুশ্রী ও সুঠাম দৈহিক গঠন প্রস্তুতির চেষ্টা করতেন, কারণ মেয়েরা পরকুলে প্রেরণযোগ্য তৈরী করা বিক্রেয় পণ্যদ্রব্যবিশেষ।

মনোমত পতি লাভের আশায় মেয়েরা যে কত রকমের কষ্ট স্বীকার করতেন, তার কিছুটা আভাস বেস্সন্তর জাতকের একটি গাথায় পাওয়া যায় ঃ—

“লভিতে মনের মত পতি কুমারীরা
কতই না করে কষ্ট। থাকে উপবাসী,
করিতে নিতম্বদেশ বিশাল নিজের
মর্দন গোহনুদ্বারা করে কটি তারা”—
(ঈশান ঘোষ, বিশ্বন্তর জাতক,
বঙ্গানুবাদ, সংখ্যা ৫৪৭)

এই জাতকের (সংখ্যা ৫৪৭) আর একটি অংশ থেকে জানা যায়, যে কলিঙ্গদেশের

দুর্নিরিক্ত নামক ব্রাহ্মণগ্রামে জম্বুক নামক এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করতেন, তিনি অদিত্তভাপনা-নাম্নী এক যুবতী কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। গ্রাম প্রতিবেশিনীরা এই তরুণী ভার্যার বৃদ্ধের ভর্তার কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে মা-বাবা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের ওপর দোষারোপ করছেন, কারণ এরা ছিলেন এবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। প্রতিবেশিনী মেয়েরা অদিত্তভাপনাকে পরিহাসচ্ছলে যে সব কথা শুনিয়েছিলেন, তা থেকে জানা যাচ্ছে যে কুমারী মেয়েরা মনোমত পতি লাভ করার জন্য নদী তীরবর্তী একপ্রকার যাগের অনুষ্ঠান হত; তাতে যে পিণ্ড দেওয়া হত উহা গ্রহণের জন্য সর্বপ্রথম যদি কোন বৃদ্ধ কাক ঠোকর মারত, তবে তারা আশঙ্কা করত যে, যে মেয়ের উদ্দেশ্যে এই যাগের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তার ভাগ্যে বৃদ্ধ পতি জুটবে; এছাড়া অগ্নিহোত্রাদি আরও যে সব যজ্ঞের ব্যবস্থা হত, এগুলির কোনটিই অদিত্তভাপনার ক্ষেত্রে সুসম্পন্ন না হওয়াতে সুন্দরী যুবতী অদিত্তভাপনার বৃদ্ধ বরের সাথে বিবাহ হয়েছে।

কোন রাজ্যে মেয়েদের যোগ্য বয়সে বিবাহ না হলে, সাধারণ লোকের কাছে রাজাই দায়ী এবং দোষভাগী হতেন। কাম্পিল্য রাজ্যের অভিভাবকহীনা কোন দরিদ্র বৃদ্ধাকে প্রাপ্তবয়স্কা দুইটি কুমারী কন্যা রক্ষা করতে হত। একদিন এই বৃদ্ধা নারী অভিশপ্তা কুমারী দুইটির বর না জোটায় রাজার মরণ কামনা করেন—

"কদাস্তু নাম অহং রাজা ব্রহ্মদত্তো মরিস্সতি
যস্স রট্ঠস্মিং জীরন্তি অপতিকা কুমারিকা।"
(জাতক সংখ্যা ৫২০ গণ্ডতিন্দু জাতক)

"—ঘরে ঘরে রক্ষক হবেন রাজন, রাজ্যে যার কুমারীর বিবাহ না হয়?"
(ঈশান ঘোষ, জাঃ ৫ষ্ঠ খণ্ড, পৃ ৬২)

নারীরা বিবাহযোগ্য বয়স মাত্র ছাড়িয়ে বেশী বড় হয়ে গেলে, সাধারণ লোক বা আত্মীয়স্বজনের কাছে উপহাস, অপবাদ বা কৃপার পাত্রী হিসেবে গণ্য হতে থাকে। এই বাস্তব সত্য বোধ হয় উপলব্ধি করতে পেরেছিল এক নিষ্ঠুর শ্রেষ্ঠিদুহিতা, যিনি এক ভণ্ড তপস্বীর দ্বারা লাঞ্ছিতা হন আহারের অপরাধে। অভিশপ্ত নারীজাতির দুঃখ সত্যের বেগে বলে এই শ্রেষ্ঠিকন্যা তপস্বীকে নিম্নলিখিত শাপবাণী শুনালেন—ঃ

"বয়স হবে বিশ, পঁচিশ বা উনত্রিশ বছর,
তবু ভাগ্যে জুটবে না বর মনের মতন বর;
বৃদ্ধা কালেও অবিবাহিতা নারী মরবে না তাহার
অবগুণ্ঠন যে পোড়ামুখী রেখেছে তোমার"।
(ঈশান ঘোষ, জাতক ৩৪৫, ... জাঃ পৃঃ ৮২)

এই শপথবাণীর ভঙ্গি ও মর্ম বুঝতে পেরে সন্তুষ্ট চিত্তে মেয়েটিকে শেষ পর্যন্ত তপস্বী মুক্তি দিলেন।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিতা-মাতা পাত্র পছন্দ করে মেয়ের বিয়ে দিতেন। পাত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, শিল্পজ্ঞান ও অন্যান্য গুণাবলীর দিকে লক্ষ্য রেখে সৎপাত্র নির্বাচন করতেন। কোন এক ব্রাহ্মণের চার কন্যার জন্য চারজন বিবাহার্থী হয়েছিল। এদের মধ্যে যে সচ্চরিত্র ও শীলবান তাকেই সর্বাপেক্ষা সুপাত্র মনে করে ঐ ব্রাহ্মণ সেই একজন পাত্রকেই চারি কন্যা সম্প্রদান করেন (সাধুশীল জাতক, সংখ্যা ২০০)। কাশীরাজ্যের কোন এক গ্রামের রাজানুগ্রহপ্রাপ্ত প্রধান কর্মকারের এক পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল; ঐ গ্রামের আর এক দরিদ্র কর্মকারপুত্রের অপূর্ব সূচীশিল্প—নৈপুণ্য পর্যবেক্ষণ করে তাকেই উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করে প্রধান কর্মকার তার হাতে নিজের কন্যাটিকে সমর্পণ করেন (সূচী জাতক সংখ্যা ৩৮৭)। দণ্ডপাণি শাক্য ও পরীক্ষাকালীন সিদ্ধার্থের (সর্বার্থ সিদ্ধার্থের) অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের সম্যক্ পরিচয় পেয়ে তাঁর হাতে স্বীয় কন্যা গোপাকে সমর্পণ করেন (ললিত বিস্তর)।

উপযুক্ত শিষ্যকে আচার্যের কন্যা সম্প্রদান :

তখনকার দিনে বারাণসী-তক্ষশিলায় স্থিত চতুষ্পাঠীর আচার্যগণ সময় সময় নিজেদের শিষ্যদের মধ্য থেকে উপযুক্ত পাত্র মনোনীত করে তাকেই কন্যা সম্প্রদান করতেন। বারাণসীর এক সুবিখ্যাত আচার্য শিষ্যদের চরিত্র পরীক্ষা করবার উপায় স্বরূপ কন্যার বিবাহের প্রয়োজনে বস্ত্রালঙ্কার চুরি করবার জন্য শিষ্যদের উৎসাহ দান করেন। আচার্যের নির্দেশে অনেক শিষ্য গোপনে বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্রব্য অপহরণ করে নিয়ে আসে। কিন্তু কেবল একটি মাত্র চরিত্রবান ছাত্র আচার্যের জন্য কিছুই আনেনি, কেননা কোন পাপানুষ্ঠান গোপন রাখা যায় না। এইরূপ কৌশলপূর্ণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় ঐ শীলবান শিষ্যকেই আচার্য নিজের কন্যা সম্প্রদান করেন এবং অন্যান্য ছাত্রগণকে অপহৃত দ্রব্যসম্ভার যথাযথ গৃহে ফিরিয়ে দেবার নির্দেশ দেন (জাতক, সংখ্যা ৩০৫)

কিন্তু কোন কোন বিবাহের পরিণাম পরবর্তী দাম্পত্য জীবনে অমঙ্গলের কারণ স্বরূপ হয়ে উঠত। মিথিলাবাসী পিঙ্গুত্তর নামক জনৈক মেধাবী মাণবক (ছাত্র) তক্ষশিলায় গিয়ে কোন এক সুবিখ্যাত আচার্যের নিকট অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ত করে আচার্যের নিকট বিদায় প্রার্থনা করে। ঐ আচার্যকুলের রীতি ছিল যে কোন কুমারী যৌবনে পদার্পণ করলে চতুষ্পাঠীর সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্রের সহিত তার বিবাহ দেওয়া হোত। আচার্যের অনুরোধে পিঙ্গুত্তর অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁর কন্যাকে বিবাহ করে। এই ছাত্রটি মেধাবী হলেও অত্যন্ত হতভাগ্য ও

অলক্ষ্মীবান্ ছিল। বিদায় নেবার পর স্বামী-স্ত্রী উভয় মিথিলার দিকে যাত্রা করল। কি শ্বশুরবাড়ীতে কি যাত্রাপথে পিঙ্গুত্তর পত্নীর সহিত অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করল। ক্ষুধার্ত পিঙ্গুত্তর নগরের অদূরে স্থিত ফলবান উদুম্বর বৃক্ষে উঠে ফল খেতে আরম্ভ করল; কিন্তু ক্ষুধায় কাতর হয়েও স্বামীর কাছ থেকে একটি ফলও না পেয়ে অতিকষ্টে বৃক্ষে উঠে মেয়েটি ফল খেতে লাগল। তাড়াতাড়ি করে পিঙ্গুত্তর গাছ থেকে নেমে গাছটার চারিদিকে কাঁটার বেড়া দিল, যাতে তার স্ত্রী গাছ থেকে নামতে না পারে। স্ত্রীর হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য শেষ পর্যন্ত সে পালিয়ে গেল। মিথিলারাজ নগরে ফিরবার সময় মেয়েটিকে তদবস্থায় দেখে কুলদত্ত স্বামীর পরিত্যাগের কথা জানতে পেরে মেয়েটিকে নামিয়ে হস্তিপৃষ্ঠে তুলে নিলেন। রাজা তাঁকে প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে তাঁকে অগ্রমহিষীপদে অভিষিক্ত করলেন। উদুম্বর বৃক্ষের সঙ্গে সংযোগ রেখে তাঁর নাম রাখলেন "উদুম্বরা"। ভাগ্যের কি বিড়ম্বনা! পিঙ্গুত্তর মেধাবী ছাত্র হয়েও ভাগ্যহীন ও অলক্ষ্মীবান। লক্ষ্মীর সঙ্গে অলক্ষ্মীর মিলন না হওয়ায় অবশেষে পিঙ্গুত্তর রাস্তাঘাটের কাজে নিযুক্ত হয়ে পড়ল। (মহা-উম্মগ্গ জাতক, সংখ্যা ৫৪৬)

আর এক সময় বারাণসীবাসী এক ব্রাহ্মণকুমার তক্ষশিলায় গিয়ে শিল্পপারদর্শী আচার্যের নিকট ধনুর্বিদ্যায় নৈপুণ্য লাভ করে "চুল্লধনুগ্গহ পণ্ডিত" নামে পরিচিত হয়। আচার্য তাকে নিজের সমতুল্য সর্বশিল্পে সুপণ্ডিত মনে করে তারই হাতে নিজের কন্যাকে সমর্পণ করেন। চুল্লধনুগ্গহ পত্নীসহ বারাণসীতে প্রত্যাবর্তন কালে যাত্রাপথে এক দস্যুদলের পাল্লায় পড়ে যায়। ক্রমশঃ দুশ্চরিত্রা আচার্য-কন্যা দস্যুদলপতির রূপে আকৃষ্ট হয়ে তার প্রতি অনুরাগিনী হয়ে পড়ে এবং দস্যুদলপতি এই অসতী রমণীর সাহায্যে তার স্বামী চুল্লধনুগ্গহের প্রাণনাশ করে। (চুল্লধনুগ্গহ জাতক, সং ৩৭৪)।

বিবাহের বয়স ঃ

সাধারণতঃ মেয়েরা যৌবনোদয়কাল পর্যন্ত অবিবাহিত অবস্থায় পিতৃগৃহে থাকতেন (জাতক সংখ্যা ১০২, ১২৬, ২১৭, ২৬২)। মালাকার কন্যা মল্লিকা (জাঃ সংখ্যা ৪১৫), এবং মহানামাশাক্যের কন্যা বাসভক্ষত্রিয়া (জাঃ সংখ্যা ৪৬৫), ষোল বৎসর পর্যন্ত অবিবাহিতা ছিলেন, মিগার-শ্রেষ্ঠীর কন্যা বিশাখাও পনর-ষোল বৎসর পর্যন্ত অবিবাহিতা অবস্থায় পিতৃগৃহে ছিলেন (ধম্মপদট্ঠকথা-বিসাখায় বত্থু)। বৌদ্ধসাহিত্যের তথ্যগত আভাস ইঙ্গিতে মনে হয় যে ষোল কিম্বা এর কিছু ঊর্ধ্ব বয়সটাই বিবাহযোগ্য বয়স হিসেবে গণ্য করা হত। তবে বাল্যবিবাহও যে প্রচলিত ছিল, এর প্রমাণ, অল্পসংখ্যক হলেও, বিভিন্ন পালি গ্রন্থে ছড়িয়ে রয়েছে। অঙ্গুত্তর নিকায়ের (২য় খণ্ড) এক স্থানে দেখা যায় যে কোন এক

উপলক্ষ্যে নকুলপিতা বুদ্ধকে বলেছিলেন যে তাঁর যখন বিবাহ হয়, তখন নকুল-মাতা ছিলেন একটি নিতান্ত শিশু। কন্‌হদীপায়ন জাতকে উল্লিখিত মাণ্ডব্য ও তাঁর স্ত্রীর কথোপকথনের একটি ক্ষুদ্র অংশ থেকে ও প্রায় অনুরূপ ধারণাই করা যায়। মাণ্ডব্য তাঁর স্ত্রীকে প্রসঙ্গক্রমে বলছেন :—

"হয় নাই জ্ঞানোদয় এমনি বয়সে তুমি
পিতৃগৃহ হতে হেথা এলে"

জাতক, ৪র্থ খণ্ড সংখ্যা ৪৪৪, পৃ ৩৫)।

অল্পবয়সে যে মেয়েদের বিবাহ দেওয়া হোত, এর কিছুটা সংকেত রয়েছে ভিক্ষুণী-প্রাতিমোক্ষের অন্তর্গত দুটী পাচিত্তির বিধানের মধ্যে। (৬৫ ও ৬৬ সংখ্যক পাচিত্তিয়ে বিধান অনুযায়ী 'যিনি এগার বছর এবং পূর্ণ বার বছর বয়স্ক 'গিহিগত' মেয়েকে উপসম্পদা দান করিবে তার প্রায়শ্চিত্তিক ধর্ম'। টীকাকারের ব্যাখ্যা অনুসারে 'গিহিগত' শব্দটির দ্বারা মনে হয় গৃহস্থ বালিকা বধূই সূচিত হচ্ছে [বিনয় পিটকম্, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ৩২১-৩২৩)।

মিলিন্দপ্রশ্নের (পৃ ৪৭-৪৮) একটি খণ্ডিতাংশে দেখা যায়— "কোন এক ব্যক্তি বিবাহ নিমিত্ত অগ্রিম অর্থ দিয়ে (সুঙ্কং দত্বা) একটি ছোট বালিকাকে (দহরিং দারিকং) নির্বাচন করে চলে যায় ; ক্রমশঃ ঐ বালিকাটি বয়ঃপ্রাপ্তা হলে পাত্রীপক্ষকে শুল্ক বা পণ দিয়ে অপর এক ব্যক্তি যুবতী অবস্থায় ঐ মেয়েটির সঙ্গেই পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়।" উপমার এই অংশটুকু প্রাচীন ভারতে বাল্য বিবাহ ও আসুর বিবাহের প্রচলন সম্বন্ধে বেশ কিছু সংবাদ বহন করছে। আসুর বিবাহের (Marriage by Purchase, অর্থাৎ কন্যাপক্ষকে শুল্ক বা কন্যার মূল্যস্বরূপ অর্থ দিয়ে কন্যা ক্রয় করে যে বিবাহ পদ্ধতি) প্রচলন সম্বন্ধে কিছু তথ্য কয়েকটি জাতকে পাওয়া যায়। "কীতো ধনেন বহুনা" (জাতক ২১৯), "ভরিযা যাপি ধনেন হোতি কীতা" (জাতক ৪৫৮), "যা চ ভরিযা ধনক্কীতা" (জাতক ৫৩০) প্রভৃতি বাক্যাংশগুলির দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয় যে তৎকালে লোকেরা অর্থের বিনিময়ে পাত্রী সংগ্রহ করতেন।

বহুবিবাহ (Polygamy) ঃ

একজন মাত্র স্ত্রী গ্রহণই ছিল তৎকালীন সমাজের সাধারণ নিয়ম ; অনেকেই বোধ হয় একপত্নীত্ব-নীতিই (monogamy) মেনে চলতেন। তবে রাজকুলে, সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ, সম্পন্ন শ্রেষ্ঠী অভিজাত সম্প্রদায়ের জনসমাজে যে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল তার দৃষ্টান্ত বৌদ্ধ সাহিত্যে সুপ্রচুর। বহুপত্নী থাকাটা রাজাদের তখনকার দিনে রীতি ও গৌরব ছিল। কোন কোন জাতকে রাজার অতিরঞ্জিত সংখ্যা ষোলহাজার পত্নীর উল্লেখ দেখা যায় (সংখ্যা ৪৬১ ; ৫৩১ জাঃ)। অনেক

সময় রাজারা খেয়ালখুশিমতো জাতি-কুল-মানের দিকে লক্ষ্য না করে বিয়ে করে বসতেন। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ শ্রাবস্তীবাসী কোন মালাকারের মল্লিকা নাম্নী পরমাসুন্দরী কন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিবাহ করেন এবং অগ্রমহিষী পদে প্রতিষ্ঠিত করেন (জাঃ সং ৪১৫)। বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত একবার ফলপুষ্পাদি আহরণের জন্য উদ্যানে বিচরণ করতে করতে এক সুন্দরী কাষ্ঠহারিণীর রূপে মুগ্ধ হয়ে গান্ধর্ববিধানে তাঁকে বিবাহ করেন এবং কিছুকাল পরে এই রমণী রাজমহিষী পদে অধিষ্ঠিতা হন (কাষ্ঠহারি জাতক, সংখ্যা ৭)। আর এক হীনবেশা স্থূলাঙ্গী রমণী গৃহস্থবাড়িতে কাজকর্ম সেরে রাজপ্রাঙ্গণ সমীপে স্ত্রীসুলভ লজ্জাশীলতা দেখিয়ে নিমেষের মধ্যে মলত্যাগ কার্য শেষ করে উঠে দাঁড়াতে রাজার নজরে পড়ে যায়। বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত এই মহিলাটিকে নীরোগ, স্বাস্থ্যবতী, লজ্জাশীলা মনে করে বিবাহ করেন এবং অগ্রমহিষীপদে প্রতিষ্ঠিত করেন (বাহ্য জাতক, সংখ্যা ১০৮)। আর এক সময় বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত সুজাতা নামক এক পরমা সুন্দরী ও তরুণ যৌবনসম্পন্না (ফুল বিক্রয় করবার সময়) পর্ণিককন্যার দূর থেকে কেবলমাত্র গলার আওয়াজ শুনেই তার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ইঁহাকে নিজের অগ্রমহিষীর পদে বরণ করেন (সুজাতা জাতক, সংখ্যা ৩০৬)।

পালি সাহিত্যে মল্লিকা ছাড়া প্রসেনজিতের আরও কয়েক ভার্যার নামোল্লেখ রয়েছে, যথা,—উব্বিরী (শ্রাবস্তীর এক ধনী নাগরিকের কন্যা-(থেরীগাথা; থেরীগাথা ভাষ্য [1], সোমা ও সকুলা (দুই ভগিনী-মজ্‌ঝিম নিকায়, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২৫), বাসভা (মজ্‌ঝিম, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১০) বা বাসভখত্তিয়া (মহানাম শাক্যের নাগমুণ্ডা নাম্নী দাসীর গর্ভজাতা কন্যা—কটঠহারী ও ভদ্দশাল জাতক)। ধম্মপদট্‌ঠকথার অন্তর্গত বিশাখা-বত্থু থেকে জানা যায় যে বিম্বিসার ও প্রসেনজিৎ-এই দুই রাজার মধ্যে পারস্পরিক ভগ্নীপতির সম্পর্ক ছিল; সুতরাং অনুমান করা যায় যে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ মগধের রাজকন্যাকেও বিবাহ করেছিলেন।

বৎসরাজ উদয়নেরও একাধিক রাণী ছিল—যথা (১) বাসুলদত্তা বা বাসবদত্তা (অবন্তীরাজ চণ্ডপ্রদ্যোতের কন্যা), (২) মাগন্দিয়া (কুরুরাজ্যের কোন এক ব্রাহ্মণ কন্যা), (৩) সামাবতী (শ্রেষ্ঠী ঘোসকের পালিতা কন্যা—ধম্মপদট্‌ঠকথা, ১ম খণ্ড, উদেন বত্থু); দিব্যাবদানে (পৃঃ ৫১৫) মাগন্দিয়া 'অনুপমা' নামে উল্লিখিতা হয়েছে। অন্যান্য গ্রন্থে তাঁর আরও কয়েকটি রাণীর খবর পাওয়া যায়—যথা গোপাল মাতা (দরিদ্র বণিকের কন্যা, মিলিন্দপঞ্হ, পৃঃ ২৯১), পদ্মাবতী (মগধরাজ দর্শকের ভগিনী, ভাসের স্বপ্নবাসবদত্ত), আরণ্যকা (অঙ্গরাজ দৃঢ়বর্মণের কন্যা, প্রিয়দর্শিকা গ্রন্থ)।

বিম্বিসার ও প্রসেনজিৎ উভয় নৃপতি ছিলেন পরস্পর ভগ্নীপতি সম্বন্ধযুক্ত। প্রসেনজিতের পিতা মহাকোশল মগধরাজ বিম্বিসারের সহিত নিজের দুহিতা

কোশলদেবীর বিবাহ দেন (জাঃ সংখ্যা ২৩৯ ও ২৮৩) এবং কোশলদেবী ছিলেন বিম্বিসারের প্রধানা মহিষী। মদ্ররাজদুহিতা খেমা ছিলেন বিম্বিসারের আর এক অগ্রমহিষী। (থেরীগাথা); জৈন নিবন্ধাবলী সূত্র থেকে জানা যায়, বৈশালীর ছেটক নামক কোন এক রাজার কন্যা ছেল্লনাকেও বিম্বিসার বিবাহ করেছিলেন। মহাবগ্‌গ গ্রন্থখানি আবার বিম্বিসারের পাঁচ শত রাজমহিষীর কথা উল্লেখ করছে। তিনি লিচ্ছবিসেনাপতির কন্যা উপচেলাকেও বিবাহ করেছিলেন (বিনয়বস্তু, Gil Ms. III, ২)।

রাজনৈতিক কূটনীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে এই সব রাজরাজাদের বিবাহ যে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ আত্মীয়তা কোন কোন রাজ্যের (মহাজনপদের) নিরাপত্তা রক্ষার বা কোন কোন রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধির সহায়ক হতে পারে বলে এই সব রাজকীয় বিবাহ অনেক সময় সংঘটিত হত এইরূপ প্রতীয়মান হয়। বহুবিবাহ প্রচলিত থাকায় সব সময়ে অন্তঃপুরের বিশৃঙ্খলা রক্ষিত হত না (জাতক সংখ্যা ৫১, ২৮২)। একাধিক পত্নী অনেক সময় রাজপুত্রদের নির্বাসনের কারণ হয়ে উঠত। অম্বট্‌ঠ সুত্ত (দীঘনিকায়) থেকে জানা যায় নৃপতি ইক্ষ্বাকু (ওক্‌কাক) তাঁর প্রিয় এক রাণীর পুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করবার অভিপ্রায়ে আর এক পত্নীর গর্ভজাত (বয়সে বর্ষীয়ান) কুমারগণকে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন। রামায়ণ ও পালি দশরথ জাতকে (সং ৪৬১) বর্ণিত রাম, লক্ষণ ও সীতার নির্বাসন ও অনুরূপ একই কারণসম্ভূত।

ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে একাধিক বিবাহ পুরুষের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল না। এরূপ বিবাহের দৃষ্টান্ত পালি সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থে দেখা যায়। চুল্লকাল, মজ্ঝিমকাল ও মহাকাল নামক তিন জন অবস্থাপন্ন শ্রেষ্ঠী ভ্রাতার একাধিক পত্নী ছিল - প্রথম জনের দুই স্ত্রী, দ্বিতীয়ের চার ও তৃতীয়ের (মহাকালের) আটজন ভার্যার উল্লেখ ধম্মপদট্‌ঠ কথায় (১ম খণ্ড, ৭-৮ সংখ্যক গাথার উপর টীকার অংশ-বিশেষ) রয়েছে। সুত্তবিভঙ্গে অপেক্ষাকৃত কম সঙ্গতিপন্ন একজন পুরুষের কথা উল্লিখিত আছে, যার দুই স্ত্রীর মধ্যে একজন ছিল বন্ধ্যা। এই সঙ্গে আরও তিন জনের উল্লেখ দেখা যায়, যাদের প্রত্যেকেরই দুই স্ত্রী ছিল (বিনয়পিটকং, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮৩—৮৪)।

স্বয়ংবর প্রথায় বিবাহ :

রামায়ণ মহাভারতীয় যুগে ক্ষত্রিয় রাজপরিবারে প্রচলিত স্বয়ংবর বিবাহ-প্রথার উদাহরণ বৌদ্ধ সাহিত্যেও দুর্লভ নয়। ইহা কেবলমাত্র ক্ষত্রিয় সমাজ গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এর বাইরেও ক্রমশঃ চালু হয়ে উঠেছিল (জাতক সংখ্যা ৩১ ও ৩২)। অবদান শতকের ৭১ সংখ্যক অবদানে রয়েছে যে, শ্রাবস্তীর

কোন এক ধনী শ্রেষ্ঠীর রূপবতী কন্যা সুপ্রভা যৌবনে পদার্পণ করলে তাঁর পিতা কন্যার বিবাহের জন্য স্বয়ংবর সভার আয়োজন করলেন, কিন্তু সুপ্রভা সমবেত প্রার্থীদের সামনে উপস্থিত হয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে তিনি কামার্থিনী নন, বরং তিনি ভগবান বুদ্ধের শরণার্থিনী। তখন যাচকসকল হাসিমুখে ফিরে যান।

এবার এ সম্বন্ধে নারীবিগর্হিত তথ্যপূর্ণ কুণাল জাতকটির (সংখ্যা ৫৩৬) দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। কোন এক সময় কোশলরাজের ঔরস ও কাশীরাজের (ব্রহ্মদত্তের) পালিতা কন্যা (দ্বিপিতৃকা) কৃষ্ণার অভিলাষানুযায়ী পালকপিতা ব্রহ্মদত্ত স্বয়ংবর ঘোষণা করেন। রাজাঙ্গিনায় সমবেত অনেকের মধ্যে পাণ্ডুরাজবংশীয় অর্জুন, নকুল, ভীমসেন, যুধিষ্ঠির ও সহদেব,—এই পাঁচজন রাজপুত্র তক্ষশিলায় বিদ্যাশিক্ষা শেষ করে ঘুরতে ঘুরতে বারাণসীতে উপস্থিত হয়ে ঐস্বয়ংবর সভায় যোগদান করেন। সমবেত আর কেহই কৃষ্ণার মনঃপূত হয়নি; বরং রাজকুমারীর উপস্থিত পাঁচজন রাজপুত্রেরই প্রতি অনুরাগ জন্মে; ফলতঃ কৃষ্ণা পাঁচজনেরই মাথায় পুষ্পমাল্য নিক্ষেপ করে তাঁদেরকে বরণ করে নিলেন। রাজা প্রথমে অসন্তুষ্ট হলেও (সম্ভবতঃ দেশাচার বিরুদ্ধ বলে) শেষ পর্যন্ত পাণ্ডুরাজপুত্র জেনে এঁদের সঙ্গে কৃষ্ণার বিবাহ দিলেন। কৃষ্ণা তাঁদের সঙ্গে বাস করতে লাগলেন এবং এই পাঁচ স্বামীরই মন হরণ করলেন। এই কাহিনীটি মহাভারত-বর্ণিত দ্রৌপদীর স্বয়ংবর ঘটনার রূপান্তর, অবশ্য এখানে দ্রৌপদীর নামটি বাদ দিয়ে কৃষ্ণা নামটি ব্যবহৃত হয়েছে, আর পঞ্চপাণ্ডবের নামোল্লেখ বয়সের পর্যায় রক্ষা করা হয়নি। মহাভারতের কাহিনীতে অর্জুনই একমাত্র নায়ক যাঁকে দ্রৌপদী বরমাল্যে বিভূষিত করেন।

জৈন শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের "ণয়াধম্মকহা (জ্ঞাতাধর্ম কথা)" শীর্ষক ষষ্ঠ অঙ্গ গ্রন্থেও মহাভারতোক্ত দ্রৌপদীর বিবাহ কাহিনী জৈন-মতাদর্শে রূপান্তরিত অবস্থায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। এখানে দ্রুপদরাজকন্যা দ্রৌপদী নামেই উল্লিখিতা হয়েছেন, যদিও কৃষ্ণা ছাড়া তাঁর যাজ্ঞসেনী, পাঞ্চালী এই দুটি নামেরও যথেষ্ট প্রয়োগ মহাভারতে দেখা যায়। দ্রৌপদীর বহুভর্তৃকত্বের কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে তাঁর পূর্বজন্মের একটি ঘটনার বিবরণ টেনে আনা হয়েছে, যেমন মহাভারতেও প্রায় একই পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। ইনি নাকি পূর্বজন্মে চম্পানগরের সাগরদত্ত নামক বণিকের দুহিতা রূপে জন্মেছিলেন। কিন্তু ভাগ্যহীনা সুকুমারিকা নাম্নী এই মেয়েটি দৈহিক স্পর্শদোষে প্রদুষ্টা হওয়ায় পরপর দুই স্বামীর ঘর করতে পারেননি। অবশেষে জৈন উপাশ্রয়ে সন্ন্যাসিনী রূপে কৃচ্ছ্রসাধন করতে থাকেন। একদিন দেবদত্তা নামক বারবণিতার সঙ্গে চম্পা নগরে একটি গোষ্ঠীতে (club) উপস্থিত হন এবং দেখতে পান সেখানে পাঁচটি যুবক দেবদত্তার সহিত আমোদপ্রমোদে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। দেবদত্তার এই প্রমোদানন্দ

লক্ষ্য করে তাঁর মনেও বাসনার উদ্রেক হয়, যে কৃচ্ছ্রসাধনার ফলস্বরূপ পরজন্মে তিনি যেন দেবদত্তার মত যৌবনোদ্দীপ্ত আনন্দ উপভোগ করতে পারেন এবং তাঁর এই বাসনা পরজন্মে পরিপূর্ণতা লাভ করে।

এই সুকুমারিকাই পরজন্মে পাঞ্চালের কাম্পিল্যনগরে দ্রুপদরাজের কন্যা রূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর নাম রাখা হয় দোবাঙ্গী বা দ্রৌপদী। দ্রৌপদী যৌবনে পদার্পণ করলে, তাঁর বিবাহের জন্য পঞ্চালরাজ স্বয়ংবরের আয়োজন করলেন এবং কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চ পাণ্ডুপুত্র, বিদুর, দ্রোণ, জয়দ্রথ, শকুনী প্রভৃতি অনেক রাজা এবং রাজকুমার আমন্ত্রিত হয়ে বিবাহ সভায় উপস্থিত হলেন। দ্রৌপদী লম্বা একটি মালা হাতে করে দর্পণের উপর রাজন্যবর্গের প্রতিবিম্ব দেখে এবং তাদের প্রত্যেকের সঠিক পরিচয় জানতে পেরে পঞ্চপাণ্ডবকণ্ঠে সেই মালাটি দিয়ে বেষ্টন করলেন এবং বললেন "আমি এই পাঁচজনকেই আমার পছন্দমত বরণ করছি।" পরে দ্রুপদরাজ পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গেই দ্রৌপদীর বিবাহকার্য সম্পন্ন করলেন। এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, কি বৌদ্ধ কি জৈন কোন কাহিনীতেই মহাভারতোক্ত "ধনুর সাহায্যে ঘূর্ণায়মান চক্রের ছিদ্র দিয়ে পাঁচটি বাণ মেরে বংশদণ্ডে আবদ্ধ মৎস্যটিকে বিদ্ধ করা' এমন কোন নির্দিষ্ট (Specific) শর্তপূরণের কথা উল্লিখিত হয়নি। বিনা শর্তেই কৃষ্ণা বা দ্রৌপদী নিজের পছন্দমত পঞ্চপাণ্ডবকে যুগপৎ বরণ করেছেন। এখানেই যেন স্বয়ংবর শব্দটির আক্ষরিক অর্থবোধক সংজ্ঞা যথাযথ গুরুত্ব রক্ষা করেছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ললিত বিস্তরানুযায়ী রাজা শুদ্ধোদন কুমার সিদ্ধার্থ যাতে স্বয়ং গুণবতী কন্যা মনোনীত করতে পারেন, তার এক অভিনব উপায় অবলম্বন করেন। শাক্য রাজ্যের আমন্ত্রিত কুমারীগণ নির্দিষ্ট দিনে সংস্থাগারে সমবেত হবেন এবং উপবিষ্ট কুমারের হাত থেকে (সম্ভাব্য বধূ হবার প্রতীক স্বরূপ) মূল্যবান রত্নময় অশোকভাণ্ড গ্রহণ কালে কুমারের যার প্রতি সুদৃষ্টি পড়বে, তাকেই বিবাহের জন্য বরণ করা হবে। শেষ পর্যন্ত গোপাই মনোনীতা হলেন। এ যেন পুরুষ বিবাহার্থীর স্বয়ংবরের আয়োজন।

কুণাল জাতকে নারীর একসঙ্গে একাধিক পতিগ্রহণের আর একটি দৃষ্টান্ত দেখা যায়। এই জাতকে পঞ্চপাপা নাম্নী আর এক রমণীর উল্লেখ দেখা যায়; সে যুগপৎ দুজন রাজার ভোগ্যা হয়েছিল। মহাভারতে নারীর একসঙ্গে বহুপতির প্রথার (Polyandry) আরও দু একটি উদাহরণের বিষয় যুধিষ্ঠির উল্লেখ করলেও, এইরূপ প্রথা ব্রাহ্মণ্য ধর্মশাস্ত্রে স্বীকৃত নয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উক্ত হয়েছে-"এক পুরুষের বহু পত্নী হয়ে থাকে। এক নারীর একসঙ্গে বহু পতি হয় না।" সম্ভবতঃ এই বিধিনিষেধের দিকে লক্ষ্য রেখে কুণাল জাতকে কৃষ্ণার চরিত্র কলুষিত করা হয়েছে, কারণ কৃষ্ণা আর একজন পঙ্গু ও কুব্জ পরিচারকের সঙ্গে পাপাচার করত।

বর্তমানে Marquesas দ্বীপপুঞ্জে, আফ্রিকার Bahima, Baziba, Bantu প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে আর টোডাদের (Toda) মধ্যে এবং তিব্বতে এইরূপ নারীর একসঙ্গে বহুপতিত্বের (Polyandry) প্রথা প্রচলিত আছে (E. R. E Vol 8)।

সবর্ণ ও অসবর্ণ-বিবাহ ঃ

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা ছিল সামাজিক আদর্শ। অঙ্গুত্তর নিকায়ে (৩য় খণ্ড) যাঁরা প্রকৃত ব্রাহ্মণ-লক্ষণ যুক্ত ঐসব শুদ্ধাচার ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে "যিনি আদর্শবান সৎব্রাহ্মণ, তিনি কেবল-মাত্র ব্রাহ্মণীর কাছে উপগত হন, ক্ষত্রিয় কিম্বা অন্য যে কোন জাতিসম্ভূতা স্ত্রীলোকে উপগত হন না"। সবর্ণ বিবাহের ব্যাপারে ব্রাহ্মণদের মানসিকতার কিছুটা ইঙ্গিত একটি জাতকে (অননুসোচিয় জাঃ, সং ৩২৮) দেখা যায়। একজন ব্রাহ্মণ তার পুত্রের বিবাহের জন্য জম্বুদ্বীপের যে কোন স্থান থেকে জনৈকা ব্রাহ্মণ-কুমারীর অনুসন্ধানে বহু লোকজন পাঠিয়েছিলেন। পুত্রের গড়ান সুবর্ণ প্রতিমার অনুরূপ পরমাসুন্দরী এক ব্রাহ্মণ-কুমারীকে পাওয়া গেলে, তাঁদের উভয়ের শুভপরিণয় সম্পন্ন হয়। অনেকগুলি জাতকে দেখা যায় যে, অন্যান্য জাতির মধ্যেও সমজাতিকুল থেকে (জাতি-গোত্ত-কুল-পদেসেহি সমানা, জাঃ ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৪ ২৮) পাত্রী মনোনীত করা হত (জাঃ সংখ্যা, ১৫২, ২৩৪, ৩৫৪, ৪১৭)। ক্ষত্রিয়দের মধ্যে জাতিবর্ণবিচারে কিছুটা শৈথিল্য থাকলেও, কপিলাবস্তুর রাজা ও রাজন্যবর্গের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের ব্যাপারে অত্যধিক জাত্যাভিমান ছিল। সুদূর অতীত কাল থেকে তাঁদের মধ্যে শাক্যজাতি হিসেবে যে বংশানুক্রমিক কুলাচার প্রচলিত ছিল, তাথেকে বিচ্যুত হবার কথা তাঁরা চিন্তা করতে পারতেন না। তাঁদের রাজ্যের সীমানার অন্তর্গত একক জাতি হিসেবে গণ্য শাক্যরাজকুলের মধ্যেই বিবাহ সীমাবদ্ধ ছিল। শাক্যকুল ছাড়া বাহিরের অন্য কোন রাজকুলের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করতেন না। কোশলরাজার শাসনাধীনে থাকায় শাক্যরাজারা রাজা প্রসেনজিতের বিবাহের প্রস্তাব তাঁরা একেবারে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন নি। কৌশলে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে তাঁরা মহানাম-শাক্যের দাসীকন্যা বাসভক্ষত্রিয়াকে কোশলরাজ্যে পাঠিয়ে দেন এবং প্রসেনজিৎ ঐ কন্যাকে শাক্যকুলজাতা মনে করে বিবাহ করেন। কিন্তু এই বিবাহের বিষময় ফলাফল শেষ অবধি শাক্যবংশধ্বংস-কাহিনীতে পর্যবসিত হয় (ভদ্দসাল জাতক,সং ৪৬৫); বৈবাহিক-সূত্র সম্পর্কিত তাঁদের এই উগ্র জাতীয়তা-বোধের বীজ সম্ভবতঃ উপ্ত হয়েছিল সুদূর অতীতে ইক্ষ্বাকুর নির্বাসিত সন্তানদের দ্বারা, যাঁরা জাতি-সংদোষভয় হেতু নিজেদের ভগিনীগণকে বিবাহ করে শাক্যবংশের পত্তন করেন (অম্বট্ঠ সুত্ত-দীর্ঘনিকায়)।

ললিত বিস্তরে বর্ণিত সিদ্ধার্থের বিবাহ-কাহিনী পাঠে বোঝা যায় কন্যা নির্বাচনে শুদ্ধোদনের বর্ণবৈষম্যে আপত্তি ছিল না ; পুত্রের অভিরুচী অনুযায়ী চারি বর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র) যে কোন জাতিসম্ভূতা চারিত্রিক সদগুণ সম্পন্না কন্যার অন্বেষণ করবার জন্য পুরোহিতকে নির্দেশ দেন, কারণ সিদ্ধার্থ কুল বা গোত্রে পরিতুষ্ট নয়। এখানে সিদ্ধার্থ ও শুদ্ধোদনের উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বিবাহের ব্যাপারে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রাও অনেক সময় বর্ণবিশুদ্ধিনীতি পরিহার করতেন, এর প্রমাণ পাওয়া যায় অসলায়ন সুত্তে (মজ্ঝিম নিকায়, ২য় খণ্ড) লিপিবদ্ধ ভগবান বুদ্ধের কথোপকথনের একটি অংশ থেকে—

ভগবান বুদ্ধের প্রশ্ন—"যদি ক্ষত্রিয়কুমার ব্রাহ্মণকন্যার সহিত সহবাস করে এবং তাহাদের সহবাস হেতু পুত্র উৎপন্ন হয়, তবে সেই ক্ষত্রিয়কুমার দ্বারা ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভজাত যে পুত্র হইয়াছে সে মাতারও সমান, পিতারও সমান অধিকারী ; সুতরাং সে ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হওয়া উচিত নহে কি ?" অশ্বলায়নের উত্তর—"ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ-নামে অভিহিত হওয়া উচিত।" বুদ্ধের প্রশ্ন—"যদি ব্রাহ্মণ-কুমার ক্ষত্রিয়কন্যার সহিত সহবাস করে ব্রাহ্মণ বলা উচিত কি ?" অশ্বলায়নের উত্তর—"হ্যাঁ ব্রাহ্মণ বলা উচিত।"

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের বাইরে অন্যান্য জনগণের মধ্যেও বিশেষবিশেষ ক্ষেত্রে বিবাহ ব্যাপারে জাতি কুল ও পদমর্যাদা উপেক্ষিত হওয়ার পরিচয়ও পাওয়া যায়। বঙ্কহার প্রদেশের শিকারীদের দলপতির কন্যা চাপার সহিত উপক নামক জনৈক আজীবিক সাধুর বিবাহ হয়েছিল (থেরীগাথা ভাষ্য পৃঃ ২২০)। রাজগৃহের এক শ্রেষ্ঠীপুত্র দড়াবাজির-খেলায় পারদর্শিনী জনৈকা নারীকে বিবাহ করে (ধম্মপদট্‌ঠকথা, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৫৯-৬০)। বারাণসী-শ্রেষ্ঠীর বাটীতে নিযুক্ত এক দাসীপুত্র আত্মপরিচয় গোপন রেখে প্রভুর বন্ধু আর এক ধনী শ্রেষ্ঠীর কন্যাকে বিবাহ করে, কিন্তু তজ্জন্য তাকে কোন শাস্তি ভোগ করতে হয়নি। (কটাহক জাতক, সং ১২৫)। দিব্যাবদানের শার্দুলকর্ণ অবদান থেকে প্রতিলোম বিবাহের একটি উদাহরণ পাওয়া যায়, চণ্ডালসর্দার ত্রিশঙ্কুরের শিক্ষিত পুত্র শার্দুলকর্ণের সহিত এক ব্রাহ্মণকন্যার বিবাহ হয়েছিল।

মহা-উম্মগ্‌গ জাতক থেকে জানা যায়, যে বাসুদেব চণ্ডাল গ্রামের এক সুন্দরী কুমারীর রূপশ্রী চোখে লাগাতে চণ্ডালজাতীয়া জেনেও তাকে প্রাসাদে নিয়ে যান এবং জাম্ববতী নাম্নী ঐ চণ্ডালকুমারীকে মহিষীর পদে অভিষিক্ত করেন। জাম্ববতীর গর্ভজাত পুত্র শিবি পিতার মৃত্যুর পর দ্বারাবতীর রাজা হয়েছিলেন। কৃষ্ণ-বাসুদেব সম্বন্ধে এরূপ কিংবদন্তী জৈন বা ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের কোন স্থানে দেখা যায় না।

যুগপৎ বিবাহ (Polygyny) :

বহুবিবাহের প্রকারভেদ হচ্ছে যুগপৎ একাধিক কন্যার পাণি-গ্রহণ। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে ইহাকে Polygyny বলে অভিহিত করেছেন। এই বিবাহে একই পাত্রের সহিত কোন ব্যক্তির একাধিক কন্যার একই সময় বিবাহ হয়ে থাকে। পালি সাহিত্যে এর দু-একটি উদাহরণ দেখা যায়। সাধুশীল জাতকের (সং ২০০) প্রত্যুৎপন্ন ও অতীত বস্তুর উভয়াংশেই দেখা যায় যে কোন এক ব্রাহ্মণের চার কন্যার জন্য চারজন পাণি-গ্রহণার্থী হয়েছিল—ইহাদের মধ্যে একজন রূপবান, একজন প্রৌঢ় ও প্রবীন, একজন সৎকুলজ ও একজন সুশীল, ধার্মিক ও সদাচার সম্পন্ন। ঐ ব্রাহ্মণ কাকে নির্বাচন করা যায় সিদ্ধান্ত করতে না পেরে ভগবান বুদ্ধের (অতীত বস্তুতে আচার্যের) পরামর্শানুযায়ী (সর্বাপেক্ষা সুপাত্র) শীলবান (চতুর্থ) পাত্রটিকেই তাঁর চার কন্যাকে সম্প্রদান করেন।

পালি (মহাবংশ, দীপবংশ), বৌদ্ধ সংস্কৃত (ললিতবিস্তর, মহাবস্তু) ও তিব্বতী সূত্র থেকে জানা যায় যে গৌতম বুদ্ধের পিতা শুদ্ধোদন অঞ্জন শাক্য (পালি) বা সুপ্রবুদ্ধ শাক্যের (ললিতবিস্তর ও তিব্বতী সূত্র) মায়া বা মহামায়া ও মহাপ্রজাপতী (মহাপ্রজাবতী) নাম্নী দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। তিব্বতীয় বৌদ্ধ গ্রন্থানুবাদ (Rockhill) থেকে জানা যায়, শাক্যদের আইনে কোনও নাগরিকের দুইজন পত্নী বিবাহ করা বিশেষভাবে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু শুদ্ধোদন যুবরাজ থাকা কালে একসময় পার্বত্যজাতি পাণ্ডবদিগকে পরাজিত করেছিলেন ; তাই ইহার পুরস্কার স্বরূপ তাঁকে দুই পত্নী গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তবে এসব বিভিন্ন গ্রন্থের সংবাদগুলি এত পরস্পর বিরোধী যে এঁদের বিবাহ কি একই সময়ে, অথবা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সংঘটিত হয়েছিল, তা সঠিক নিরূপণ করা সম্ভব নয়।

চুল্লকালিঙ্গ-জাতকে (৩০১) বর্ণিত চার (সহোদরা ভগিনী) রাজকন্যার একই রাজার মহিষীপদে অভিষেক-কাহিনী এই প্রকার বৈবাহিক ঘটনার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। দন্তপুরের যুদ্ধাভিলাষী কালিঙ্গরাজ তাঁর চারিটি পরমা সুন্দরী কন্যাকে যুদ্ধচ্ছলে সমস্ত জম্বুদ্বীপে রাজ্যে রাজ্যে পর্যটন করার জন্য প্রেরণ করেন ; উদ্দেশ্য যে রাজা এঁদেরকে নিজের অন্তঃপুরে নিয়ে যাবেন, তাঁর বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করা হবে। কিন্তু এঁরা বিভিন্ন রাজ্যে ঘুরে ঘুরে ভয়বশতঃ কোন রাজার কাছে ফলপ্রদ সাড়া না পেয়ে অবশেষে পোতলি নগরে উপনীত হন। অশ্বকরাজ তাঁর বুদ্ধিমান উপায়কুশল অমাত্য নন্দিসেনের পরামর্শ ও উৎসাহে পরমরূপবতী চার রাজকন্যাকেই মহিষীপদে বরণ করেন। ক্রমশঃ যুদ্ধারম্ভ হয় ; কলিঙ্গরাজ পরাজিত হন এবং শেষপর্যন্ত কলিঙ্গরাজ জামাতা অশ্বকের নিকট কন্যাদের প্রাপ্য যৌতুক পাঠিয়ে দেন ; পরে উভয় রাজাই মিত্রভাবে বাস করতে থাকেন।

সহোদর ভাই-বোনের বিবাহ ঃ

বৌদ্ধ সাহিত্যে সহোদরা ভগিনীর সহিত বিবাহ দ্বারা কয়েকটি প্রসিদ্ধ রাজবংশের উদ্ভব সম্বন্ধে কিছু কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। উদাহরণ স্বরূপ শাক্যবংশের উৎপত্তি ও লিচ্ছবীদের উদ্ভব সম্বন্ধে যেসব কাহিনী বর্ণিত আছে সেগুলি উল্লেখযোগ্য (এ সম্বন্ধে এই বইয়ের ১২ এবং ১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এরূপ বিবাহের আরও উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কাশীরাজের পুত্র উদয় তাঁর বৈমাত্রেয় ভগিনী উদয়ভদ্রাকে বিবাহ করেন (উদয় জাতক, সংখ্যা ৪৫৮)। দশরথ জাতকের কাহিনী আরও বিচিত্র। রামপণ্ডিত অরণ্য থেকে প্রত্যাবর্তন করে সহোদরা ভগিনী সীতাকে অগ্রমহিষীর পদে বরণ করেন। এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে রামায়ণ-বর্ণিত রাম-সীতার বিবাহ এবং তাঁদের পবিত্র স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের কথা এই জাতকে ব্যবহৃত হয়ে অদ্ভুত অনৈতিক তথ্যে রূপায়িত হয়েছে। এ সমস্ত কাহিনীর পেছনে কতটুকু ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে, তা এখনও গবেষকের বিচার্য বিষয় হয়ে রয়েছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মশাস্ত্র এরূপ বিবাহকে অনুমোদন করেনি। অন্যান্য প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে এরূপ কোন বিবাহের নিদর্শন পাওয়া যায় না। ইতিহাস সম্মত তথ্যগুলির দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে ঐতিহাসিক যুগে মিশর দেশে (Egypt), পারস্য দেশে রাজকীয় পরিবারগুলির মধ্যে এরূপ বিবাহ প্রচলিত ছিল এবং পেরুর ইনকাসদের মধ্যেও (Incas of Peru) নাকি এই কুপ্রথা একসময় প্রচলিত ছিল। খুব সম্ভবতঃ এই বিবাহের মূলে ছিল রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা করবার মানসিকতা (E R E, Vol 8, Marriage-W. H. R Rivers, p p 423-425).

বুদ্ধের সমসাময়িক সমাজের উচ্চ-নীচ স্তরের লোকেরাও যে এই প্রথাকে সমর্থন করতেন না; বরঞ্চ ঘৃণাই করতেন তার প্রমাণও পালি অট্‌ঠকথার কয়েকটি গল্পে (কুণাল জাতক, ধম্মপদট্‌ঠকথা ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৫৪, সুমঙ্গল বিলাসিনী, ২য় খণ্ড, ৬৭২ পৃঃ) সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শাক্য এবং কোলিয়গণ কপিলবস্তু এবং কোলিয় নগরের অন্তর্বর্তিনী রোহিণী নদীতে একটিমাত্র বাঁধ দিয়েই উভয় তীরে শস্যোৎপাদন করতেন। একবার জ্যৈষ্ঠ মাসে উভয় নগরের কৃষকদল সেচের জল নিয়ে যাবার জন্য নদীতীরে উপস্থিত হয়। প্রথমেই কোলিয়বাসীরা প্রস্তাব করল শস্য পাকাতে হলে সেচের জন্য যতটা প্রয়োজনীয় জলের প্রয়োজন ততটা তাঁরাই প্রথমে নিয়ে যাবে। শাক্যরা কোলিয়দের এই অন্যায় আবদার কোন মতেই মেনে নিতে রাজি হলেন না। এই নিয়ে দুই দলের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি, হাতাহাতির সূত্রপাত এবং পরস্পরের রাজকুলের বংশ-জাতির হেয়তা নিয়ে ভৎর্সনা এবং ক্রমশঃ কলহবৃদ্ধি। কোলিয় কৃষকদল শাক্যদের উপলক্ষ্য করে বলে উঠল—"দূর হ, হতচ্ছাড়ারা, যারা কুকুর-শেয়ালের মত নিজেদের ভগিনীদের সহবাস করেছিল। তাদের হাতী, ঘোড়া,

ঢাল-তবোবাল আমাদেব কি কববে ? (সোণ সিগালাদযো বিয অত্তনো ভগিনীহি সদ্ধিং সংবসিংসু)। শাক্যকুমবেবাও পাল্টা কোলিযদেব "কুষ্ঠরোগীদেব বংশধবঃ এবং পাখীদেব মত কুলগাছে যাদেব প্রথম আশ্রয ছিল, তাদেব অস্ত্রশস্ত্র আমাদেব কি ক্ষতি কবতে পাবে"—ইত্যাদি বলে তাদেব তিবস্কাব কবল। ক্রমে ক্রমে শাকিয ও কোলিয মাতব্ববেবা যুদ্ধ-সজ্জা প্রস্তুত কবলেন। কিন্তু অবশেষে ভগবান বুদ্ধ উপস্থিত হযে এঁদেব যুদ্ধ বন্ধ কবে উভয দলেব মধ্যে শান্তি ফিবিযে আনলেন।

সহোদবা ভগিনী-বিবাহের কথা ছাড়াও একাধিক জাতক থেকে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত মামাত-পিসতুত, খুড়তুত-জেঠতুত ভাইবোনেব (বিশেষতঃ বাজকুলে) বিবাহ সম্বন্ধে বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ কবা যায। বর্ধকিশূকব (২৮৩), তক্ষকশূকব (৪৯২), কোশলসংযুক্ত প্রভৃতিতে অজাতশত্রুব সহিত তাঁব মাতুলকন্যা বজ্রাদেবীব বিবাহেব কথা লিপিবদ্ধ আছে। বেস্সন্তব তাঁব মাতুলকন্যা মাদ্রীকে বিবাহ কবেছিলেন (জাঃ সংখ্যা ৫৪৭)। বৌদ্ধ কিংবদন্তী অনুসাবে গোতম বুদ্ধ তাঁব মাতুলকন্যা যশোধবাকে বিবাহ করেন। সাধারণ ভদ্র গৃহস্থ ঘবেব ছেলেবাও অনেক সময মামাত বোনকে (মাতুলধীতবং) বিযে কবত। যেমন—বাবাণসীব নন্দিয নামক কোন এক ভদ্রঘবেব যুবক মাতাপিতাব অনুবোধে তাঁদেব বাড়ীরই সম্মুখ থেকে বেবতী নাম্নী মাতুলকন্যাকে (সম্মুখ গেহতো মাতুলধীতবং বেবতিং নাম) বিবাহ কবেছিলেন (ধম্মপদট্ঠকথা, ৩য় খন্ড, নন্দিয বথু, পৃঃ ২৯০-২৯১)। মঘ নামক মগধেব জনৈক সর্বহিতৈষী যুবক তাঁব মামাতবোন সুজাতাব পাণিগ্রহণ কবেন (ধম্মপদট্ঠকথা, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৭১)।

তবে বাজকুলে এই বিবাহ প্রচলিত থাকলেও অসিলক্ষণ (১২৬) ও মৃদুপাণি (২৬২) জাতক পাঠে মনে হয যে, কোন কোন বাজা অনেক সময প্রথমদিকে ভাগিনেযেব সহিত কন্যাব বিবাহকে মনেপ্রাণে মেনে নিতে পাবেননি। বাবাণসীবাজ ব্রহ্মদত্ত নিজেব এক কন্যা ও এক ভাগিনেযকে নিজেব কাছে বেখে একসঙ্গে লালনপালন কবতেন ; ভাগিনেযকে নিজেব কন্যাটি সম্প্রদান কবে বাজ্যেব উত্তবাধিকাবী কববেন বলে সঙ্কল্প কবেন। কিন্তু পবে দ্বিধাগ্রস্ত হযে চিন্তা কবেন "ভাগিনেয ত একপ্রকাব আত্মজস্থানীয, অন্য কোন বাজকুমাবেব সহিত কন্যাব বিবাহ দেওবা সমীচীন" (জাঃ সংখ্যা ১২৬)। মৃদুপাণি জাতকে উল্লিখিত বাজাও প্রথমদিকে চিন্তা কবলেও অনুরূপ ভাবে কন্যাকে ভাগিনেযেব হাতে সমর্পণ কবা সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত হযে পড়েন। পবে অবশ্য ঘটনাচক্রে এই উভয বাজাই এরূপ বিবাহকে সানন্দে মেনে নিযেছিলেন। মনে হয তখনকাব দিনেও অনেকে চিন্তা কবতেন যে মামাত-পিসতুত ভাই বোন উভযেব শোণিতস্রোতে একদিক দিযে অনেকটা প্রায একই বংশেব বক্তধাবা প্রবাহিত ; সুতবাং এ বিবাহ অসিদ্ধ। দাক্ষিণাত্যে ও চট্টগ্রামেব বাঙ্গালী বৌদ্ধসমাজে এরূপ বিবাহ প্রচলিত

আছে এবং ইহা দোষাবহ বলে গণ্য করা হয় না। বৌধায়নের ধর্মসূত্রে (I ii 3) স্থান বিশেষের দিকে লক্ষ্য রেখে দক্ষিণ-ভারতীয় সমাজে প্রচলিত মামাত-পিসতুত ভাই-বোনের বিবাহ সিদ্ধ বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, যদিও মনুসংহিতায় ইহার উল্লেখ দেখা যায় না।

খুড়তুত-জেঠতুত ভাই-বোনের বিবাহ সম্পর্কে বেশী সংবাদ না থাকলেও মহাজনক জাতক (সংখ্যা ৫৩৯) থেকে এর কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। মিথিলারাজ মহাজনকের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ অরিষ্টজনক রাজা হন এবং ছোট ভাই উপরাজ পোলজনককে কুলোকের পরামর্শে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখেন। কিন্তু পোলজনক সত্যক্রিয়া বলে শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে বিদ্রোহী হন এবং বড় ভাই অরিষ্টজনককে পরাজিত ও নিহত করে সিংহাসন অধিকার করেন। অরিষ্টের সসত্ত্বা মহিষী গর্ভরক্ষার্থে পালিয়ে গিয়ে কালচম্পা নগরে এক বেদপাঠক ব্রাহ্মণের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেখানে এক পুত্র প্রসব করেন। পিতামহের নামানুসারে এই পুত্রের নাম রাখা হয় মহাজনককুমার। যৌবনে পদার্পণ করে পৈত্রিক রাজ্য উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে অর্থোপার্জনের জন্য সুবর্ণভূমির দিকে মহাজনককুমার যাত্রা করেন, কিন্তু সমুদ্রপথে বিপদ্‌গ্রস্ত হয়ে মণিমেখলা দেবীর কৃপায় মিথিলারই এক আম্রবনে শেষে আশ্রয় লাভ করেন।

ইতিমধ্যে পোলজনক সীবলি নাম্নী এক কন্যা রেখে দেহত্যাগ করেন, কিন্তু মৃত্যুশয্যায় পুত্র না থাকায় অমাত্যদের নির্দেশ দিয়ে যান—"(১) যে সীবলির মনোস্তুষ্টি করতে পারবে, (২) সমকোণী চৌকো পালঙ্কের শিরর নিরূপণ করতে পারবে, (৩) সহস্রপুরুষনম্য ধনুতে জ্যা আরোপণ, এবং (৪) ১৬টি স্থান থেকে মহানিধি উদ্ধার করতে পারবে তাকেই রাজ্য দিবেন"। ঘটনাচক্রে পুরোহিত প্রমুখ অমাত্যগণের সদিচ্ছা ও প্রচেষ্টার ফলে পুষ্পরথের সাহায্যে মহাজনককুমার মিথিলার রাজপ্রাসাদেই উপনীত হন, ক্রমশঃ তিনি তাঁর কাকা পোলজনকের নির্দেশানুযায়ী সব কটি পরীক্ষায় (নিজের বুদ্ধি ও শক্তির কৃপায়) উত্তীর্ণ হয়ে খুল্লতাত কন্যা সীবলির পাণিগ্রহণ করেন এবং এইভাবে পোলজনকের জামাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র মহাজনককুমার মিথিলায় রাজত্ব করতে থাকেন, দীর্ঘকাল পরে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।

এই জাতকে বর্ণিত সীবলির বিবাহ-কাহিনী সেক্সপিয়ার প্রণীত Merchant of Venice নাটকের প্রধান নায়িকা Portia-র বিবাহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পিতৃদেবের উইলের (Will) শর্তানুযায়ী স্বর্ণ, রৌপ্য ও সীসক নির্মিত আলাদা আলাদা কাস্কেট (Casket) তিনটির মধ্য থেকে Portia র প্রতিকৃতি অন্তর্ভুক্ত সঠিক সীসক-বাক্সটি (Casket of lead) নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে Bassanio Portia-র পাণিগ্রহণ করতে পেরেছিলেন।

বিধবা বিবাহ ও বৈধব্য জীবন ঃ

তৎকালীন প্রাচীন ভাবতেব, কি উচ্চ কি নিম্ন উভয় স্তবেব লোকদের মধ্যেই যে বিধবাদেব পত্যন্তব গ্রহণেব প্রথা প্রচলিত ছিল, এব সাক্ষ্যপ্রমাণ বয়েছে জাতকেব কয়েকটি আখ্যায়িকায়। এক সময় কোশলবাজ বিপুল সেনা নিয়ে বাবাণসী নগব অধিকাব কবেন এবং বাজাকে হত্যা করে তাঁব অগ্রমহিষীকে নিজেব অগ্রমহিষীরূপে গ্রহণ কবেন (অশাতরূপ জাতক, সংখ্যা ১০১); ভূবিদত্ত জাতক (সংখ্যা ৫৪৩) থেকে জানা যায় যে বাবাণসীবাজ ব্রহ্মদত্ত পুত্রকে ঔপবাজ্য দিলেও সিংহাসন হাবাবাব ভয়ে নির্বাসনে পাঠান। বাজকুমাব নির্বাসন কালে সাগবগর্ভস্থ নাগভবনেব এক বিধবা নাগকন্যাকে বিবাহ কবেন। আবাব কুণাল জাতকেব (সংখ্যা ৫৩৬) পাদটীকায় বর্ণিত কয়েকটি কাহিনীতে এরূপও সংবাদ পাওয়া যায় যে এক রাজা অন্য রাজাকে হত্যা কবে (গর্ভিণী জেনেও) তাঁব বিধবা মহিষীকে নিয়ে গিয়ে নিজেব অগ্রমহিষী কবেছিলেন। পিতা বিধবা কন্যাকে পাত্রান্তবে দান কবেছেন, মহাভারতেও (ভীষ্ম পর্ব-৯১ অধ্যায়) এব সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ঐবাবত নামক নাগবাজেব এক কন্যা ছিল, ঐ কন্যা বিধবা হলে নাগবাজ এই স্বামীহীনা কন্যাকে অর্জুনকে ভার্যার্থ দান কবেন।

সাধাবণ গৃহস্থ ঘবে ও নীচজাতীয় লোকদেব মধ্যেও বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল। নন্দ জাতকে (সংখ্যা ৩৯) দেখা যায় যে, কোন এক বৃদ্ধ ভূম্যাধিকাবীব এক তরুণী ভার্যা ছিল, বৃদ্ধ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে চিন্তা কবতে লাগলেন, "আমাব স্ত্রী যুবতী; আমাব মৃত্যু হলে না জানি অন্য কোন পুরুষকে আশ্রয় করবে এবং সমস্ত ধন আমাব পুত্রকে না দিয়ে নিজেই ব্যয় কবে ফেলবে"। উচ্ছঙ্গ জাতকে (সংখ্যা ৬৭) বর্ণিত এক নিম্নস্তবেব বমণীব স্বামী, পুত্র ও ভ্রাতা—এই তিন ব্যক্তি ভুলক্রমে দণ্ডিত হলে, বাজা কেবলমাত্র একজনকে মুক্তি দেবাব প্রতিশ্রুতি দেওয়ায়, ঐ রমণী পুত্র বা স্বামীকে না চেয়ে ভ্রাতাব মুক্তিই চেয়েছিল, কাবণ পুত্র ও স্বামী সহজে পাওয়া যায়, কিন্তু ভ্রাতা দুর্লভ। ফলতঃ বাজা সন্তুষ্টচিত্তে তিনজনকেই মুক্তি দিয়েছিলেন।

বৈধব্যজীবন যে নাবীজীবনেব চবম অভিশাপ তাব কিছুটা ইঙ্গিত বয়েছে 'মিলিন্দপ্রশ্ন' গ্রন্থে। নাগসেন দশ প্রকাব অবজ্ঞাত, অবহেলিত লোকদেব উল্লেখ কবতে গিয়ে সর্বপ্রথম বিধবা নাবীব কথা স্মবণ কবেছেন এবং এই তালিকায় বিধবাব সঙ্গে রয়েছে নয় প্রকাব মানুষ—দুর্বল পুরুষ, জ্ঞাতিমিত্রহীন ব্যক্তি, পেটুক, গুরুহীন কুলোদ্ভব ব্যক্তি, কুসঙ্গীযুক্ত ব্যক্তি, ধনহীন ব্যক্তি, সদাচাবহীন ব্যক্তি, নিষ্কর্মা লোক, উদ্যোগহীন ব্যক্তি—এদের সকলের মত বিধবা নাবী পৃথিবীতে চিবকাল অবহেলিত, অসম্মানিত, সর্বত্র দমিত এবং মর্যাদাভ্রষ্ট হয়ে আসছে (মিলিন্দপঞ্হো—পৃঃ ২৮৮)।

বেস্‌সন্তর জাতকে (৫৪৭) দেখা যায় যে শিবিরাজ্যের রাজকুলবধূ মাদ্রী বনবাসের নানা দুঃখ, কষ্ট, ভয়ের কারণ জেনেও সে সমস্ত সহ্য করবার অটুট মানসিক বল উদ্দীপ্ত করে স্বামীর সহচারিণী হতে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন। মনোমত পতি লাভ করবার জন্য কুমারীদের কত কষ্ট সহ্য করতে হয়। আর বৈধব্যযন্ত্রণা কি দুর্বিষহ। এঁদের মত তিনিও অম্লান-বদনে বনযাত্রা ও বনবাস কালে সবরকম দুঃসহ দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হতে প্রস্তুত। এই প্রসঙ্গে মাদ্রীদেবী বিধবা নারীর দুঃখ-দুর্দশাময় অবস্থার কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। জাতককার গাথায় প্রকাশিত মাদ্রীদেবীর উক্তিগুলির মাধ্যমে দুঃখ-কষ্ট জ্বালা-যন্ত্রনায় জর্জরিত বিধবাদের বাস্তব জীবনযাত্রার আলেখ্য নিখুঁতভাবে অঙ্কিত করেছেন—এ থেকে তৎকালীন বৈধব্যজীবনের দুরবস্থা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করে নেওয়া যায়। গাথাগুলির বঙ্গানুবাদ এস্থলে উদ্ধারযোগ্য বলে মনে হয় ঃ

১। কত কষ্ট পায়, হায়, বিধবা যে নারী।
করিতে তাহাকে হয়,বার বার স্নান,
অগ্নিপরিচর্যা আর, ত্রিসন্ধ্যা প্রত্যহ।
এহেতু, হে রথিবর, যাব আমি বনে।

২। কত কষ্ট পায়, হায়, বিধবা যে নারী।
উচ্ছিষ্ট খাইতে তার যোগ্য যেই নয়,
সেও চেষ্টা করে তাহে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে,
হইতে নিজের সঙ্গে ব্যাভিচারে রতা।
এহেতু, হে রথিবর, যাব আমি বনে।

৩। কত কষ্ট পায়, হায়, বিধবা যে নারী।
পরপুরুষেরা তারে তুলে চুল ধরি ;
মাটিতে ফেলিয়া দেয় , এত দুঃখ দিয়া
তাহাকে নিঃশঙ্ক, মনে দেখে দাঁড়াইয়া।
এ হেতু, হে রথিবর, যাব আমি বনে।

৪। কত কষ্ট পায়, হায়, বিধবা যে নারী।
সুন্দরী বিধবা কোন পাইলে দেখিতে
দিয়া তারে ধন কিছু ভাবে লোকে মনে
হইয়াছি আমি এর প্রণয়ভাজন।
নাই তার ইচ্ছা, তবু করে জ্বালাতন,
পেচকে বায়সগণ করে যে প্রকার।
এহেতু, হে রথিবর, যাব আমি বনে।

৫। কত কষ্ট পায় হায়, বিধবা যে নারী।
থাকে যদি জ্ঞাতিকুলে ঐশ্বর্য অপার,
সুবর্ণরজত পাত্রে গৃহ আভাময়,
তথাপি সোদর, সখী, সকলেই তারে
সতত গঞ্জনা দেয় বিধবা বলিয়া,
এ হেতু, হে রথিবর যাব আমি বনে।

৬। নগ্না জলহীনা নদী, নগ্ন সেই দেশ
শাসন করিতে যেথা নাই কোন রাজা,
থাকে যদি বিধবার ভ্রাতা দশজন,
তবু সে অনাথা, নগ্না! সহায়বিহীনা।
অহো কি বা দুর্বিষহ বৈধব্য যন্ত্রণা!
এহেতু, হে রথিবর, যাব আমি বনে।

(ঈশান ঘোষ, জাতক ৬ষ্ঠ খণ্ড, জাতক সংখ্যা ৫৪৭, পৃঃ ৩৫৭—৩৫৮)

সতীদাহ ঃ

পালি সাহিত্যে সতীদাহ বা স্বামীর চিতায় সহমরণ গমন সম্বন্ধে কোন তথ্যপ্রমাণ না থাকলেও অশ্বঘোষের "সৌন্দরানন্দ কাব্য" থেকে এ-সম্বন্ধে বেশ কিছু আভাস পাওয়া যায়। অশ্বঘোষ স্ত্রীচরিত্রের দুর্বলতা সম্বন্ধে একস্থানে লিখেছেন—"যদিও স্ত্রীগণ পতির সহিত চিতায় প্রবেশ করে, কিংবা অনুমরণ প্রাপ্ত হয়, তথাপি তাহারা পতির জন্য যন্ত্রনা ভোগ করেনা, কারণ হৃদয়ে তাহারা কাহাকেও ভালবাসে না। কদাচিৎ কোনও কোনও রমণী পতিকে দেবতা ভাবিয়া সেবা করে। (কিন্তু ' সহস্র সহস্র রমণী চঞ্চল-চিত্ততা হেতু নিজের হৃদয়কেই সন্তুষ্ট করিয়া থাকে।" (বিমলা চরণ লাহা—(সৌন্দরানন্দ কাব্য, বঙ্গানুবাদ —অষ্টম সর্গ। শ্লোক সংখ্যা ৪২-৪৩)। এই উক্তি থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে সতীদাহ ও সহমরণ-প্রথা প্রাচীন ভারতে, অন্ততঃ অশ্বঘোষের কাল (খৃষ্টোত্তর ১ম-২য় শতাব্দী) পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

নিয়োগ প্রথা (Lervirate) ঃ

পালি সাহিত্যের স্থানে স্থানে 'দেবর' শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায়। টীকাকার ধম্মপাল লতাবিমান প্রসঙ্গে (বিমানবথু) ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেবর শব্দটির অর্থ প্রকাশ করেছেন এইভাবে—"দুতিযো বরো তি বা দেবরো, ভত্তু কনিট্ঠ-ভাতা" (পরমত্থদীপনী, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৩৫)। খণ্ডহাল জাতকেও (সংখ্যা ৫৪২) দেবর শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। বারাণসীর মূর্খ রাজা একরাজ ধূর্ত

পুরোহিতের পরামর্শে স্বর্গলাভেচ্ছায় সর্বচতুষ্কযজ্ঞ সম্পাদনের জন্য পুত্র চন্দ্রকুমারকে বলি দিতে উদ্যত হলে চন্দ্রকুমারের মাতা গোতমীদেবী নানা ভাবে বিলাপ করিয়াও রাজার মন ফেরাতে পারেননি। চন্দ্রকুমারের স্ত্রী চন্দ্রাদেবী স্বামীর প্রাণের জন্য বিলাপ করতে করতে বলেন—

"বধ আমা দুইজনে, চন্দ্রের সহিত আমি পরলোকে করিব গমন,
মহাপুণ্য হবে তব ; দুজনেই একসঙ্গে বিচরিব সেথা অণুক্ষণ।"

(ঈশান ঘোষ—জাতক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১১০)

রাজা পুত্রবধূকে সান্ত্বনা দিলেন এই বলে—

"মা ত্বং চন্দে রুচ্চি মরণং, বহুকা তব দেবরা,
বিসালক্খি তে তং রমিস্সন্তি যিট্ঠস্মিং গোতমিপুত্তে"
-মরণ কামনা, চন্দে, কেন তুমি কর ? তোমার রয়েছে ঘরে অনেক দেবর।
মরিলে গোতমীপুত্র তাহারাই সবে, বিশালাক্ষি তব মনস্তুষ্টিরত হবে।

(ঈশান ঘোষ—জাতক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১১০)

রাজার এই উক্তিতে বোধ হয় যেন বিধবাদের মধ্যে দেবরকে পতিরূপে গ্রহণ করার প্রথা সূচিত হচ্ছে। প্রাচীন ভারতে স্বামীর মৃত্যুর পর মৃতাত্মার ছোট ভাই (দেবর)-এর সহিত বিবাহ, দেবর বা পরিবারস্থ কোন ঘনিষ্ঠ নিকট আত্মীয়ের, বা অন্য খ্যাতিমান পুরুষের দ্বারা নিজ স্ত্রীতে ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদনের রেওয়াজ যথেষ্ট প্রচলিত ছিল, এর প্রমাণ প্রাচীন সাহিত্যেই পাওয়া যায়।

মহাভারতে (১৩, ১২, ১৯) দেখা যায়—

"নারী তু পত্যভাবে বৈ দেবরং কুরুতে পতিম্ ।"

অগ্নিপুরাণেও (১৫৪ অধ্যায়) লিপিবদ্ধ রয়েছে—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।
মৃতে তু দেবরে দেয়া তদভাবে যথেচ্ছয়া ॥

—"পতি অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, সংসারধর্ম পরিত্যাগ করিলে, ক্লীব স্থির হইলে, অথবা পতিত হইলে, নারীদিগের পক্ষে, অন্য পতি বিহিত হইতেছে। পতির মৃত্যুস্থলে, দেবরে, দেবর না থাকিলে, ইচ্ছামত অন্য পাত্রে সম্প্রদান করিবেক" (বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, বহুপরীক্ষা, পৃঃ ৫২০)।

মনু একস্থানে বলেছেন—(নবম অধ্যায়)

"দেবরাদ্বা সপিণ্ডাদ্বা স্ত্রিয়া সম্যক্‌নিযুক্তয়া।
প্রজেপ্সিতাধিগন্তব্যা সন্তানস্য পরিক্ষয়ে। (৯-৫৯)

—সন্তানের অভাবে, যথাবিধানে নিযুক্তা স্ত্রী দেবর দ্বারা বা সপিণ্ডদ্বারা অভিলষিত পুত্র লাভ করিবেক"।

"বিধবায়াং নিযুক্তস্তু ঘৃতাক্তো বাগ্‌যতো নিশি
একমুৎপাদয়েৎ পুত্রং ন দ্বিতীয়ং কথঞ্চন। (৯—৬০)—ইত্যাদি।

—নিযুক্ত ব্যক্তি, ঘৃতাক্ত ও মৌনাবলম্বী হইয়া, রাত্রিতে সেই বিধবার গর্ভে একমাত্র পুত্র উৎপাদন করিবেক। কদাচ দ্বিতীয় নহে'-ইত্যাদি। এই কয়েকটি শ্লোকের ভাবার্থ অনুসরণ করলে মনে হয়, মনুর সময় পর্যন্ত নিয়োগ প্রথা (ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদনের প্রথা) সমাজে অপ্রচলিত ছিল না। তাই মনু নিয়োগের স্পষ্ট বিধি দিচ্ছেন। কিন্তু মনু স্বয়ং নিয়োগের বিধি দিলেও, ইহা যে তাঁর মনঃপূত ছিল না, তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে পরবর্তী কয়েকটি নিষেধাত্মক শ্লোকে ; আপস্তম্ব ও বৌধায়নের ন্যায় বিরোধীদলভুক্ত হয়ে পুনরায় তিনি নিয়োগের নিষেধ বাণী প্রচার করেছেন। তাঁর মতে এই নিয়োগ প্রথা "পশুধর্ম'," ছাড়া আর কিছুই নয়।

"অয়ং দ্বিজৈর্হি বিদ্বদ্ভিঃ পশুধর্মো বিগর্হিতঃ
মনুষ্যাণামপি প্রোক্তো বেণে রাজ্যং প্রশাসতি ॥

... ...

ততঃ প্রভৃতি যো মোহাৎ প্রমীত পতিকাং স্ত্রিয়ম্।
নিয়োজয়ত্যপত্যার্থং তং বিগর্হন্তি সাধবঃ।" (৯ম, ৬৬, ৬৮)।

মনে হয় আপস্তম্ব, বৌধায়ন ও মনু প্রভৃতি স্মৃতিকারকদের প্রচেষ্টা ও বিরোধিতার সমাজ থেকে ক্রমশঃ এই নিয়োগ প্রথা বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হয় (A S Altekar—The position of women in Hindu Civilisation, p p 143-147)। দেবরের সঙ্গে জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবধূর বিবাহ প্রসঙ্গে গুপ্তদের রাজত্বকালের একটি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। সমুদ্রগুপ্তের জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন রামগুপ্ত। বাণের হর্ষচরিত এবং বিশাখদত্তের নাটক দেবীচন্দ্রগুপ্ত এদুখানি গ্রন্থে লিপিবন্ধ কাহিনী থেকে জানা যায়, যে ছোট ভাই চন্দ্রগুপ্ত (দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত খৃষ্টোত্তর ৩৮০-৪১৪) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামগুপ্তকে হত্যা করে তাঁর বিধবা পত্নী ধ্রুবদেবীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবন্ধ হন। তবে এই তথ্যের পেছনে কোন ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে কিনা, সে বিষয়ে (প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ না পাওয়ায়) কোন কোন ঐতিহাসিক সন্দেহ প্রকাশ করেছেন (H C Ray Chaudhuri—Political History of Ancient India, pp 553-554)।

পালি সাহিত্যে দেবরের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনের কিছু তথ্য পাওয়া গেলেও সন্তান অভাবে দেবরের দ্বারা স্নুতোৎপত্তির বিধান সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত দেখা যায় না।

ঔরসজাত পুত্রাভাবে নিয়োগের দ্বারা পুত্রসন্তান উৎপাদন করার উপর কুশ জাতকটী এক নতুন আলোক সম্পাত করছে। কোন কোন নিঃসন্তান রাজা রাণীগণকে অলঙ্কার পরিয়ে রাজপ্রাসাদের বাইরে ধর্মের নামে ছেড়ে দিতেন। তাঁরা কিছুদিন

অবাধভাবে পুরুষদের সংসর্গ করতেন এবং এরূপ স্বচ্ছন্দবিহারের ফলে কোন-রাণীর গর্ভে যদি কোন পুত্র জন্মাত, তাহলে তাকেই রাজপদ দেওয়া হত। রাণীদের এভাবে পরপুরুষের সংসর্গে এসে পুত্র উৎপাদন করা ধর্মশাস্ত্র-সঙ্গত বলে গণ্য করা হত এবং ইহা কেউ দোষাবহ মনে করতনা। এযেন ধর্মের দোহাই দিয়ে অভিনয় করা ; মনে হয়, মূলে 'ধম্মনাটক' শব্দটির প্রয়োগ এবং ইহার সঠিক তাৎপর্য এভাবে বাঙ্কিত হয়েছে। জাতকে বর্ণিত মূল কাহিনী থেকে জানা যায়, যে মল্লরাজ্যের ইক্ষ্বাকু (ওক্কাক) নামক কোন নিঃসন্তান রাজা প্রজাদের অনুরোধে ১৬০০০ অন্তঃপুরচারিণীদের মধ্য থেকে অল্পসংখ্যক কম বয়সের রাণীদের কয়েকজনকে অভিনেত্রীরূপে ধর্মের নামে নাটক করবার জন্য স্বচ্ছন্দবিহারে প্রাসাদের বাহিরে পাঠিয়ে দেন (চুল্লনাটকং ধম্মনাটকং কত্বা বিস্সজ্জেসি)। কিন্তু কেহই গর্ভবতী না হওয়ায়, দ্বিতীয় দল মাঝারী বয়সের রাণীগণকে (মজ্ঝিমনাটকং) ঐ একই উদ্দেশ্যে পাঠান হয় ; এখানেও ব্যর্থতা দেখে তৃতীয়বার সর্বাপেক্ষা বেশী বয়সের কয়েকজন মহিষীকে (জেট্ঠনাটকং) প্রেরণ করা হয়, কিন্তু এবারও কেহ পুত্রবতী হলেন না। শেষপর্যন্ত অগ্রমহিষী শীলবতীকে এই ধর্মনাটক-অভিযানে পাঠান হয়। শীলবতী দেবরাজ শক্রের কৃপায় এক পুত্র প্রসব করেন এবং এই শিশুর নাম রাখা হয় কুশকুমার। কুশ জাতকের এই বৃত্তান্ত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীন ভারতে কোন সময় রাজারা এই অভিনব নিয়োগ-নীতি অনুসরণ করে ক্ষেত্রজ পুত্র লাভ করতেন এবং এইভাবে রাজবংশ রক্ষা করতেন।

বিবাহ বন্ধন ছেদন ঃ

বিবাহের মোক্ষ (Dissolution of marriage) বা বিচ্ছেদের (Divorce) প্রমাণ স্বরূপ কিছু কিছু উদাহরণ পালিসাহিত্য থেকে আহরণ করা যায়। তবে এ ব্যাপারে কোন আইনের বিধি নিষেধ দেখা যায় না। বিবাহ বিচ্ছেদের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রয়েছে থেরীগাথা এবং থেরীগাথা ভাষ্যে ইসিদাসীর (ঋষিদাসীর) জীবন-চরিতকে কেন্দ্র করে। সে দুবার পিতৃগৃহে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিল। দুবারই বিবাহের পর স্বামীদের মনোমত না হওয়ায়, উভয় স্বামীই তাঁকে তাঁদের গৃহ থেকে বহিস্কৃত করে দেয়। শ্রাবস্তীবাসিনী কোন এক আর্যশ্রাবিকার কন্যা কাণা বিবাহের পর কোন কার্যোপলক্ষ্যে তাঁর মাতার নিকট এসেছিল ; কয়েকদিন পরে তাঁর স্বামী কাণাকে ফিরে আসবার জন্য লোক পাঠালেন। কাণার মাতা জামাইবাড়ী কিছু খাবার পাঠাবার ইচ্ছায় কিছু পিঠে তৈরী করেছিলেন ; কিন্তু পর পর চারজন ভিক্ষু পিঠেগুলো খেয়ে শেষ করাতে কাণার আর সেদিন যাওয়া হল না ; এদিকে কাণার স্বামী বার বার খবর পাঠিয়েও কাণা প্রত্যাবর্তন না করায় কাণাকে পরিত্যাগ করে দ্বিতীয়বার বিবাহ করলেন (বব্বু জাতক, সং ১৩৭)। বুহক নামক এক রাজপুরোহিত তাঁর দুষ্টা স্ত্রীর পরামর্শে রাজসভায় হাস্যাস্পদ

হয়েছিলেন এবং ক্রোধান্ধ হয়ে স্ত্রীকে দূর করেদেন; পরে তিনি ভার্যাত্বির গ্রহণ করেন (রুহক জাতক, সংখ্যা ১৯১)। মজ্ঝিমনিকায়ের পিয়জাতিক সুত্তে (সং ৮৭) দেখা যায় যে, শ্রাবস্তীর জনৈকা রমণী জ্ঞাতিকুলে গিয়েছিল। আত্মীয়গণ তাকে বর্তমান স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন করে অন্যপাত্রে সমর্পণ করতে ইচ্ছুক হয়েছিলেন। কিন্তু এতে সে রাজী হয়নি। কারণ এটা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে। (সাবত্থিয়া অঞ্ঞতরা ইত্থী ঞাতিকুলং অগমাসি। তস্সাতে ঞাতকা সামিকং আচ্ছিন্দিত্বা অঞ্ঞস্স দাতুকামা সাচতং ন ইচ্ছতি)। কিন্তু এখানে বিবাহবিচ্ছেদের কোন কারণ নির্দেশিত হয়নি।

উম্মদন্তী জাতকে (সংখ্যা ৫২৭—আর্যশূরের জাতকমালায়ও দেখা যায়) একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী দেখা যায়। অরিষ্টপুরের রাজা শিবিকুমার তাঁর বাল্যসখা সেনাপতি অহিপারকের পত্নী উন্মাদয়ন্তীর অলৌকিক সৌন্দর্যে কামাভিভূত হয়ে প্রায় মৃতকল্প হয়ে পড়েন। সেনাপতি অহিপারক ইহা জানতে পারে; ঔদার্যবশতঃ স্ত্রীর উপর নিজের স্বত্ব ও অধিকার তুলে নিয়ে সানন্দে রাজাকে উন্মাদয়ন্তীকে সমর্পণ করতে চাইলেন; কিন্তু ধর্মভীরু রাজা কিছুতেই এই অনার্য প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। অহিপারক কি ভাবে রাজাকে উন্মাদয়ন্তীকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করতে অভিলাষী, তা ব্যক্ত করেছেন একটি গাথায়। গাথাটির বঙ্গানুবাদ এখানে উদ্ধার করা যেতে পারে ঃ—

"সে আমার ধর্মপত্নী এই ভাবি যদি—
লইতে তাহারে ইচ্ছা না কর ভূপতি,
সর্বজনে সাক্ষী করে বিবাহ-বন্ধন—
হৃষ্টচিত্তে নবনাথ করিব ছেদন।
মুক্ত আমি এইরূপে করিলে প্রদান—
নিজ পাশে লও তারে করিয়া আহ্বান"

(ঈশান চন্দ্র ঘোষ, জাতক ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৫)

এখানে লক্ষণীয় যে আইনের আশ্রয় না নিলেও, কোন কোন ক্ষেত্রে বিশিষ্ট লোকদের সামনে সাক্ষী রেখে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করবার প্রস্তাব নেওয়া হত।

মাতৃস্নেহ ও ভগ্নীস্নেহ ঃ

আবহমান কাল থেকে পৃথিবীর সর্বত্র নারীরা মাতৃত্বের গৌরবের জন্য সকলের কাছে শ্রদ্ধা, ভক্তি, পূজার পাত্রী হিসেবে গণ্য হয়ে আসছেন। তাঁদের মাতৃত্বের দাবীকে কেউ কখনও উপেক্ষা করতে পারেনি। কয়েকটি জাতকে মাতার অকৃত্রিম অপত্য স্নেহের কথা বিবৃত হয়েছে। সোণনন্দ জাতকে (সংখ্যা ৫৩২) দেখা যায়, সোণ ও নন্দ নামক দুই সহোদর মাতাপিতার সেবা শুশ্রূষা করতেন। কিন্তু পরে বড়

ভাই শোণক ছোট ভাই নন্দের মাতাপিতার সেবা সম্বন্ধে উদাসীন ভাব লক্ষ্য করে তাঁকে ভর্ৎসনা করেন এবং অন্যত্র চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। সাত বৎসর পরে নন্দ প্রত্যাবর্তন করেন এবং বড় ভাই সোণক তাঁকে ক্ষমা করেন; পুনরায় তিনি মাতৃসেবার ভার ছোট ভাই নন্দের উপর ন্যস্ত করেন। নন্দের আগমনে তার মাতা দীর্ঘকাল পুঞ্জীভূত অন্তঃকরণের দুঃখ, দুশ্চিন্তা ও বিরহ-বেদনা থেকে মুক্তি পেলেন। বৃদ্ধা তখন অত্যধিক আনন্দে পুত্রকে বার বার আলিঙ্গন, চুম্বন ও মস্তক আঘ্রাণ করতে লাগলেন। তিনি এইভাবে শোকাপনোদন করে উচ্ছ্বাসে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন ঃ—

"কাঁপে যথা অশ্বত্থের নব কিসলয় বায়ুবেগে, সেই মত কাঁপিছে হৃদয়
শোণক, আমার আজ মহানন্দ ভরে পাইয়া নন্দের দেখা এতকাল পরে ,
নিদ্রিত হইয়া যদি দেখি রে স্বপন আসিয়াছে ফিরে মোর নন্দ বাছাধন,
আনন্দে বিভোর হ'য়ে শয্যা তেয়াগিয়া "এসেছে আমার নন্দ" বলি চেঁচাইয়া।
কিন্তু হায়, জাগি যবে না দেখি বাছারে দ্বিগুণিত শোকে প্রাণ ধড়ফড় করে।
সত্যই সে নন্দ আজ, এত কাল পরে জুড়াতে আমার প্রাণ আ সয়াছে ঘরে।
পিতা-মাতা, উভয়ের নন্দনের যদি কুটিরে প্রবেশ, বাছা, করুক এখনি;
পিতারও সুপ্রিয় পুত্র অনুজ তোমার ঘরে যেতে বাধা তারে দিও নাক আর
দাও অনুমতি তারে করিতে যা চায়; হো'ক নন্দ রত এবে আমার সেবায়।'

এরপর শোণ ছোট ভাই নন্দকে মাতৃসেবায় উৎসাহিত করে দুটী গাথায় মাতার গুণ বর্ণনা করলেন ঃ—

"পারি কি মায়ের দয়া করিতে বর্ণন? সন্তানের একমাত্র মাতাই শরণ।
স্তন্য দিয়া শিশুকালে বাঁচালেন প্রাণ; মাতৃসেবা আমাদের স্বর্গের সোপান,
ধন্য নন্দ! হল তব সার্থক জীবন: করিবেন সেবা তব জননী গ্রহণ,
শৈশবে বাঁচালে মাতা করি স্তন্য দান; রক্ষেন বিপদ হ'তে সন্তানের প্রাণ,
প্রত্যক্ষ দেবতা তিনি, কল্যাণ কারিণী, স্বর্গের প্রশস্ত মার্গ, পুণ্যপ্রদায়িনী;
ধন্য নন্দ! হ'ল তব সার্থক জীবন; করিবেন সেবা তব জননী গ্রহণ।"

এ প্রসঙ্গে মহাসত্ত্ব শোণকুমার আরও কয়েকটি গাথায় মাতা সন্তানের জন্য কত দুঃখকষ্ট সহ্য করে জীবন উৎসর্গ করেন, সেবিষয়ে বিশদভাবে প্রকাশ করেছেন। এই গাথাগুলির মাধ্যমে মাতৃস্নেহের স্বরূপ নিখুঁতভাবে চিত্রিত হয়েছে ঃ—

১। "পুত্ররূপ ফললাভ করিয়া কামনা
করেন জননী কত সেবে নমস্কার;
দেবজ্ঞের কাছে গিয়া করান গণনা,
গর্ভাধিকে অপত্যের কিবা হইবে কুমার।

জন্মনক্ষত্রের যোগে, জন্মঋতুফলে
অথবা নিজের বয়ঃপরিমাণ বলে
নাইত বাছার রিষ্টি শঙ্কান তাহার,
কাঁপে বুক সদা অমঙ্গল আশঙ্কায়।

২। ঋতু-স্নান অন্তে হয় গর্ভের সঞ্চার তাহা হতে জন্মে ক্রমে দোহদ মাতার
দোহদ হইতে হয় স্নেহ আবির্ভাব গর্ভস্থ সন্তান সেই স্নেহ করে লাভ।

৩। এক বর্ষ কিংবা কিছু ন্যূন কাল তার গর্ভিণী বহেন যত্নে গর্ভ আপনার।
অনন্তর যথাকালে সন্তান প্রসবি লভেন সৌভাগ্যবতী জননী পদবী।

৪। কান্দিয়া উঠিলে শিশু স্তন দিয়া মুখে গান গেয়ে, কোলে লয়ে, ঢাকি তারে বুকে,
সস্নেহে করেন শান্ত আনন্দদায়িনী কি দুঃখ তাহার যার আছেন জননী ?

৫। অবোধ সন্তান পাছে কষ্ট কোন পায় উগ্রবাতাতপে, তাই রক্ষিতে তাহায়
জননী সতত ব্যস্ত, তাঁহার মতন দয়াময়ী ধাত্রী আর আছে কোন জন ?

৬। নিজের যে ধন আছে, স্বামীর যে ধন, অতি সাবধানে মাতা করেন রক্ষণ
'পেয়ে ইহা সুখী বাছা পারিবে হইতে' এ আশার অপচয় না দেন ঘটিতে।

৭। ভাগ্যদোষে পুত্র যদি হয় মতিহীন অসীম উদ্বেগে কাটে জননীর দিন।
'ইহা কর, বাছাধন, এইভাবে চলো' অনুক্ষণ মুখে তাঁর একথা কেবল।

৮। পরদারসেবী যদি হয় সে যৌবনে নিশীথ পর্যন্ত থাকে অন্যের ভবনে,
'সন্ধ্যা হ'ল ফিরিল না' এই দুশ্চিন্তায় পথপানে চান মাতা করি হায় হায়।

৯। এত কষ্টে পালিত যে, যদি সেই জন মোহবশে জননীর না করে পালন
মাতৃদ্রোহী নরাধম সেই পাপাত্মার ঘটিবে যন্ত্রনাভোগ নরকে অপার।"

(ঈশান ঘোষ, বঙ্গানুবাদ। জাতক, ষষ্ঠ খণ্ড)

কৃষ্ণা জালীকে অদর্শন হেতু বিয়োগব্যথাতুর রাজকুলবধূ মাদ্রীর মুখনিঃসৃত করুণ বিলাপের কথা বেস্সন্তর জাতকের অনেকগুলি গাথায় অনবদ্য কাব্যময় ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি এত দীর্ঘ (গাথা সংখ্যা ৫৩০—৬০৩) যে এস্থলে উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়। মাতার সঙ্গে সন্তানের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক কুমার জালীর মুখে সুন্দর ও বস্তুময় ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে; কুমার জালী বিলাপ করতে করতে একজায়গায় বলেছেন :—

"সচ্চং কিরে এবং আহংসু
নরা একচ্চিয়া ইধ,
যস্স নত্থি সকা মাতা
পিতা নত্থি তথেব সো—"

"বুঝিলাম, সত্য সেই প্রবাদ বচন, লোকমুখে যাহা আমি করেছি শ্রবণ,
মা যাহার নাই, পিতা সেই অভাগার থেকে ও না-থাকাবৎ ; নামমাত্র সার।"

এই প্রসঙ্গে পিযজাতিক সুত্তে উল্লিখিত মাতার মৃত্যুতে শোকসন্তপ্তা শ্রাবস্তীর জনৈকা নারীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই স্ত্রীলোকটী মাতার মৃত্যুতে উন্মত্তা হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে মাতার অন্বেষণ করতে লাগল এই বলে "আপনারা আমার মাতাকে দেখেছেন? আপনারা আমার মাতাকে দেখেছেন?" (মজ্‌ঝিম নিকায়, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৮)। যদিও মাতৃহত্যা ঘোরতম নৈতিক অপরাধ বলে স্বীকৃত হয়েছে, বৌদ্ধ সাহিত্যে মাতৃঘাতী দু-একজনের উল্লেখ দেখা যায়। বিনয় মহাবগ্‌গে দেখা যায় যে, কোন এক মাতৃঘাতক যুবক শিক্ষার্থী (মাণবক) উপসম্পদা যাচ্‌ঞা করায় বুদ্ধদেব উপালিকে সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দিলেন—"কোন মাতৃঘাতক বা পিতৃঘাতককে উপসম্পদা দেওয়া চলবে না"। (মহাবগ্‌গ পৃঃ ৮৮)। অনাথপিণ্ডদের রোহিণী নাম্নী এক মূর্খ দাসী মাছি মারতে গিয়ে অনবধানতা-বশতঃ তার বৃদ্ধা মাতার শরীরে মুষল দিয়ে এমন আঘাত করেছিল যে তাতেই বৃদ্ধা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হ'ল। (রোহিণী জাতক সংখ্যা ৪৫)।

পিতৃদ্রোহী কুখ্যাত রাজা অজাতশত্রুর সম্বন্ধে একটি বৌদ্ধ কিংবদন্তী মহাযান অমিতায়ুর্ধ্যান-সূত্রে রক্ষিত আছে। অজাতশত্রু পিতা বিম্বিসারকে কারাগারে বন্দী করে রেখেছিলেন এবং একমাত্র তাঁর মাতা কোশলদেবী (বৈদেহী) কারাগারে প্রবেশ করতে পারতেন। এই পতিপ্রাণা সুচতুরা রাজমহিষী কিছু না কিছু আহার্য দ্রব্য নানাভাবে প্রতিদিন নিয়ে যেতেন এবং বিম্বিসারের জীবনশক্তি এই খাদ্যের উপর নির্ভর করত। এতে ক্রোধান্ধ রাজা মাতৃবধের মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অমাত্য চন্দ্রপ্রভ ও রাজবৈদ্য জীব (জীবক)-এঁদের দুজনের সামনেই স্বহস্তে মাতাকে হত্যা করবার জন্য তরবারী কোষমুক্ত করলেন; কিন্তু চন্দ্রপ্রভ ও জীবক এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে বললেন "আপনার মত চণ্ডাল রাজা এইরূপ জঘন্য কাজ করতে উদ্যোগী হয়েছেন; আপনার এই দুষ্কর্মে সমস্ত ক্ষত্রিয় জাতি কলঙ্কিত হবে। যুগ যুগ ধরে শোনা যায় হাজার হাজার রাজ্যলিপ্সু রাজা স্ব স্ব পিতাকে হত্যা করেছে। কিন্তু মাতৃঘাতী কোন রাজার নাম শোনা যায় না। আমরা আপনার রাজসভা পরিত্যাগ করে যাচ্ছি"। এইরূপ ভর্ৎসিত হয়ে অজাতশত্রু ভীত ও সন্ত্রস্ত হলেন এবং ঐ পাপকর্ম থেকে বিরত হলেন (S B E. Vol XLIX, Part, II P. 163)।

ভাই-ভগ্নীর সম্পর্ক ছিল মধুর ও সৌহার্দ্যপূর্ণ। শক্রের ভাষায়-"ভগিনিযো নাম ভাতুসু সস্নেহা"—ভগিনীরা ত ভাইকে বড় ভালবাসে (উরগ জাতক, সংখ্যা ৩৫৪)। "অঙ্গং এতং মনুস্সানং ভাতা লোকে পবুচ্চতি"—বলে লোকে মানুষের অঙ্গতুল্য ভাই (মংস জাতক, সংখ্যা ৩১৫)। ভাইয়ের প্রতি ভগিনীর অপরিসীম

স্নেহের একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় উচ্ছঙ্গ-জাতকে (সংখ্যা ৬৭)। এক রমণীর একজন স্বামী, একজন ভ্রাতা ও একজন পুত্র-এই তিন জনেই নির্দোষ ছিল ; কিন্তু ভ্রান্তিবশতঃ দণ্ডিত হয়ে বন্দী অবস্থায় এদেরকে রাজসমীপে উপস্থিত করা হয়। রাজা রমণীকে বলেন, যে তিনি এই তিনজনের মধ্যে কেবলমাত্র একজনকেই মুক্তি দিতে পারেন এবং জিজ্ঞাসা করেন যে সে তিন জনের মধ্যে কার মুক্তি প্রার্থনা করে। তখন সেই রমণী কেবলমাত্র ভাইয়ের মুক্তি প্রার্থনা করে, কেননা পুত্র ও স্বামী সুলভ, কিন্তু ভ্রাতা দুর্লভ। এরূপ প্রার্থনার কারণ ঐ রমণী রাজাকে একটি গাথার সাহায্যে প্রকাশ করে ঃ—

"কোলে ছেলে পথে পতি, সহজেই পাই ,
কিন্তু কোথা, মহারাজ, মিলিবেক ভাই।"
"উচ্ছঙ্গে দেব মে পুত্তো, পথে ধাবন্তিয়া পতি,
তঞ্চ দেসং ন পস্সামি যতো সোদরিযম আনযেতি"

তুলনীয় শ্রীরামচন্দ্রের উক্তি—

"দেশে দেশে কলত্রানি, দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ,
তং তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ"।

(রামায়ণ, ৬ : ১০২. ১৪)

রাজা রমণীর উক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে তিন জনকেই মুক্তি দিলেন।

নারীদের মাহাত্ম্য ও পাতিব্রত্য ঃ

বৌদ্ধ সাহিত্যের নানা গ্রন্থে নারীদের মাহাত্ম্য ও গৌরবের বিষয় কীর্তিত হয়েছে। প্রাচীন ভারতে নারীকে শ্রেষ্ঠ সম্পদরূপে গণ্য করা হোত—"ইত্থী ভণ্ডানম উত্তমং" (সংযুক্ত নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৩), কারণ তাঁর প্রয়োজন অপরিহার্য ; তাঁর গর্ভেই বোধিসত্ত্ব ও পৃথিবীর মহাপুরুষেরা জন্মগ্রহণ করেন (টীকা গ্রন্থ)। ভার্যাই কুলায় (কুলাবক) সদৃশ (গৃহ বা আশ্রয়স্থল স্বরূপ)। "ভরিযং রূমি কুলাবকং" (সংযুক্ত নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮)। এই উক্তিটী মহাভারতের (১২.১৪৪.৬) একটি শ্লোকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—"ন গৃহং গৃহমিত্যাহুঃ, গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। গৃহং তু গৃহিণী হীনং কান্তারাদতিরিচ্যতে"। সংযুক্ত নিকায়ে (১ম,৬,৪) আবার ভার্যাকে বিশ্বাসী বন্ধু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে - "ভরিযা চ পরমা সখা"। কারণ যে রহস্য অন্যের কাছে প্রকাশ করা যায় না, তা একমাত্র স্ত্রীর কাছেই উদ্ঘাটন করা যায় (টীকা গ্রন্থ)। অঙ্গুত্তর নিকায়েও (১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮২) রহস্য গোপন রাখার দিক দিয়ে বিচার করলে স্ত্রীই বিশ্বাস-ভাজন বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। মহাহংস জাতকের (সংখ্যা ৫৩৪) কয়েকটী গাথায় স্বল্প কথার মাধ্যমে নারী জাতির বৈশিষ্ট্য ও তাঁর মহিমা প্রকাশিত হয়েছে। গাথাগুলির বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করছি ঃ—

"জ্ঞানবৃদ্ধগণ যাহা জেনেছেন সত্য বলি, নিন্দিতে তা' সাধ্য আছে কার ?
নানাগুণে গুণবতী সত্যই রমণীজাতি কল্পারম্ভে আদ্যা সৃষ্টি যার।
কেলি, রতি আদি নানা প্রাণীদের সুখ যত, সকলেরই রমণী নিদান।
গর্ভে থাকি তাহাদের বীজ হয় অঙ্কুরিত, লভে জীব নিজ নিজ প্রাণ।
প্রাণ-প্রদায়িনী যারা, এমন রমণীগণে কে করিতে পারে হীনজ্ঞান ?

(ঈশান ঘোষ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২২৯)।

নানাগুণ সমন্বিতা স্বামীর ইচ্ছানুবর্তিনী বিশুদ্ধচরিত্রা, রূপবতী, পুত্রবতী ভার্যা লাভ করা ছিল পুরুষের একান্ত কামনা, বাসনা। জাতকের অনেকগুলি গাথায় এই ভাব প্রকাশিত হয়েছে :—

"ভার্যা ত সদৃশী তব বংশে আর গুণে
প্রফুল্ল-অন্তরে আত্মবহন-তৎপরা
ছন্দানুবর্তিনী সদা মধুরভাষিণী,
চরিত্রে বিশুদ্ধা, পুত্রবতী, রূপবতী ?"

(চুল্লহংস ও মহাহংস জাতক সংখ্যা ৫৩৩ ও ৫৩৪)।

সুধাভোজন জাতকের একটী গাথায়ও অনুরূপ ভাব ব্যক্ত হয়েছে :—

"গৃহে পতিব্রতা নারী, সুশীলা সদ্বংশজাতা,
রূপে গুণে সদৃশী ভর্তার,
তাহার সংসর্গে থাকি, বাসনা সংযত করি
পারে লোকে করিতে সংসার"। (জাঃ ৫৩৫)

স্বামীর প্রতি আনুগত্য, পাতিব্রত্য ও সতীত্ব রক্ষা করা ছিল প্রাচীন ভারতীয় নারীর চিত্তাদর্শ। পালি সাহিত্য থেকে পতিব্রতা নারীর দৃষ্টান্ত প্রচুর সংগ্রহ করা যায়। সম্বুলা জাতকে (সং—৫১৯) একটী সুব্রতা পতিপরায়ণা নারীর আদর্শ চরিত্রের কথা বিবৃত হয়েছে। বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের স্বস্তিসেন নামক পুত্র উপরাজা ছিলেন। তার প্রধানা মহিষী সম্বুলা রূপবতী, জিতেন্দ্রিয়া ও পতিব্রতা রমণী ছিলেন। তিনি কিছুকাল কুষ্ঠগ্রস্ত স্বামীর সঙ্গে বনবাসে কাটান এবং নিয়ত রাজকুমারের সেবাশুশ্রূষায় রত থাকেন। একদিন স্বামীর জন্য ফল আহরণকালে এক দানবের দ্বারা আক্রান্ত হন এবং তাঁর শীলতেজে দেবরাজ শক্র সম্বুলাকে দানবের হাত থেকে মুক্ত করেন। বিলম্ব হওয়ায় সম্বুলার চরিত্র সম্বন্ধে রাজপুত্রের সন্দেহ জন্মে। সম্বুলা নিজের সুচরিত্রের প্রভাবে সত্যক্রিয়া দ্বারা স্বামীকে নীরোগ করেন। কিন্তু এই অকৃতজ্ঞ রাজকুমার গৃহে ফিরে স্বয়ং রাজা হয়ে সম্বুলার অস্তিত্ব পর্যন্ত বিস্মৃত হয়ে অন্যান্য নারীদের সহিত আমোদ-প্রমোদে মত্ত হয়ে পড়েন। স্বামীর এই অবহেলায় তাঁর অন্তরে যে কি গভীর বেদনার সৃষ্টি

-করেছিল তা তাঁর উক্তি থেকে সহজে অনুমান করা যায়; তিনি ক্ষোভে, দুঃখে এই কথা ব্যক্ত করেছেন :—

"অন্নপান সুপ্রচুর রহিয়াছে ঘরে সমুজ্জ্বল নানা অলংকার সদা পরে;
আছে রূপ, আছে গুণ, পতিপ্রেম বিনা থাকতে এসব কিন্তু নারী অতি দীনা।
দীনা, নিঃস্বা, তৃণশয্যাশায়িণী যে নারী সেও যদি হয় পতিপ্রেম-অধিকারী,
ধন্যা সে রমণীকুলে, বঞ্চিতা যে জন পতিপ্রেমে, বৃথা তার রূপ আর ধন।"

পরে তাঁর পিতা রাজতপস্বীর উপদেশে মতপরিবর্তন হয়। অতঃপর তাঁরা দুজনে -সম্প্রীতিভাবে বাস করতে থাকেন।

আর একজন পতিব্রতা রমণীর নাম এখানে স্মরণীয়; তিনি ছিলেন গৌতম বুদ্ধের পত্নী যশোধরা (বা গোপা বা বিম্বাদেবী), যিনি পালি সাহিত্যে রাহুল-মাতা বলে বিশেষভাবে পরিচিতা। কোন এক সময় গৌতম বুদ্ধ কপিলবস্তুতে -রাহুল মাতার গৃহে উপস্থিত হন; ঐ সময়ে রাজা শুদ্ধোদন পুত্রবধূর গুণকীর্তন করতে আরম্ভ করেন; এগুলিতে পতিব্রতা রমণীর বাস্তবচিত্র ফুটে উঠেছে। এ থেকে জানা যাচ্ছে যে, ইনি যখন শুনলেন সিদ্ধার্থ কাষায়বস্ত্র ধারণ করেছেন, তখন নিজেও চিবরধারিণী হলেন; যখন শুনলেন তাঁর স্বামী আর মাল্যগন্ধ্যাদি ব্যবহার করেন না, তখন নিজেও ঐ সকল বিলাসদ্রব্য ত্যাগ করলেন এবং ভূমিশয্যায় শয়ন করতে আরম্ভ করলেন। এই সময় অনেক রাজকুমার পাণি প্রার্থী হয়ে এঁর কাছে অনেক উপহার প্রেরণ করেন; কিন্তু তিনি এসমস্ত প্রত্যাখ্যান করলেন। কারণ তিনি সিদ্ধার্থ ভিন্ন অন্য পুরুষের কথা হৃদয়ে স্থান দেন নাই (চন্দ্রকিন্নর জাতক, সংখ্যা ৪৮৫)। স্বামী ও পুত্রের প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর, ইনিও গার্হস্থ্য জীবন ত্যাগ করে ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করেন (জাঃ সংখ্যা ২৮১)।

বিম্বিসার-মহিষী কোশলাদেবী ছিলেন আর একজন পতিপ্রাণা মহিলা। পিতৃদ্রোহী অজাতশত্রু অনশনের দ্বারা পিতার জীবনান্ত ঘটাবার জন্য নৃপতি বিম্বিসারকে এক উষ্ণগৃহে বা কারাগারে বন্দী করে রাখেন। কারাগারে রাজ-মহিষী ভিন্ন অন্য কারও প্রবেশ করবার অনুমতি ছিল না। মহিষী গোপনে পোষাকের তলায় একটী খাদ্যপূর্ণ স্বুবর্ণপাত্র লুকিয়ে নিয়ে স্বামীর নিকট উপস্থিত -হতেন। অজাতশত্রু জানতে পেরে এইভাবে খাদ্য সরবরাহ করা বন্ধ করলেন। তখন মহিষী নিজের কেশদামের মধ্যে খাদ্য লুকিয়ে রেখে যেতে আরম্ভ করলেন। পরে ইহাও প্রকাশিত হবার পর সোনার পাদুকার মধ্যে খাদ্য লুকিয়ে কারাগারে প্রবেশ করতেন। কিন্তু এটাও জানাজানি হয়ে গেল। তখন তিনি নিজের শরীরে চার প্রকার মধু মাখিয়ে যেতেন। বিম্বিসার তাঁর দেহ লেহন করে জীবন -ধারণ করতেন। পরিশেষে অজাতশত্রু মহিষীর কারাগৃহে প্রবেশ সম্পূর্ণ বন্ধ

করে দিলেন। খাদ্যাভাবে বিম্বিসারের জীবনাবসান হল (D. P P N. Vol II P-287 ; অমিতায়ুধ্যান সূত্র)। বিম্বিসারের মৃত্যু হলে, এই পতিব্রতা মহিষী স্বামীর মৃত্যুতে শোকে মোহ্যমান হয়ে অচিরে প্রাণত্যাগ করেন (হরিতমাত জাতক, সংখ্যা ২৩৯)।

দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কোশলরাজ প্রসেনজিতের অগ্রমহিষী মল্লিকার নামও উল্লেখ করা যেতে পারে। মল্লিকাদেবী রাজার অতি প্রিয় ছিলেন। তিনি পতিব্রতা ছিলেন এবং পূর্বোত্থানাদি (স্বামীর পূর্বে শয্যা ত্যাগ প্রভৃতি) পঞ্চ কল্যাণ-ধর্ম পালন করে নিয়ত পতিসেবা করতেন। বুদ্ধদেবও মল্লিকাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন (জাতক সংখ্যা ৪১৫)। কিন্তু এই কর্তব্যপরায়ণা স্বামী সোহাগিনী মহিষীরও মাঝে মাঝে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটত। প্রবাদ আছে যে কোন এক সময় মল্লিকাদেবী প্রসেনজিতের সহিত কলহ-বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়েন। লোকেরা এই বিবাদকে 'শয়ন-কলহ' বলত। রাজা মল্লিকার উপর এত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে রাজা মল্লিকার অস্তিত্বের কোন খোঁজখবর নিতেন না। যাহা হোক, শেষ পর্যন্ত ভগবান বুদ্ধ এই দম্পতিদের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপন করেন ; তদবধি প্রসেনজিত ও মল্লিকা উভয়েই সম্প্রীতভাবে জীবন যাত্রা নির্বাহ করতে থাকেন। (সুজাতা জাতক, সংখ্যা ৩০৬)।

যদিও নারীদের শুচিতা ও সতীত্ব রক্ষা করা ছিল তৎকালীন সমাজের আদর্শ, তাসত্বেও ব্যাভিচারের মাত্রা যে বড় কম ছিল, তা বলা যায় না। নারীদের লাম্পট্য ও ব্যাভিচারের বেশ কিছু দৃষ্টান্ত জাতক কাহিনীতে লক্ষ্য করা যায়। ভ্রষ্টা-চরিত্রের নারীদের ব্যাভিচারের প্রমাণ পাওয়া গেলে তাদের দণ্ড, ভোগ করতে হোত ; নানা প্রকার কারাদণ্ড, কায়িক দণ্ড অঙ্গচ্ছেদ, এমন কি ভীষণ মৃত্যুদণ্ডের পর্যন্ত ব্যবস্থা করা হত (কুণাল জাতক, সংখ্যা ৫৩৬)। চুল্ল পদ্ম জাতকে (সং ১৯৩) দেখা যায় কোন এক ব্যাভিচারিণীর প্রাণদণ্ড উপযুক্ত শাস্তি বলে বিবেচিত হলেও, কেবলমাত্র নাসাকর্ণছেদনের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামনীচণ্ড জাতকে (সং-২৫৭) দেখা যায়, রাজা এক ভ্রষ্ট-চরিত্রা নারীকে ভবিষ্যতে সাধ্বী স্ত্রীর ন্যায় স্বামী ঘর করতে না পারলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করবেন বলে ভয় দেখিয়েছিলেন।

লিচ্ছবিকুলের কোন এক ব্যক্তি তার চরিত্র-ভ্রষ্টা স্ত্রীকে স্বহস্তে হত্যা করবার কথা লিচ্ছবিগণ-পরিষদে উত্তোলন করেছিলেন, যদিও শেষ পর্যন্ত তার স্ত্রী কোন রকমে ভিক্ষুণীসঙ্ঘে প্রবেশ করে নিজের প্রাণ বাঁচিয়েছিল (বিনয়পিটকং ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২২৫-২৬)।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে প্রাচীন ভারতে সতীত্ব প্রমাণের জন্য অগ্নিপরীক্ষার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তার সাক্ষ্য রয়েছে অণ্ডভূত জাতকে (সংখ্যা ৬২)।

অবরোধ প্রথা ঃ

বৌদ্ধসাহিত্যে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যায় সেগুলো থেকে প্রাচীন ভারতে কঠোর অবরোধ প্রথা কতখানি মেনে নেওয়া হত তা বলা কঠিন। তবে এখনকার দিনের মত সে যুগে নারীর সামাজিক স্বাধীনতা কম ছিল। সাধারণতঃ প্রাসাদান্তঃপুরের রাজপত্নীদের বোঝাবার জন্য "ওরোধা" শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায় (জাতক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৫,২১, ৩২৮, ৪৬৫)। সম্ভবতঃ রাণীরা যতটা অন্দরমহলে সম্ভব লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে প্রাসাদে বসবাস করতেন। রাজান্তঃপুরের রাণী, রাজকন্যা বা অভিজাত পরিবারের মহিলারা কোথাও যেতে হলে আবৃত রথ কিম্বা অন্য কোনও আবৃত যানে (পটিচ্ছন্ন যানেন বা পটিচ্ছন্ন যোগেন) যাতায়াত করতেন (জাতক, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪০৯ ; ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩১, ৩৩, ১৬৭, ৪৯৮)। সম্ভ্রান্ত-বংশের মেয়েরা স্বাধীনভাবে সচরাচর চলাফেরা করতেন না ; উৎসবের উপলক্ষে অবশ্য অনুচর-পরিবৃত হয়ে তাঁরা পদব্রজে নদীতে স্নানের জন্য যেতেন। উৎসবের দিনে অনেক সময় অভিজাত ক্ষত্রিয় পরিবারের যুবকেরা মনোমত সমপদস্থ জাতি-কুলের কোন মেয়েকে দেখে মালা পরিক্ষেপের দ্বারা বরণ করার অভিপ্রায়ে নদীতীরে পথিপার্শ্বে দাঁড়িয়ে থাকত।

পনর-ষোল বছর বয়সের বিসাখাও এমন একটী দিনে সর্বালঙ্কারে বিভূষিতা হয়ে স্নানার্থে নদীতীরে উপস্থিত হন (ধম্মপদট্ঠকথা, ১ম খণ্ড, বিসাখার বথ্থু)। দীনদরিদ্র ঘরের মেয়েরাও স্বামীর সঙ্গে সুরঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করে, গন্ধমাল্যাদির দ্বারা সুসজ্জিত হয়ে নগরোৎসবে যোগদান করত (জাতক সংখ্যা, ১৪০, ৪২১)।

সমাজের সাধারণ স্তরের মেয়েদের, যাদের হাটে-বাজারে মাঠে বা বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে জীবিকা নির্বাহ করতে হত, তাদের মধ্যে অবগুণ্ঠন প্রথা খুব যে চালু ছিল তা মনে হয় না ; কিন্তু সম্ভ্রান্ত পরিবারের কুলমহিলারা- বিশেষতঃ বিবাহিত জীবনে অবগুণ্ঠন প্রথা মেনে চলতেন, কারণ অবগুণ্ঠন ছিল তাঁদের কুলমর্যাদা জ্ঞাপনের অন্যতম অভিজ্ঞান। কিন্তু তাদের মধ্যেও যে কেউ কেউ এই প্রথার বিরুদ্ধে আপত্তি জানাতেন, তা ললিতবিস্তরে বর্ণিত সিদ্ধার্থের বিবাহ কাহিনী থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। কথিত আছে যে দণ্ডপাণি শাক্যকন্যা গোপা নববধূ শ্বশুর বা শাশুড়ী বা অন্যান্য অন্তঃপুরচারিগণকে দেখে অবগুণ্ঠন দ্বারা মুখ আবৃত করতেন না (গোপা শাক্যকন্যা ন কঞ্চন দৃষ্ট্বা বদনং ছাদয়তি স্ম) বলে অনেকের মধ্যে কানাঘুষা হতে লাগল। তেজস্বিনী গোপা ইহা বুঝতে পেরে সকলের সামনে যুক্তি দিয়ে এ প্রথার বিরোধিতা করলেন। তাঁর যুক্তি ছিল ঃ—

"যে কায়সংবৃতা গুপ্তেন্দ্রিয়াঃ স্থানিবৃতাশ্চ
মনঃ প্রসন্না কিং তাদৃশানাং বদনং প্রতিচ্ছাদয়িত্বা—

সমুদায় শারীরিক দোষ সংযত করিয়া যাহারা সংবৃতকায়, যাহাদের ইন্দ্রিয়সকল

বশীভূত, সকল বিষয়ে নিবৃত্তচিত্ত, মন প্রসন্ন, তাদৃশ নারীর অবগুণ্ঠন দ্বারা বদন-ঢাকিবার আর প্রয়োজন কি?" (ললিতবিস্তর, দ্বাদশ পরিবর্ত)।

এখানে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে বিবাহের পর বিসাখা যখন শ্বশুরালয়ে গমন করেন তখন অনাবৃত রথে চড়ে তিনি শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করেন (ধম্মপদট্ঠ-কথা বিসাখায় বত্থু)। যা হোক, এ সমস্ত দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় যে অবরোধ বা অবগুণ্ঠন প্রথা সবসময় সর্বক্ষেত্রে কঠোরভাবে অনুসরণ করা হত না।

অভিসারিকার ভূমিকায় যুবতী মেয়েরা নারী-পুরুষদের মিলনস্থান 'সংকেতে' উপস্থিত হতেন। এখানে নারী-পুরুষদের অবাধ মিলন ঘটত নানা প্রকার আমোদ-প্রমোদ ও প্রণয়ের ব্যাপারে। এই সংকেতে মেয়েরা পছন্দমত পতিও খুঁজে বার করতেন (অশ্বচোর-জাতক, সংখ্যা ৩৪৪)।

রমণীদের রাজ্য শাসন ঃ

দু-তিনটী জাতক থেকে প্রমাণিত হয় যে নারীরাও সময় সময় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতেন ও রাজার অনুপস্থিতে রাজকার্য পরিচালনা করতেন। কাশীরাজের পুত্র উদয়ভদ্রের সহিত তাঁর বৈমাত্রেয় ভগিনী উদয়ভদ্রার বিবাহ হয়। উদয়ভদ্রের মৃত্যুর পর অগ্রমহিষী উদয়ভদ্রা রাজপদে প্রতিষ্ঠিতা হন এবং তাঁর আত্মীয় অমাত্যগণ রাজ্যশাসন করতে থাকেন। (উদয় জাতক, সং ৫৫৮)।

আর এক সময় বারাণসীরাজ এসুকারী রাজ্য ত্যাগ করে সন্ন্যাসধর্ম (প্রব্রজ্যা) গ্রহণ করায় রাজপদ শূন্য হয়। এতে নাগরিকবৃন্দ চিন্তিত হয়ে রাজদ্বারে সমবেত হন এবং মহিষীকেই রাজ্য শাসন করবার জন্য প্রার্থনা জানান ঃ—

"রাজা চ পব্বজ্জম্ অরোচয়িত্থ
রট্ঠং পহায় নরবীরসেট্ঠো,
তুবম্ পি নো হোহি যথেব রাজা,
অম্হেহি গুত্তা অনুসাস রজ্জন তি"

গাথমাহ (জাঃ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৮৭)

—"রাজ্য ত্যজি নরনাথ যথারুচি করেছেন প্রব্রজ্যা গ্রহণ,
রক্ষিব তোমায় মোরা, পাল রাজ্য এবে, দেবি, রাজার মতন।"

(ঈশান ঘোষ, হস্তিপাল জাতক, সংখ্যা ৫০৯)

কিন্তু মহিষী, প্রব্রজ্যার দিকে মন আকৃষ্ট হওয়াতে, রাজী হলেন না।

কুশ জাতকে (৫৩১) বর্ণিত আছে যে প্রভাবতীকে পিত্রালয় থেকে ফিরিয়ে আনবার জন্য যাত্রাকালে কুশকুমার জননী শীলাবতীকে তাঁর অনুপস্থিতে রাজ্য শাসন করবার জন্য অনুরোধ করেন; শীলাবতী এতে তাঁর সম্মতি প্রকাশ করেন এবং রাজ্যের শাসন ভার গ্রহণ করেন।

নাবী-ধাত্রী ঃ

নাবীবা কখনও কখনও বাজা, শ্রেষ্ঠী, ও অন্যান্য সম্পন্ন অভিজাত পবিবাবদেব গৃহে শিশুধাত্রীব কাজও গ্রহণ কবতেন। চুল্লপলোভন (২৬৩)। সম্ভ (৩১০), অবোঘর (৫১০) প্রভৃতি একাধিক জাতকে দেখা যায় যে ধাত্রীদেব হাতে বাজকুমাবদেব শৈশবকালে লালন পালনেব ভাব দেওয়া হত। মূগপক্‌খ ও বেস্সন্তব জাতক থেকে জানা যায় যে তখনকার দিনে বাজাবা সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গী নিযে ধাত্রীদেব নিযুক্ত কবতেন, যাঁবা শিশুগণকে মাযেব বদলে স্তন্য পান কবান। কাশীবাজ তাঁর অগ্রমহিষী চন্দ্রাদেবীর সদ্যপ্রসূত পুত্রসন্তানেব জন্য সর্ববিধদোষবর্জিতা অতিদীর্ঘাদি-দোষবহিতা ৬৪ জন ধাত্রী (Wet-nurse) নিবোগেব কথা এবং এব সঙ্গে দোষগুলিবও পবিষ্কাবভাবে উল্লেখ দেখা যায (মূগপক্‌খ জাতক, সংখ্যা ৫৩৮)। পুষতীপুত্র বেস্সন্তবেব জন্যও অনুরূপ দোষাদিবহিতা চৌষট্টিজন ধাত্রী নিযুক্ত হযেছিল (জাতক সংখ্যা ৫৪৭)। দোষগুলি বিশেষভাবে বর্ণিত হযেছে—ধাত্রীব দেহ অতিরিক্ত লম্বা হলে, তাঁব কোলে বসে স্তন্যপান কববার সময় গ্রীবাব বিস্তাব কবতে হয বলে শিশুব গ্রীবা দীর্ঘ হযে থাকে ; আবাব ধাত্রী যদি খর্বকায়া হয, তাহলে স্তন্যপান কববার সময কাধেব হাড উৎপীডিত হয , ধাত্রী অতিকৃশা হলে স্তন্যপানকালে শিশুব উরুতে ব্যথা হয (উবা রুজন্তি) , সে অতিস্থূলা হলে কক্ষে বসে স্তন্য পান করতে কবতে শিশুব পাদুটি বেঁকে গিযে বিকৃতাকাব হয (খলঙ্কপাদা হোন্তি) ; ধাত্রীব গাযেব বং খুব কালো হলে তাঁব শবীর বা ক্ষীর অতিশীতল এবং অতি গৌববর্ণ হলে অত্যুষ্ণ হয ; ধাত্রীর স্তন বেশী ঝুলন্ত হলে স্তন্যপান করতে কবতে শিশুব নাসাগ্র চাপে চাপে চেপটা হযে যায (উগ্‌গীলিত-নাসগ্‌গা) , কোন কোন ধাত্রীব স্তনেব দুগ্ধ অম্লদোষযুক্ত , কারও কাবও আবাব কটু বা অন্যভাবে বিস্বাদ—এসব কাবণে সর্বদোষবর্জিতা ধাত্রী নিযোগেব ব্যবস্থা কবা হযেছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, যে শল্যবিদ্ ভিষক সুশ্রুত ও শিশুব জন্য যথেষ্ট যোগ্যতাসম্পন্না ধাত্রী নিযোগের ওপব গুরুত্ব আরোপ কবেছেন। যে ধাত্রী শিশুকে মাযেব বদলে স্তন্যপান কবিযে লালন পালন কবে (Wet-nurse), তাকে পবীক্ষা-নিবীক্ষা ও বিচার বিবেচনা কবে নির্বাচন কবা সমীচীন। সুশ্রুত-সংহিতায (শবীব-স্থানম্, দশম পবিচ্ছেদ) শিশুধাত্রীব কতকগুলি বিশেষ বিশেষ দোষ-গুণ বিষযক লক্ষণ বিশদভাবে বর্ণিত হযেছে। কিন্তু এই আযুর্বেদ গ্রন্থে স্তন্য ধাত্রীব দোষ ও তাব আনুষঙ্গিক অনিষ্টকব ফলাফল জাতকেব ন্যায অত সূক্ষ্মভাবে আলোচিত হযনি।

দিব্যাবদান ও অবদান শতকেব কতকগুলি কাহিনীতে বাজা, শ্রেষ্ঠী, সামন্ত ও অন্যান্য অভিজাত শ্রেণীব পবিবাবেও পুত্র-কন্যা নির্বিশেষে শিশুসন্তানদের জন্য নিম্নলিখিত চাব শ্রেণীর ধাত্রী নিযুক্ত করা হত। প্রত্যেক শ্রেণীব দুজন দুজন

করে ধাত্রী শিশুসন্তানদের লালন-পালনের ভার গ্রহণ করতেন—(১) অংস বা অঙ্ক ধাত্রী, যাঁরা শিশুকে কাঁধে-কোলে বসিয়ে পরিকর্ষণ দ্বারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বৃদ্ধির সহায়তা করতেন। (২) মলধাত্রী, যাঁরা শিশুর স্নান, পোষাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য মল পরিষ্কার করতেন (৩) স্তন্যধাত্রী, যাঁরা শিশুদের স্তন দুগ্ধ পান করাতেন ; (৪) ক্রীড়াপনিকা বা ক্রীড়নিকা যাঁরা শিশুদের ক্রমিক বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আনুপাতিক নানারকম খেলনার সাহায্যে শিশুর তৃপ্তিসাধন করতেন।

জৈন শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের "নায়াধম্মকহাও" নামক (ষষ্ঠ অঙ্গ) গ্রন্থেও পাঁচ রকমের ধাত্রীদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—(১) খীর ধাত্রী (Wet-nurse)। (২) মণ্ডন ধাত্রী (toilet-nurse), (৩) মজ্জণ ধাত্রী (bath-nurse), (৪) কিড্ডণ (play-nurse) এবং (৫) অঙ্ক ধাত্রী (lap-nurse)।

উপরে উল্লিখিত বৌদ্ধকাহিনীগুলির সাক্ষ্য প্রমাণের দ্বারা সহজে উপলব্ধি করা যায় যে বুদ্ধের সমসাময়িক ও পরবর্তীকালে শিশুপালন ব্যবস্থা ও ধাত্রী বিদ্যা কতখানি উন্নত মানের ছিল।

মেয়েদের মধ্যে যুবতী মেয়েরা ও যে দেবদাসী-বৃত্তি গ্রহণ করতেন এর কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় বুদ্ধঘোষের 'দেবদাসী-পগ্গহ' শব্দটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে (সুমংগলবিলাসিনী-১ম খণ্ড,)। দেবদাসীদের শরীরকে আশ্রয় করে দেবতাদের প্রশ্নোত্তরে দৈববাণী শোনা হত ; বুদ্ধঘোষ সম্ভবতঃ দেবদাসী-প্রথার প্রচলন সম্বন্ধে কিছুটা ইঙ্গিত দিচ্ছেন। এঁরা রাজতরংগিনী ও রামচরিতে মন্দিরের নর্তকী হিসেবে উল্লিখিতা হয়েছেন।

দাসীদের অবস্থা ঃ

সেকালে অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষেও দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল। অবস্থাপন্ন লোকেরা মূল্য দিয়া দাসদাসী ক্রয় করতেন। শত্রুভস্ত্রা জাতকে দেখা যায় যে, এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর তাগাদায় একজন দাস ও একজন দাসী ক্রয় করবার জন্য ভিক্ষা করে ৭০০ কার্ষাপণ সংগ্রহ করেন। বেসন্তর জাতকে দেখা যায় যে, জুজক নামক এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভিক্ষালব্ধ একশত কার্ষাপণ আর একজন ব্রাহ্মণের নিকট গচ্ছিত রেখেছিলেন ; কিন্তু ঐ ব্রাহ্মণ জুজকের সঞ্চিত ধন নিজে খরচ করেন ; কিন্তু ফেরত না দিতে পারায়, উহার বিনিময়ে তাকে নিজের কন্যা অমিত্র-তাপনাকে ভার্যা হিসেবে সম্প্রদান করেন। এই দাসীদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। নামসিদ্ধিক জাতকে দেখা যায়, ধনপালী নাম্নী এক দাসীর প্রভু ও প্রভুপত্নী তাকে অপরের বাটীতে খাটিয়ে ধনোপার্জন করাত এবং একদিন সে কিছুই রোজগার করে আনতে পারেনি বলে দাসীকে তারা দ্বারদেশে ফেলে প্রহার করতে শুরু করল। বারাণসীর কোন এক শ্রেষ্ঠীর দুষ্টকুমারী নাম্নী এক প্রচণ্ডা ও

পরুষভাষিণী কন্যা ছিল। সে নিয়ত দাসদাসীগণকে কটু কথা বলত, সময়ে সময়ে প্রহারও করত (তক জাঃ সংখ্যা ৬৩)। মজ্‌ঝিমনিকায়ের ককচূপম সুত্ত (সুত্ত সংখ্যা ২১ পৃঃ ১২৫-১২৬) থেকে গৃহকর্ত্রীর দুর্ব্যবহারের একটী করুণ কাহিনী জানা যায়। শ্রাবস্তীর কোনও গৃহস্থের পত্নী বেদেহিকার কালী নামে এক দাসী ছিল। অত্যন্ত নিপুণতা ও যোগ্যতার সহিত সে তার দৈনিক কাজকর্ম সম্পন্ন করত। গৃহস্বামীনীর যশ তারই কৃতিত্বের জন্য কিনা, নিরূপন করবার জন্য কালী একদিন বেলা করে শয্যাত্যাগ করল; ইহাতে গৃহস্বামীনী একটু বিরক্তি প্রকাশ করল; দ্বিতীয় দিনেও আর একটু বেশী তিরস্কার করল, তৃতীয় দিনে গৃহকর্ত্রী কালীকে অর্গলসূচি দিয়ে এমন প্রহার করল যে তাতে তার মাথা ফেটে গিয়েছিল। কোশলের থূণ নামক ব্রাহ্মণ-গ্রামের এক ব্রাহ্মণের দাসী জল আনতে গিয়ে বৃক্ষতলে উপবিষ্ট বুদ্ধকে দেখতে পেয়ে, পাত্র থেকে বুদ্ধকে পানীয় জল দেয়। ব্রাহ্মণ এই কথা শুনে ক্রোধান্ধ হয়ে দাসীকে নির্মম ভাবে প্রহার করে এবং দাসীটীর এতে মৃত্যু ঘটে। (বিমানবথুভাষ্য, পৃঃ ৪৫-৪৭)। বিমাবথুভাষ্য গ্রন্থে (পৃঃ ২০৬ ২০৯) আর একটি করুণ কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। গয়াগ্রামের এক ব্রাহ্মণ-কন্যা শ্বশুর-বাড়ীতে এসে গৃহকর্ত্রী হন। কিন্তু এই মহিলা একটি দাসীর কন্যাকে সহ্য করতে পারতনা; অকারণে মেয়েটিকে ঘৃণা করত ও প্রহার করত; বালিকাটি বড় হলেও লাথি, ঘুষি প্রভৃতির কষ্ট ঘুচল না। গৃহকর্ত্রী চুল ধরে প্রহার করত বলে মেয়েটি নাপিতকে দিয়ে মস্তক মুণ্ডিত করায়। পরে বঙ্কুর দ্বারা তার মস্তক বেঁধে গৃহকর্ত্রী শাস্তি দিত। এই হেতু বালিকাটি সকলের কাছে 'বঙ্কুমালা' নামে পরিচিত হয়। এরূপ অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে একদিন মেয়েটি আত্মহত্যার জন্য বনে প্রবেশ করে। এই সমস্ত কাহিনী থেকে সেকালে দাসীরা প্রভু ও প্রভুপত্নীর কাছে কিরকম নৃশংস ও নির্মম ব্যবহার পেত তার বেশ কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়।

অপর দিকে দেখা যায় যে, কোন কোন দাসী প্রভু ও প্রভুপত্নীর কাছে ভাল ব্যবহার পেয়ে পরিবারেরই একজন হিসেবে গণ্য হয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করত। নানাচ্ছন্দ জাতকের (সংখ্যা ২৮৯) দরিদ্র ব্রাহ্মণটী রাজার কাছে কি বর চাইবেন এবিষয়ে পরিবারস্থ অন্যান্য ভরনীয় জনদের মত দাসীর সঙ্গেও পরামর্শ করেছিলেন। সুলসা জাতকে দেখা যায় অনাথপিণ্ডদের এক দাসী অন্যান্য দাসীদের সঙ্গে কোন উৎসবের দিনে যাবার জন্য প্রভুপত্নী পুণ্যলক্ষণাদেবীর কাছে আভরণ যাচ্ঞা করেছিল। পুণ্যলক্ষণা সানন্দে ঐদাসীকে নিজের লক্ষমুদ্রা মূল্যের একখানি আভরণ দিয়েছিলেন (জাতক সংখ্যা ৪১৯)। দাসীরা ভাল কাজ করলে অনেক সময় তাদের মুক্তি দেওয়া হত। বৎস্যরাজ উদয়নের মহিষী শামাবতী দাসীকে রোজ ফুল কিনতে দিতেন। দাসীটী অর্দ্ধেক দামে ফুল কিনে বাকী অর্দ্ধেক চুরি করত, কিন্তু একদিন বুদ্ধ চুরির দোষ সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছিলেন এই উপদেশ শুনে দাসীটীর মনের পরিবর্তন ঘটল। সেদিন পুরো দাম দিয়ে

অনেক ফুল নিয়ে গেল। মহিষী জিজ্ঞাসা করলে নিজের দোষ স্বীকার করে বুদ্ধের উপদেশে যে ভাব মন পরিবর্তন হয়েছে পরিষ্কার ভাবে বুদ্ধের উপদেশ সহ সে বুঝিয়ে দিল। মহিষী শামাবতী সন্তুষ্ট চিত্তে তাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন; উপরন্তু তিনি তাঁর ৫০০ শত সহচরীদের নিয়ে তাকে মাতা ও শিক্ষয়িত্রীর স্থানে প্রতিষ্ঠিত করলেন। (ধম্মপদট্ঠকথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০০)। থেরীগাথা ভাষ্যে (পৃঃ ১৯৯) দেখা যায় অনাথপিণ্ডদের এক দাসী-কন্যা পুন্না বা পুন্নিকা একজন ব্রাহ্মণের ভ্রম সংশোধন করে ধর্মানুরাগী মনের পরিচয় দেওয়াতে দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করে।

নারীদের শিক্ষা ঃ

নারীদের শিক্ষা সংক্রান্ত প্রচুর তথ্য বৌদ্ধ সাহিত্যে ছড়িয়ে আছে। তবে তাঁরা বিদ্যালয়ে কিম্বা গৃহে কি ভাবে শিক্ষা লাভ করতেন, সে কথার কোনও আভাস বৌদ্ধ সাহিত্যে পাওয়া যায় না। ভিক্ষুণীদের ও অন্যান্য শিক্ষার্থিণীদের শিক্ষা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা এই গ্রন্থের ৫০—৬৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জাতক, ধম্মপদট্ঠকথা, অবদান-শতক প্রভৃতি গ্রন্থে বেশ কয়েকজন শিক্ষিতা নারীর উল্লেখ দেখা যায়। তৎকালে উচ্চকোটি স্তরের নারীরা যে চিঠিপত্র লিখতে পারতেন এ সাক্ষ্য আমরা পাই জাতকের কয়েকটি কাহিনীতে। ভদ্দসাল জাতকে দেখা যায় যে, কুমার বিড়ূডভ কপিলবস্তুতে যাত্রার আগেই বাসভক্ষত্রিয়া মহানামকে পত্র দ্বারা জানিয়ে দিয়েছিলেন, কুমার যেন তাঁর বিবাহ-রহস্য সম্বন্ধে কোন কথা না জানতে পারে। কোশলরাজ কর্তৃক বারণসীরাজ্য করতলগত হওয়ার বারাণসীরাজকুমার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন; এ অবস্থায় তাঁর গর্ভধারিণী তাঁর পুত্রকে গোপনে পত্রদ্বারা সাবধান করে দিয়েছিলেন যে কুমারের পক্ষে যুদ্ধের পরিবর্তে নগর অবরোধ করাই সমীচীন (অসাতরূপ জাতক, সংখ্যা ১০০)। সৌবীর রাজ্যের ভরত নামক নৃপতির সমুদ্র বিজয়া নাম্নী এক পণ্ডিতা ও জ্ঞানবতী মহিষী ছিলেন, এই অগ্রমহিষী তাঁর স্বামীকে অনেক সময় সদুপদেশ দিয়ে উৎসাহিত করতেন (আদীপ্ত জাতক, সংখ্যা ৪২৪)। মহানারদকস্সপ জাতকে (সংখ্যা ৫৪৪) রুজা নাম্নী এক বিদুষী রাজকন্যার উল্লেখ দেখা যায়: এই পণ্ডিত রাজকন্যা তাঁর পিতা বিদেহরাজ অঙ্গতির ধর্মদেশন দ্বারা মিথ্যা বিশ্বাস অপনোদন করবার যে প্রয়োগ করেছিলেন, তা বিশদভাবে গাথাকারে বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে বিদুষী নারীর শাস্ত্রজ্ঞানের গভীরতা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়।

নারীদের প্রতিভার প্রমাণ স্বরূপ রাজমাতা তলতাদেবীর সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও সুবিচার-প্রণালী এবং অমরাদেবীর ব্যবহারিক বুদ্ধি-নৈপুণ্য ও প্রশ্নের দ্ব্যর্থবোধক রহস্যময় উত্তর-প্রণালী এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (মহা-উম্মগ্গ জাতক,

সংখ্যা ৫৪৬)। একবার মিথিলারাজের সেনক, পুক্কুশ, কবীন্দ্র, দেবেন্দ্র প্রভৃতি চারজন সভাপণ্ডিত মহোষধ সম্বন্ধে রাজার ও স্ত্রী অমরার মন ভাঙ্গবার জন্য এক জঘন্য উপায় অবলম্বন করেন; নিজেরাই রাজপ্রাসাদ থেকে রাজার চূড়ামণি, সোনার মালা, কম্বল, আর স্বর্ণ-পাদুকা এই চারিটী জিনিস অপহরণ করে প্রত্যেকের নিজের দাসীর মারফৎ অমরাদেবীর কাছে পাঠিয়ে দেন। অমরা এ সমস্তই গ্রহণ করলেন এবং একটি পত্রে প্রত্যেকদিন যে দাসী যা এনেছিল তার নাম ধাম সমস্তই লিখে রাখলেন। এই লিখিত পত্রের সাহায্যেই অমরা শেষ পর্যন্ত রাজসমীপে এঁদের অপহরণের বিষয় প্রমাণ করলেন। আর একবার রাজমহিষী উড়ুম্বরা এই চার জন পণ্ডিতের মহোষধকে বধ করবার জন্য রাজার সহিত ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে পত্র লিখে পরিচারিকার সাহায্যে মহোষধকে পূর্ব থেকে সাবধান বাণী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। উড়ুম্বরা ছিলেন তক্ষশীলার আচার্য-কন্যা। সম্ভবতঃ তিনি পিতার কাছেই শিক্ষা লাভ করেন (মহা-উম্মগ্‌গ জাতক)।

ধম্মপদট্‌ঠকথায় (তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৯৩-২০১) জনৈকা উচ্চশিক্ষিতা রমণীর উল্লেখ দেখা যায়। ইনি ছিলেন কুরুদেশের মাগন্দিয় নামক ব্রাহ্মণের স্ত্রী শাস্ত্রজ্ঞা, ত্রিবেদে পারদর্শিণী, লক্ষণমন্ত্র বিশারদা। একদিন তাঁদের অনুপস্থিতিতে বুদ্ধের তাঁদের গৃহ থেকে প্রত্যাবর্তন কালে পদচিহ্নের যে ছাপ অঙ্কিত হয়েছিল তা লক্ষ্য করে এই ব্রাহ্মণী 'লক্ষণমন্ত্রকুশলতা' হেতু কার পদচিহ্ন সনাক্ত করতে পেরেছিলেন এবং তাঁর স্বামীকে বলেছিলেন যে এটা সাধারণ কামভোগীর পদচিহ্ন নয়, কোন মহাপুরুষের পদচিহ্ন।

অবদানশতকে সোমা নামে আর একটী বিদুষী নারীর উল্লেখ দেখা যায়। ইনি ছিলেন শ্রাবস্তীর কোন এক ব্রাহ্মণ আচার্যের কন্যা, পণ্ডিতা, মেধাবিনী, স্মৃতিমতী এবং শ্রুতিধরা। সম্ভবতঃ পিতৃসমীপে তাঁর শিষ্যদের সঙ্গেই পড়াশুনা করতেন। তাঁর পিতা যখন শিষ্যদের মন্ত্র শিক্ষা দিতেন, এই মেয়েটি শোনামাত্র এই সমস্ত মনে রেখে আগাগোড়া ব্যাখ্যা করে বলতে পারতেন। তাঁকে দেখবার জন্য শ্রাবস্তীর বিভিন্ন মহল থেকে লোকেরা আচার্যগৃহে সমবেত হতেন। (অবদান শতকম, অবদান সংখ্যা ৭৪)। চুল্লকলিঙ্গ জাতকে দেখা যায় (সংখ্যা ৩০১) যে, বৈশালীর বিদুষীরা, যাঁরা মাতা-পিতার নিকট সহস্র বাদে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন, তাঁরা পণ করেছিলেন, গৃহীর নিকট পরাস্ত হলে তাঁর পত্নী হবেন, আর পরিব্রাজকের নিকট পরাস্ত হলে তাঁর শিষ্যা হবেন।

পরিব্রাজিকা ও ভিক্ষুণীদের কথা ঃ

নারীদের মধ্যে অনেকে যে, পরিণীতা না হয়ে, সংসারাশ্রমে প্রবেশ না করে আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করে সন্ন্যাসজীবন যাপন করতেন, এর প্রমাণ পাওয়া যায়

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রন্থে। হারীত (২১, ২৩) বলেন— "দ্বিবিধাঃ স্ত্রিয়ঃ। ব্রহ্মবাদিন্যঃ সদ্যোবধ্বশ্চ" (স্ত্রীজাতি দুই প্রকার, ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোবধূ)। ব্রহ্মবাদিনীরা উপনয়ন, অগ্নিতে সমিদাধান, বেদাধ্যয়ন ও স্বগৃহে ভিক্ষাচর্যা পালন করিবেন। সদ্যোবধূদের বিবাহ উপস্থিত হলে কোনোরূপে উপনয়ন দিয়ে বিবাহকার্য সম্পন্ন করতে হবে। ঘোষা, গোধা, বিশ্ববারা, রোমশা, লোপামুদ্রা, প্রভৃতি বেশ কয়েকজন নারী ঋগবেদের বিশেষ বিশেষ মন্ত্রের ঋষি বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। বৃহদ্দেবতাতে (দ্বিতীয় অধ্যায়) এঁরা সকলেই 'ব্রহ্মবাদিনী' বলে ঘোষিত হয়েছেন। তবে উল্লিখিত স্ত্রী-ঋষি ব্রহ্মবাদিনীরাই যে সকলেই সংসারত্যাগিনী ছিলেন, তা নয়। যেমন যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন (বৃহদারণ্যক, ৪ ৫ ১)। আবার কেউ কেউ বিবাহ না করে আকৌমার ব্রহ্মচারিণীই ছিলেন, যথা, ব্রহ্মবাদিনী গার্গীর (বৃহদারণ্যক) নাম করা যায়; তিনি পরিণীতা ছিলেন না, সংসারিণী হন নাই।

রামায়ণ মহাভারতেও প্রচুর স্ত্রী-সন্ন্যাসিনীদের নামোল্লেখ দেখা যায়। রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে শ্রমণী শবরীর উল্লেখ দেখা যায়। রাম বৃদ্ধা শবরীর আশ্রমে উপস্থিত হলে, তিনি রামচন্দ্রকে স্বাগত জানান। মহাভারতের শল্যপর্বে দেখা যায়, যে মহাত্মা শাণ্ডিল্যের কন্যা সাধ্বী কৌমারব্রহ্মচারিণী তপঃসিদ্ধা তপস্বিনী হয়ে বৃদ্ধ বয়সে স্বর্গে গমন করেন। অষ্টাবক্র মুনির উত্তরদেশে জনৈকা তপস্বিনী বৃদ্ধার আলাপ হয় এবং এই বৃদ্ধা নারী নিজের সম্বন্ধে বলেছিলেন। তিনি কুমারী জীবন হতেই ব্রহ্মচারিণী আছেন; অবশ্য পরে অষ্টাবক্র এই (বৃদ্ধা) কুমারীকে বিবাহ করতে বাধ্য হন (অনুশাসন পর্ব)। মহাভারতের শান্তিপর্বে উল্লিখিত "সুলভা ভিক্ষুকীর" সহিত রাজর্ষি জনকের সংবাদ সুপ্রসিদ্ধ। এই ক্ষত্রিয়া রমণী নিজের মনোমত স্বামী না পেয়ে মোক্ষধর্মে জ্ঞানার্জন করে মুনিব্রত গ্রহণ করেন এবং একাকিনী পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমণ করেন। এই সুলভার সহিত রাজর্ষি জনকের গভীর তত্ত্বালোচনা হয়। এই সমস্ত উদাহরণ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে প্রাচীনকালে বেদপন্থীদের সমাজে নারীদের মধ্যে অনেকে কুমারব্রহ্মচারিণী হয়ে দেশদেশান্তরে ঘুরে বেড়াতেন এবং ধ্যান সাধনা ও শাস্ত্রালোচনায় নিমগ্না থাকতেন।

পালি সাহিত্যের অন্তর্গত কয়েকখানি গ্রন্থে পরিব্রাজক ও পরিব্রাজিকাদের উল্লেখ দেখা যায়। ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষের ৪১ সংখ্যক পাচিত্তিয়ে এবং ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষের ২৮ ; ৪৬ সংখ্যক পাচিত্তিয়ে পরিব্রাজক ও পরিব্রাজিকাদের বিষয় উক্ত হয়েছে। সুত্তবিভঙ্গের ব্যাখ্যা অনুযায়ী (বিনয় পিটক, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৯২) পরিব্রাজক বলতে ভিক্ষু ও শ্রামণের ছাড়া যে-কোন ব্যক্তি; আর পরিব্রাজিকা বলতে ভিক্ষুণী, শিক্ষমানা ও শ্রামণেরী ছাড়া প্রব্রজ্যা-প্রাপ্ত যে কোন স্ত্রীলোক।

সুত্তবিভঙ্গের একস্থানে (ভিক্ষুপ্রাতি, সংঘাদিসেস সংখ্যা ৩, বিনয়, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৩১) ও সংযুক্ত নিকায়ের, তৃতীয় খণ্ডে (পৃঃ ২৩৮—২৪০) পরিব্রাজিকার উল্লেখ্য দেখতে পাওয়া যায়। মজ্ঝিম নিকায়ের অন্তর্গত চূলধম্ম সমাদান সুত্তে 'মৌলিবন্ধ পরিব্রাজিকাদের উল্লেখ দেখা যায়; এঁরা মৌলিবন্ধ অবস্থায় (অর্থাৎ চূড়াবাঁধা চুল নিয়ে) ঘুরে বেড়াতেন। ' বিধুশেখর শাস্ত্রী—ভিক্ষু-ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষ, প্রবেশক, পৃঃ ৪৬-৫৫; Rhys Davids, Buddhist India, pp 145-6; ক্ষিতিমোহন সেন প্রাচীন ভারতে নারী, ১ম পরিচ্ছেদ)।

নারীরাও যে সন্ন্যাস গ্রহণ করতেন তার সাক্ষ্য রয়েছে একাধিক জাতকে (সংখ্যা ৩২৮, ৪০৮, ৪৯৩, ৫০৯, ৫৩২, ৫৩৬, ৫৪৬ ' । সম্মিল্লভাসিনী নাম্নী এক ব্রাহ্মণ কুমারীকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিবাহ দেওয়া হয়; কিন্তু সংসারজীবনে দুজন ভিক্ষু বা দুজন ব্রহ্মচারী যেমন নির্দোষভাবে একত্র বাস করেন, এঁরাও (স্বামী স্ত্রী) ঠিক সেইভাবে বাস করতে থাকেন। কিছুদিন পরে তাঁরা হিমবন্ত প্রদেশে গিয়ে-ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন এবং বন্যফলমূলে জীবন ধারণ করতে থাকেন (অননুসোচিয় জাতক)। বারাণসীর এক কুম্ভকার ও তার স্ত্রী চারজন প্রত্যেক বুদ্ধের ধর্মদেশন শুনে গৃহবাসে বীতরাগ হন; কুম্ভকারের স্ত্রী স্বামীর ওপর দুইটি সন্তানের ভার দিয়ে পূর্বেই স্বামীকে কিছু না জানিয়ে নগরের বাইরের তপস্বীদের কাছে উপস্থিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। সন্তান দুটি বড় হলে জ্ঞাতি বন্ধুগণের গৃহে রেখে কুম্ভকারও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। অনেক দিন পরে ঐ পরিব্রাজিকার ভিক্ষাচর্যাকালে স্বামীর সঙ্গে বারাণসীতে দেখা-সাক্ষাৎ হয় (কুম্ভকার জাতক, সংখ্যা ৪০৮)। মহা-উম্মগ্গ জাতকে ভেরী নামক এক পরিব্রাজিকার উল্লেখ দেখা যায়; ইনি প্রতিদিন বিদেহরাজের প্রাসাদে আহার করতেন; একদিন মহৌষধ ভেরীকে তার সম্বন্ধে রাজার প্রকৃত মনোভাব কি, জানবার জন্য অনুরোধ করেন। এই সুপণ্ডিতা বুদ্ধিমতী পরিব্রাজিকা কৌশলে নানাপ্রকার বাদানুবাদের মাধ্যমে সমস্ত নাগরিকদের সম্মুখে মহৌষধ যে রাজার সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম পাত্র একথা রাজার উক্তির সাহায্যেই প্রমাণ করতে পেরেছিলেন। বৌদ্ধসাহিত্যে পরিব্রাজক ও পরিব্রাজিকাদের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তা থেকে মনে হয় যে এঁদের বেশীর ভাগই ছিলেন বেদপন্থী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীগণ। পরিব্রাজিকাদের মধ্যে কেউ কেউ ধর্মজনিত শান্তিলাভ করতে না পেরে সংসারধর্ম করবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠতেন। কুণাল জাতকে (সং ৫৩৬) টীকাকার সচ্চপাবী নাম্নী এক শ্বেত শ্রমণীর বিবরণ দিয়েছেন। ইনি সম্ভবতঃ শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় ভুক্তা সন্ন্যাসিনী ছিলেন। তিনি কাশীর নিকটস্থ শ্মশানে পর্ণশালা নির্মাণ করে বনবাস করতেন; চারদিন অনাহারে কাটিয়ে পঞ্চমদিনে আহার করতেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণের বার বছর পরে এক সুরাসক্ত ছদ্মবেশী তপস্বী সচ্চপাবী

তপস্বিনীকে প্রলুব্ধ করে সংসারধর্মে ফিরিয়ে নিয়ে আসে এবং তাঁকে নিজের ভার্যারূপে গ্রহণ করে।

জৈন সন্ন্যাসিনীরা 'নিগ্গণ্ঠী', 'অজ্জা', (আর্যা বা আর্যিকা), 'সাহুণী' বা 'ভিক্খুণী' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন (আচারঙ্গ সুত্র)। জিনসেনের মহাপুরাণে দেখা যায় যে, প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের সময় ব্রাহ্মী ও সুন্দরী নাম্নী দুই ভগ্নী পিতার নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে অবিবাহিত অবস্থায় সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। রাজা চেতকের কন্যা চন্দনা মহাবীরের শিষ্যা ছিলেন ; ইনিও অবিবাহিতা থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। ইনি ৩৬,০০০ হাজার আর্যার গণিনী (অধ্যক্ষা) ছিলেন (কল্প সুত্র)।

উপরে উল্লিখিত বিবরণগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বৌদ্ধ ভিক্ষুণীর সৃষ্টির পূর্বে অন্যান্য সম্প্রদায়ের আরও অনেক সন্ন্যাসিনী ছিল। তাই বৌদ্ধধর্মে ভিক্ষুণী ও ভিক্ষুণী সংঘের উদ্ভব একেবারে নতুন বলে গণ্য করা যায় না। এর কিছুটা সমর্থন পাওয়া যায় ভিক্খুনী-বিভঙ্গের ৭নং সংঘাদিসেস (বিধুশেখর শাস্ত্রীর ১০নং) বিধানটিতে—"কিং নুমাব সমণিযো যা সমণিযো সক্যধীতরো ; সন্তি অঞ্ঞাপি সমণিযো ·· "এই যে শাক্যকন্যারা শ্রমণা হইযাছেন ইঁহারাই কি কেবল শ্রমণা ! আরো অন্যান্য শ্রমণা আছেন ' (বিনয় পিটকং, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৩৬)। সমগ্র নারী জাতির মধ্যে শাক্য কুলের মহিলারাই সর্বপ্রথম এগিয়ে আসেন বৌদ্ধসঙ্ঘে স্থান পাবার জন্যে। সঙ্ঘে নারীদের প্রবেশাধিকার দেওয়া ভগবান বুদ্ধের অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শাক্যরমনীদের অভিলাষ ও আগ্রহই জয়যুক্ত হয়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁকে নারীদের সঙ্ঘে যোগদানের ব্যবস্থা অনুমোদন করতে হয়। (এবিষয়ে সবিস্তার বিবরণ এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের পৃঃ ৬৫-৭২ দ্রষ্টব্য)।

বিনয় চুল্লবগ্গ (১০ম স্কন্ধ) ও অঙ্গুত্তর নিকায়ের (অষ্টক নিপাত) বিবরণ অনুযায়ী মহাপ্রজাপতী গোতমী আনন্দের প্রচেষ্টায় আটটী কঠোর নিয়ম আজীবন পালনের শর্তে ভিক্ষুণীসংঘে প্রবেশের অনুমতি লাভ করে ভিক্ষুণীর ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁর সঙ্গিণী হয়ে যে ৫০০ শত শাক্যরমণী এসেছিলেন তাঁরাও ভিক্ষুণী রূপে দীক্ষিতা হন। এইভাবে ভিক্ষুণী সম্প্রদায়ের ভিৎ স্থাপিত হয়। সুতরাং মহাপ্রজাপতীকে ভিক্ষুণীসংঘ সৃষ্টির প্রথম ও প্রধান পথপ্রদর্শক বলে গণ্য করা হয়। যশোধরা নাম্নী আর এক শাক্যরমণী সঙ্ঘে প্রবেশ করে ভিক্ষুণী-ব্রত গ্রহণ করেন। ইঁনি ছিলেন গোতমবুদ্ধের পত্নী। থেরী অপদানে যশোধরা নামে এক থেরীর বিবরণ (অপদান, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৮৪) দেখা যায় ; ইঁনি নিজের সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা থেকে জানা যায় যে গৃহত্যাগের পূর্বে তিনি ছিলেন বুদ্ধের পত্নী ও সন্তানজননী (পজাপতী) ; পরে তিনি ৯০,০০০ ভিক্ষুণীগণের প্রধানা হয়েছিলেন (পামোক্খা সব্ব-ইস্সরা—অপদান গাথা সংখ্যা ১০ ও ১১—DPPN, II P

743)। অপদানের এই তথ্যের উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে কেউ কেউ এরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে যশোধরাই সর্বপ্রথম মহিলা যিনি নারীগণকে বৌদ্ধ-সংঘভুক্ত করে তাঁদেরকে ভবচক্র থেকে মুক্তির পথের সন্ধান দিয়েছিলেন। সুতরাং তাঁকেই ভিক্ষুণীসংঘ সৃষ্টির পথিকৃৎ বলে মনে করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে Miss I B. Horner-এর অভিমত উদ্ধার করা যাক্—(Women under Primitive Buddhism p 102 পৃঃ ১০২)

—"A good deal of uncertainty surrounds the actual foundation of the Buddhist order of Almswomen and its beginnings are wrapped in mists It is possible that Mahapajapati came late into the Order, after her husband had died, and that the first woman really to make the order open for women was Yasodhara possibly the former wife of Gotama, who in her verse in the Apadana is said to represent many women and herself".

কিন্তু এঁদের এরূপ ধারণা সমর্থনযোগ্য নয়। অপদানের চেয়ে বিনয়ের গ্রন্থগুলি বেশী প্রাচীন। অপদান ছাড়া কি বিনয়পিটক কি সুত্তপিটকের কোন গ্রন্থেই যশোধরা যে ভিক্ষুণী-সংঘের প্রবর্তক ছিলেন এরূপ কোন আভাস পাওয়া যায় না। তাছাড়া সমগ্র বৌদ্ধ-জগতের সুধীজনসমাজে মহাপ্রজাপতী গৌতমীই ভিক্ষুণী-সংঘ প্রতিষ্ঠার মূল উৎস ও প্রথম উদ্যোক্তা বলে স্বীকৃতি পেয়ে আসছেন।

ছব্বগ্গীয় বা ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের মত ভিক্ষুণী-সংঘেও ছজন দুষ্টপ্রকৃতির ভিক্ষুণী ছিল; এঁরা ছব্বগ্গীয় ভিক্ষুণী নামে অভিহিত। এই অবাধ্য ভিক্ষুণীদের বিনয় বিরুদ্ধ কার্যকলাপ চুল্লবগ্গের দশম পরিচ্ছেদে সবিস্তার বর্ণিত হয়েছে। এঁদের দুষ্কর্মের একটি কাহিনী ৫২ সংখ্যক পাচিত্তিয় প্রসঙ্গে বিবৃত হয়েছে (বিনয়, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩০৮—৯); ষড়বর্গীয় ভিক্ষুণীদের এক প্রধান ভিক্ষুণীর মৃত্যু হলে তাঁরা মৃতদেহটী আয়ুষ্মান্ কপিলতকের বিহারের নিকট দাহ করেন এবং চিতার উপর স্তূপ নির্মাণ করেন। তাঁরা প্রতিদিন স্তূপের নিকট কান্নাকাটি করায় কপিলতক উত্যক্ত হয়ে স্তূপটি ভেঙ্গে ফেলেন; এতে তাঁরা কুপিত হয়ে তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে বিহারের উপর পাথর ও ঢিল নিক্ষেপ করে বিহারটী ধ্বংস করেন। কপিলতক তাঁর শিষ্য উপালির কাছে আগে থাকতে জানতে পেরে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করেন। ভিক্ষুণীগণ পরে এই সমস্ত ঘটনার কথা জানতে পেরে উপালিকে প্রচুর গালাগালি করতে থাকেন।

পরবর্তীকালে কয়েকশত বৎসর ধরে ভিক্ষুণীসংঘের অবস্থা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ করে কালের গতিতে ক্রমশঃ অবণতি ও হ্রাসের দিকে চলতে থাকে। এর সাক্ষ্য রয়েছে প্রস্তরলিপি ও সাহিত্যগত উপাদানের মধ্যে। মৌর্যসম্রাট অশোকের ভাব্রুলিপি ও সংঘ-ভেদ লিপিতে ভিক্ষুদের সঙ্গে ভিক্ষুণীদের উল্লেখ দেখা যায়। দীপবংশ ও মহাবংশে বর্ণিত ভিক্ষুণী সংঘমিত্রার ভিক্ষুণী-সংঘ গঠনের নিমিত্ত শ্রীলঙ্কায় (সিংহলদ্বীপে) যাত্রা বিষয়টীও এস্থলে স্মরণীয়। পণ্ডিতপ্রবর ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন তাঁর বৃহৎ-

বঙ্গ গ্রন্থে, কথাবথু নামক পালি গ্রন্থে উল্লিখিত 'একাভিপ্পায়ী, নামে অভিহিত ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। তিনি এঁদের সম্পর্কে যা লিখেছেন এর কিছু কিছু অংশ এস্থলে উদ্ধার যোগ্য :— "বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের মধ্যে যে নৈশ মিলন-সমিতি হইত, যাহার উল্লেখ আমরা খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত পালি কথাবথু নামক পুস্তকে পাই, তাহাই বঙ্গদেশে সহজিয়াদের নৈশ-সভায়, পর্যবসিত হইয়াছে। এই বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা 'একাভিপ্পায়ী' নামে পরিচিত ছিল 'একাভিপ্পায়ী'' অর্থ সমভাবাপন্ন। কথাবথুতে (Kathavatthu, একাদশ অধ্যায়) লিখিত আছে— কোন কোন সংঘারামে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইতেন, শুধু যৌন অনুরাগ বশতঃ নহে - পরস্পরের মত ও অভিপ্রায়ের ও আদর্শের একত্বহেতু— এবং তাঁহারা সেই সংঘারামে মিলিত হইয়া ধর্মচর্চা করিতে ইচ্ছুক হইতেন, এমনকি জন্মজন্মান্তরেও তাঁহারা এই মিলন আকাঙ্ক্ষা করিতেন।" (বৃহৎ বঙ্গ, ১ম খণ্ড, ভূমিকা ও পৃঃ ৩২৮ ৩২৯)।

খৃঃ পূঃ প্রথম-দ্বিতীয় শতকের (শুঙ্গদের রাজত্বকালে) সাঁচী ও বারহুৎ স্তূপের কয়েকটি দানলিপিতে ভিখুণী বা ভিছুণীদের উল্লেখ দেখা যায় ; এঁদের ভিতর অনেকে উজ্জেনি, কাকন্দী, কাম্পিপথ, কুররঘর, ভুম্ববন, ভোজকট, বিদিসা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের বাসিন্দা ছিলেন। খৃষ্টোত্তর ১ম-২য় শতাব্দীর কয়েকটি (কুষাণ যুগের) প্রত্নলিপিতেও ভিক্ষুণীদের বিষয় লক্ষ্য করা যায়। জুনারে আবিষ্কৃত গুহার উপর উৎকীর্ণ একটী লিপি থেকে ধর্মোত্তরীয় সম্প্রদায়ভুক্ত ভিক্ষুণীদের জন্য একটি উপাশ্রয় বা আশ্রয়স্থল (ভিখুণী উপসয়) নির্মাণের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। হুবিষ্কের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ একখানি লিপি থেকে জানা যায় যে, ত্রিপিটকে ব্যুৎপন্না ধনবতী নাম্নী জনৈকা ভিক্ষুণী মথুরার অন্তর্গত মাথুরবনে বোধিসত্ত্বের এক মূর্তি উত্তোলন ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অমরাবতীর লিপিমালায় ও উপাসক, উপাসিকা, ও ভিক্ষুদের সঙ্গে ভিক্ষুণীদের উল্লেখ রয়েছে ; অনেকগুলি লিপিতে এই ভিক্ষুণীরা (সমণিকা বা পব্বজিতিকা আখ্যায় ও অভিহিতা) স্বত্নী দা ত্নী রূপে চিত্রিতা হয়েছেন।

খৃষ্টোত্তর ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত যে মথুরায় ভিক্ষুণীসংঘের অবস্থিতি ও প্রতিপত্তি বজায় ছিল, এর প্রমাণ পাওয়া যায় ফা-হিয়েনের ভ্রমণ বৃত্তান্তে ও একটি স্থানীয় সংস্কৃত-প্রত্নলিপিতে। ফা-হিয়েন (৩৯৯-৪১১ খৃষ্টাব্দ) বলেছেন যে এখানকার (মো-তু-লো মথুরা) ভিক্ষুণীরা প্রধানতঃ আনন্দের নামে উৎসর্গীকৃত উচ্চস্তূপটিকে উপলক্ষ্য করে চারিপার্শ্বে সমবেত হতেন তাঁদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করবার জন্যে, কারণ বৌদ্ধসংঘে নারীজাতির অধিকার প্রধানতঃ আনন্দের চেষ্টা-সম্ভূত, তারই অনুরোধে ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুণী-সংঘ প্রতিষ্ঠা করতে সম্মত হয়েছিলেন (Leggy's Fa Hien, p-45)। খৃষ্টীয় ৫৪৯-৫০ অব্দে উৎকীর্ণ একখানি সংস্কৃত লেখতে শাক্য-ভিক্ষুণী জয়ভট্টার যশোবিহারের উদ্দেশ্যে ভিক্ষুণী-সম্প্রদায়

সম্বন্ধীয় কিছু দানের কথা লিপিবদ্ধ আছে (Fleet, C I. I, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৩-৭৪) । পরবর্তী চীন পর্যটক হিউয়েন-সাং (খৃষ্টোত্তর ৬৩০-৬৪৪) ভিক্ষুণীদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেননি । তবে বাণের হর্ষচরিতে ভিক্ষুণী-সংঘের অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায় । ই-ৎসিঙ্ ভারতে আগমন করেন ৬৭৩ খৃষ্টাব্দে ; তিনি সংবাদ পরিবেশন করেছেন যে, চীনদেশের তুলনায় ভারতীয় ভিক্ষুণীরা দরিদ্রভাবে সহজ, সরল জীবন যাপন করেন ; ভিক্ষালব্ধ আহার্যের উপরই নির্ভর করে থাকেন (Takakusu, A record of Buddhist practices, p 80) । সুবন্ধু তাঁর 'বাসবদত্তা'য় "তাবানুরাগ-রক্তাম্বর-ধারিণী" জনৈকা ভিক্ষুকীর কথা উল্লেখ করেছেন ।

এর কিছুকাল পরে ভবভূতি তাঁর 'মালতী-মাধবে' কামন্দিকা, অবলোকিতা, বুদ্ধরক্ষিতা এবং সৌদামিনী প্রভৃতি পরিব্রাজিকাদের যে চরিত্র অঙ্কিত করেছেন, তাতে এই ভিক্ষুণীদেরই চিত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে । ।

পরবর্তীকালে ভিক্ষুণীদের প্রকৃত অবস্থা কি ছিল তা জানবার মত কোনো গ্রন্থপ্রমাণ বা লিপিপ্রমাণ বিদ্যমান নেই ; সম্ভবতঃ এঁদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে এবং নামমাত্র অস্তিত্ব থাকলেও বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হয় ।

* * * * *

ডঃ বাণী চট্টোপাধ্যায় তাঁর এই গবেষণা মূলক নিবন্ধে (Thesis) বুদ্ধের সমসাময়িক কালের এবং তৎপরবর্তী কয়েক শত বর্ষ পরিব্যাপ্ত ভারতীয় সমাজজীবনের নারীসংক্রান্ত একটি বিশেষ দিক্ নিয়ে আলোচনা করেছেন । প্রাচীন ভারতের সামাজিক ইতিহাসের যে কোন দিক্ নিয়ে গ্রন্থ রচনা করা অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ও দুরূহ কাজ সন্দেহ নেই । তথাপি এই ভদ্রমহিলা পালি সাহিত্যান্তর্গত মূল আকর গ্রন্থ ও বিভিন্ন পণ্ডিতদের গবেষণা-গ্রন্থ থেকে নানা প্রকার তথ্য সংগ্রহ করে এগুলির সহায়তায় তাঁর এই মূল্যবান উপাদেয় গ্রন্থখানি রচনা করেছেন । গ্রন্থখানি তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের ফলস্বরূপ । নারীদের বিবাহ ; সমাজ-জীবনে তাঁদের বিভিন্ন ভূমিকা ; বারবণিতা, দাসী ও ধাত্রীদের জীবনযাত্রা , নারীদের শিক্ষাদীক্ষা ; ভিক্ষুণী-সংঘ গঠন ও তার গতিপ্রকৃতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় এই গবেষণা-নিবন্ধে উপস্থাপিত হয়েছে এবং এর সঙ্গে কয়েকজন খ্যাতনাম্নী থেরী ও উপাসিকাদের জীবন-বৃত্তান্ত ও সংযোজন করা হয়েছে । এই গ্রন্থখানি সুখপাঠ্য ও পরিমার্জিত বাংলা ভাষায় রচিত হওয়ায়, প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকা-বৃন্দের যে আনন্দ বৃদ্ধি করবে এতে কোন সন্দেহ নেই । আশা করি এই পুস্তকখানি বাংলা সাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন রূপে সুধীসমাজে স্বীকৃতি লাভ করবে ।

রজনীকান্ত দাস রোড্
পোঃ হালতু, কলিকাতা ৭০০০৭৮,
২৫শে বৈশাখ, ১৩৯৭
বুদ্ধপূর্ণিমা

শ্রী সুকুমার সেনগুপ্ত
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
পালি বিভাগের প্রাক্তন প্রধান
ও অবসরপ্রাপ্ত রীডার ।

প্রথম অধ্যায়

॥ সামাজিক জীবন ॥

প্রকৃতি ও পুরুষ অর্থাৎ নারী ও পুরুষ এই দুই নিয়ে রচিত হয় মানব সংসার, এবং মানব সংসারের সমষ্টিগত রূপই হল মানবসমাজ। মানবসমাজ গঠনের মূলে রয়েছে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনরক্ষার প্রেরণা ও জীবিকা সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষা। জীবনরক্ষা ও জীবিকা অর্জনের প্রয়োজনে মানুষ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধিকার বোধের কিছুটা ক্ষুণ্ণ করে একত্রে অর্থাৎ দলবদ্ধভাবে বাস করার অভ্যাস আয়ত্ত করে। মানব সংসার গঠনের প্রথম যুগে কোনো নীতি নিয়ম ছিল না। নিয়ম কানুনের বন্ধনমুক্ত নর-নারী ইচ্ছামত একত্রে বাস করে সংসার জীবন-যাপন করত[1]। কিন্তু মানব সংসার যখন সমষ্টিগতভাবে মানব সমাজে রূপায়িত হল, তখনই প্রয়োজন হল নীতি-নিয়মের।

সমাজবদ্ধ মানুষ যেমন একদিকে ঐক্যশক্তির মূল্য বুঝতে পারল, অপরদিকে তেমনই একথাও বুঝতে পারল যে, জীবন সংগ্রামে জয়ী হয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে যে শৌর্যবীর্যের প্রয়োজন তা প্রধানভাবে পুরুষশক্তির উপর নির্ভরশীল[2]। কারণ প্রকৃতির নিয়মে নারীকে জননী হতে হয়। গর্ভধারণ সন্তান প্রসব ও সন্তান লালন-পালনের জন্য নারীকে এতবেশী শক্তি সামর্থ ও সময় ব্যয় করতে হয় যে, পুরুষোচিত শৌর্যবীর্যের পরিচয় দেওয়ার অবকাশ বা সুযোগ তার প্রায় থাকেই না। এই পরিপ্রেক্ষিতে পুরুষশক্তিকে অধিকতর শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে তৎকালীন সমাজব্যবস্থাপকগণ অধিক মনোযোগী হলেন[3]। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় দৈহিক শক্তির দিক

---

1 "এমন সময়ও ছিল যখন বিবাহপ্রথাই প্রবর্তিত হয় নাই। তখন নর নারী বয়েচ্ছ বিবাহের দ্বারা সন্তান লাভ করিত—

অনাবৃতাঃ কিল পুরাস্ত্রিয় আসন বরাননে।
কামাচার বিহারিণ্যঃ স্বতন্ত্রশ্চারুহাসিনি ॥

মহাভারত, আদি ১২২ ৫

তাহাদের এই ব্যাভিচারে অধর্ম হইত না, ইহাই পূর্বে ধর্ম ছিল—"

প্রাচীন ভারতে নারী, ক্ষিতিমোহন সেন, পৃঃ ৫৯

2 The wonder that was India A L, Basham, p 160

3 The Great women of India,. Ed by Swami Madhavananda and R C. Majumder, p 87

থেকে নারী অপেক্ষা পুরুষ বলিষ্ঠতর হওয়ায় সর্ববিষয়ে নারীকে দমিত করা হয়েছে[4]।

বৈদিক যুগে 'দম্পতি' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ব্যক্তিগত গৃহের উপর স্বামী ও স্ত্রীর যুগ্ম সত্ত্বাধিকারের স্বীকৃতি বোঝাত[5]। ব্যক্তিগত গৃহের উপর যেমন যুগ্ম সত্ত্বাধিকারের স্বীকৃতি ছিল, তেমনই ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে এবং ধর্মীয় ও নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণে সমাজস্থ নর-নারীর সমান অধিকারের স্বীকৃতি। কিন্তু কালক্রমে দেখা গেল 'দম্পতি' শব্দের অর্থ সংকুচিত হয়ে জায়া ও পতি = দম্পতি এই অর্থে প্রযুক্ত হচ্ছে। কারণ সামাজিক অনুশাসনে ব্যক্তিগত গৃহের একমাত্র স্বত্ত্বাধিকারী হলেন পুরুষ, এবং নারী হলেন পুরুষের গৃহের গৃহিণী বা ঘরনী মাত্র। এইভাবে দেখা যায় সমাজপতিগণের প্রবর্তিত অনুশাসনের দ্বারা নারীর অধিকার যুগে যুগে ক্ষুণ্ণ হতে হতে এমন এক পর্যায়ে এসে উপস্থিত হল, যে পর্যায়ে এসে কুসংস্কার ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন নারী আপন মানবী সত্তার অস্তিত্ব পর্যন্ত বিস্মৃত হয়ে গেল[6]। তখন নিরাপদ আশ্রয় ও গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য পুরুষের অধীনতা স্বীকার করা ছাড়া নারীর আর গত্যন্তর রইল না[7]। ফলে সমাজে নর-নারীর পদমর্যাদা আর একই স্তরে রইল না—নারীর স্থান পুরুষের নিম্নে নির্দিষ্ট হল[8]। অবশ্য ধর্মাচরণ ক্ষেত্রে নারীর কিছুটা স্বাধীনতা ছিল[9]। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও নারীর পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল না, কারণ সামাজিক অনুশাসনে নারীকে বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর এবং বার্ধক্যে পুত্রের অধীনে থাকতে হত। সুতরাং তিনি গৃহকর্তা বা পুরুষ অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে একটি পদক্ষেপ করারও অধিকারিণী ছিলেন না[10]। অতএব বলা যায়—জীবনের সর্বক্ষেত্রে পুরুষের অধীনতা স্বীকার করে নারী তাঁর জীবন শুরু ও সমাপ্ত করতেন।

---

4. Ibid.

5 Ibid., p 4

6 The position of women in Hindu civilisation,
Dr. A L Altekar pp 58—72

7. Ibid., p 24

8 " clearly show how orthodox Brahmanical view was deliberately aiming to religate her to a position of inferiority "
The Age of Imperial Unity. p 566

9 The Vedic Age, Ed by R C Majumder, p 509

10 "যেখানে গুরুজন কন্যাকে বিবাহ দিতে যত্নশীল নহেন সেখানে বোধায়ন ধর্মসূত্র কন্যাকে শুধু পতিবরণ করিবার অধিকারই দেন নাই, ভালো সদৃশ বর পাওয়া না গেলে অপেক্ষাকৃত অল্পগুণে বা গুণহীন বরকেও বরণ করিবার অধিকার দিয়াছেন (৪ ১ ১৫-১৬)। অথচ এই বোধায়ন ধর্মসূত্রই (২ ২ ২৬) কৌমারে পিতাকে, যৌবনে স্বামীকে, বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রকে নারীর অভিভাবকত্ব দিয়াছেন, তাহাকে স্বাধীনতা দেওয়া যে যায় না, এই বিষয়ে মনুর সঙ্গে তিনিও একমত' (ক্ষিতিমোহন সেন, প্রাচীন ভারতে নারী, নারীর বিশুদ্ধি, পৃঃ ৬৬)।

বুদ্ধদেবের জীবনদর্শন ও তাঁর বাণী আলোচনা করলে স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয়—বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে প্রাক্ বৌদ্ধযুগ পর্যন্ত ধর্মীয় ও দার্শনিক মতবাদের যে ধারা প্রবাহিত ছিল বৌদ্ধযুগে সেই ধারা নবরূপে একটি নতুন পথে তার গতি পরিবর্তন করল। ঐতিহ্যগত এই ধারার গতি পরিবর্তনের ফলে ভারতীয় সমাজে যে চেতনার বিপ্লব[11] আনল তার মূলে ছিল ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের মতবাদ[12]। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় মন্তব্য করেছেন—একই যুগে এবং একই দেশে অজাতশত্রুর ন্যায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক এবং গৌতমবুদ্ধের মত অহিংসার বাণী-প্রচারক আবির্ভূত হয়েছিলেন, এমন কি এই দুই বিরুদ্ধবাদীর সাক্ষাৎও হয়েছিল রাজগৃহ নামক স্থানে, যেখানে আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ এবং নীতি ও মানব ধর্ম প্রবর্তক মুখোমুখী দাঁড়িয়ে একটি সমন্বয়ের পথ খুঁজেছিলেন। তাঁদের মতের সমন্বয় ঘটেছিল পরবর্তী কালে ধর্মাশোক যখন শাক্যমুনির মানবধর্মের সঙ্গে রাজধর্মের বিরোধ নিশ্চিহ্ন করে দিলেন[13]।

বৌদ্ধযুগের প্রথম পর্বে প্রাগুক্ত চেতনার বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া তৎকালীন সমাজের উচ্চস্তরীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গকে প্রভাবিত করলেও জনসাধারণের চিত্তে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি[14]। কিন্তু পালিসাহিত্য পাঠে জানা যায়, বুদ্ধদেব প্রবর্তিত ধর্মীয় ও দার্শনিক মতবাদের প্রভাবে ধীরে ধীরে কুসংস্কার; অন্ধবিশ্বাস ও বৈদিক ক্রিয়াকলাপের মোহবন্ধন থেকে জনসাধারণের চিত্তও মুক্তিলাভ করেছে। কারণ বুদ্ধদেব যেমন ভারতীয় সমাজ থেকে জাতিভেদ প্রথা, অস্পৃশ্যতা, কুসংস্কার,

---

11 বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম, ডঃ শ্রীঅনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৬

তুলনীয়ঃ

"It was rather a period when civil war was ceased for shile, yielding place to fights for civil rights and ethical ideas"

Pre-Buddhistic Indian Philosophy Dr, B M Barua, p 367

12 Hence Buddhism and upanisadic thoughts may be treated as contemporary developments, the former paving the way for the advent of Non-Brahmanic schools of thought, and the latter bringing forth in its train the various system of Brahmanic philosophy"

Early Monastic Buddhims, N Dutt p 17

13 Political History of Ancient India,

Hemchandra Roy Chowdhury, pp, 167—168

14 বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম, ডঃ শ্রীঅনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৬

ব্রাহ্মণ্যধর্মের গোঁড়ামি প্রভৃতি দূর করতে চেয়েছিলেন, তেমনি ভাবেই চেয়েছিলেন সামাজিক জীবনে নর-নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং জনশিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে একটি আদর্শ সমাজব্যবস্থা প্রচলন করতে। বুদ্ধদেব প্রবর্তিত এই আদর্শ সমাজব্যবস্থায় নারী কেবল সন্তান প্রজননের যন্ত্রমাত্র বলে গণ্য হতেন না, তাঁর ব্যক্তিগত স্বাধীন মতামত বা ইচ্ছা-অনিচ্ছারও মর্যাদা দেওয়া হত। আজীবন কোনো না কোনো পুরুষের অভিভাবকত্বের আশ্রয়ে থেকে অথবা পরিণয়সূত্রের মাধ্যমে নারী তাঁর জীবনের পূর্ণ সার্থকতা লাভ করতে পারেন, এই প্রাচীন ধারণারও ক্রমশঃ পরিবর্তন হল বৌদ্ধযুগের নারীদের। এক কথায় বলা যায় বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে তৎকালীন ভারতীয় নারীরা উপলব্ধি করলেন, তাঁদের সম্মুখে এক উচ্চ-মানের সামাজিক জীবনের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে রয়েছে [15]।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য-বৈদিক সাহিত্য, রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে ভারতীয় নারীজীবনের অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করা গেলেও পালি ও বৌদ্ধ-সংস্কৃত গ্রন্থগুলিতে প্রাচীন ভারতের নারীগণের সামাজিক জীবন সম্বন্ধে বহু তত্ত্ব ও তথ্য পাওয়া যায়। পালিসাহিত্যে স্বীকৃত বৌদ্ধযুগে প্রচলিত সামাজিক রীতি-নীতি, নিয়ম ইত্যাদির যে সকল বিবরণ পাওয়া যায় প্রধানতঃ তারই পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত যুগের ভারতীয় নারীগণের সামাজিক জীবন সম্বন্ধে বক্ষ্যমান অধ্যায়ে তার একটি চিত্র পরিস্ফুট করতে অগ্রসর হয়েছি। সেই উদ্দেশে প্রথমে বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে :

প্রাক্ বৌদ্ধযুগের প্রাচীন শাস্ত্রগুলিতে অষ্টবিধ বিবাহ প্রথার কথা উল্লেখ করা হয়েছে[16], যথা :

(ক) ব্রাহ্ম, (খ) দৈব, (গ) আর্ষ, (ঘ) প্রাজাপত্য, (ঙ) আসুর, (চ) গান্ধর্ব (ছ) রাক্ষস এবং (জ) পৈশাচ।

উপরোক্ত অষ্টবিধ বিবাহ প্রথার মধ্যে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য এই চারটি প্রথা শাস্ত্রীয় বিবাহবিধিরূপে স্মৃতিশাস্ত্রকারগণের দ্বারা প্রশংসিত এবং আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ এই চারটি বিবাহ-বিধি সমাজে প্রচলিত থাকলেও স্মৃতিশাস্ত্রকারগণের দ্বারা নিন্দিত[17]।

পালিসাহিত্যে বৌদ্ধযুগে প্রচলিত তিন প্রকার বিবাহ প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়[18]। যথা :

---

15. Women under Primitive Buddhism, I B Horner, pp , 3—4
16. The Age of Imperial Unity, p 559
17. The wonder that was India, A L Basham, p 166
18. Pre—Buddhist India, Ratilal N Mehta, p. 279.

(ক) বর ও কন্যার অভিভাবকগণের দ্বারা স্বীকৃত বিবাহ,

(খ) স্বয়ম্বর বিবাহ এবং

(গ) গান্ধর্ব বিবাহ।

(ক) এই প্রকার বিবাহ প্রথায়, বিবাহের ফলে যাতে মিশ্রিত জাতি-কুলের উদ্ভব না হয় সেই জন্য জাতিকুল ও বংশের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা হত। পিতা-মাতা বা অভিভাবকগণ নিজ নিজ পুত্র কন্যার জন্য সমপর্যায়ের বর্ণ, জাতি-কুল ও বংশমর্যাদাসম্পন্ন পরিবার থেকে পাত্রী পাত্র নির্বাচন করে পুত্র কন্যার বিবাহ দিতেন, তাছাড়া পাত্র পাত্রী পক্ষের সামাজিক মান-মর্যাদা সম্বন্ধেও বিবেচনা করা হত[19]। পাত্র নির্বাচন ক্ষেত্রে পাত্র উপার্জনক্ষম কি না সে বিষয়েও পাত্রীর পিতা বা অভিভাবক অনুসন্ধান করতেন[20]। এই প্রকার বিবাহ প্রথা প্রাগুক্ত প্রাজাপত্য (অর্থাৎ 'উভয়ে মিলিত হয়ে ধর্মাচরণ কর' এই কথা বলে পিতা কর্তৃক বরের হস্তে কন্যা দান) বিবাহ প্রথার অনুরূপ। প্রাজাপত্য বিবাহ-প্রথা তৎকালীন সমাজে বিশেষ প্রসংসাসূচক হওয়ার মূলে কারণ ছিল—কন্যাকে দান করা হত। এক্ষেত্রে দানই মুখ্য, বিবাহ অনুষ্ঠানটি ছিল গৌণ। কারণ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত যাবতীয় ধনসম্পত্তির উপর সর্বময় কর্তৃত্ব থাকায় সেগুলির দানবিক্রয়ের একমাত্র অধিকারী ছিলেন যেমন গৃহকর্তা, তেমনই তাঁর পরিবারস্থ স্ত্রী-পুত্র-কন্যার ওপর তাঁর একাধিপত্য সমাজস্বীকৃত ছিল, এবং সেই পদগৌরবে কন্যাদানের অধিকারী পিতা নিজের পছন্দমত পাত্র নির্বাচন করে বিবাহ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বনির্বাচিত পাত্রটির হস্তে কন্যাটিকে দান করতেন[21]। সুতরাং বলা যায়, এক্ষেত্রে কন্যারা বিবাহ করতেন না, তাঁদের বিবাহ দেওয়া হত, এবং কন্যা পিতৃনির্বাচিত পুরুষটিকে স্বামীরূপে গ্রহণ করে পিতারূপ প্রভুর অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে স্বামীরূপ প্রভুর অধীনতায় বিবাহিত জীবন যাপনের উদ্দেশে পতিগৃহে যাত্রা করতেন[22]।

পালি ভাষায় পুত্রের পরিণয়কে 'আবাহ' এবং কন্যার পরিণয়কে 'বিবাহ' বলা হয়[23]।

বৌদ্ধযুগে কন্যাদের বিবাহের বয়স ঃ

পালি সাহিত্যে কোনো বালিকাকন্যার বিবাহঘটনার কথার উল্লেখ পাওয়া

---

19 India as depicted in early texts of Jainasim and Buddhism, B C Law, p. 148.

20 Lalit Vistara (R Mitra), ch XII of, Paramattha Dipani, Vol V, PTS, p 220

21 Marriage and Family in India, K M Kapadia p 136

22 Ibid

23, বৌদ্ধ পরিণয় পদ্ধতি, ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া, পৃঃ ৯

যায় না, তবে অঙ্গুত্তর নিকায় গ্রন্থে উল্লিখিত দেখা যায়, কথা প্রসঙ্গে নকুলপিতা বলেছেন যে তিনি যখন নকুলমাতাকে বিবাহ করেন তখন নকুলমাতা ষবলে বালিকা মাত্র[24]।

জাতক গ্রন্থের কয়েকটি জাতক[25] কাহিনী থেকে নিম্নলিখিত রূপ বিবাহ পদ্ধতি বিষয়ে জানা যায়ঃ

দুই পরিবারের দুই কর্তা তাঁদের যৌবনকালে পরস্পরের নিকট এই মর্মে বাক্‌দত্ত হতেন যে, উভয়ের মধ্যে একজনের পুত্র ও অপরজনের কন্যা হলে ভবিষ্যতে সেই পুত্র ও কন্যা পরস্পরের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে। অনুরূপ আর একটি বিবাহের ঘটনা ধম্মপদট্ঠকথাতে লিপিবদ্ধ আছে অনাথপিণ্ডিক তাঁর অজাতা কন্যার (চুল্লসুভদ্দা) সঙ্গে তাঁর জনৈক বন্ধুর অজাতপুত্রের বিবাহের কথা স্থির করে রেখেছিলেন[26]।

পালি সাহিত্যে লিপিবদ্ধ উপরোক্ত সূত্রগুলি থেকে অনুমান করা যায়, বৌদ্ধযুগে বাল্যবিবাহ প্রথা একেবারেই অপ্রচলিত ছিল না। তবে সাধারণ ভাবে ষোল থেকে কুড়ি বৎসর বয়সের মধ্যে যে বৌদ্ধযুগের কন্যাদের বিবাহ হত একথা বলা যায়,[27] কারণ পালিসাহিত্যে একদিকে যেমন ষোড়শী কন্যার বিবাহের অথবা ষোল বৎসর বয়স পর্যন্ত কন্যাদের কুমারী থাকার কথা পাওয়া যায়, অপর দিকে তেমনই কুড়ি বা তদূর্ধ্ব বয়সের কন্যার বিবাহের জন্য মাতা-পিতা চিন্তা করছেন বা উক্ত বয়সে কোনো কন্যার বিবাহ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এমন কোনো ঘটনারও উল্লেখ দেখা যায় না।

পাত্র ও পাত্রীর অভিভাবকগণের দ্বারা স্থিরীকৃত বিবাহে উভয় পক্ষের অভিভাবকগণ মিলিত ভাবে বিবাহের জন্য একটি শুভদিন ধার্য করতেন[28]। নির্দিষ্ট দিনে বরসহ বর-যাত্রিগণ কন্যার অভিভাবকের গৃহে উপস্থিত হতেন। কন্যাপক্ষ তাঁদের পরম সমাদরে তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট বাসগৃহে আহ্বান জানাতেন এবং পুষ্পমাল্য, গন্ধদ্রব্য, পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি আনুসঙ্গিক দ্রব্যাদির দ্বারা

---

24 অঙ্গুত্তর নিকায়, ২য় খণ্ড, পি টি. এস পৃঃ ৬১

25. Jatak (Ed by Fousboll), Vol IV, p 112
" ", p. 316
" V, p 269
" VI, p. 71

26 Buddhist Legends (Burlingame), Book 3, p 184

27. Women under Primitive Buddhism, I B Horner, p 27

28. Pre-Buddhist India, Ratilal N Mehta, p 280.

বরপক্ষের সন্তোষ বিধানে তৎপর হতেন[29]। কন্যার অভিভাবকের গৃহে বিবাহ অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হত[30]।

বিবাহোৎসব ঃ

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকে এই মত প্রকাশ করেছেন যে বৌদ্ধগণের মধ্যে বিবাহ উপলক্ষে কোন উৎসব পালন করা হত না। এই প্রসঙ্গে I B Horner বলেছেন—বৌদ্ধগণের বিবাহে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছিল না, কোনও শপথ বাক্য উচ্চারিত হত না, ধর্মকর্মে নৈবেদ্যরূপে উৎসর্গীকৃত কোন উপাচার থাকত না অথবা কুসংস্কার থেকে মুক্ত করতে পবিত্রতারূপে কেউই উপস্থিত থাকতেন না[31]। কিন্তু পালিসাহিত্য পাঠ করলে উপরোক্ত মত সমর্থন করা যায় না, কারণ পালি-সাহিত্য পাঠে হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে বৌদ্ধগণ একান্ত ভাবে ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী। ভারতীয় জীবনধারণের রীতিনীতির ক্ষেত্রে প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধগণের মধ্যে খুব বেশী সাদৃশ্য দেখা যায়, বৌদ্ধগণ হিন্দুদের কয়েকটি সামাজিক রীতি ও প্রথা বর্জন করেছেন মাত্র; অন্যথায় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্তমান। এমনকি পালি অনুশাসনেও কোথাও এমন কোন কথার উল্লেখ পাওয়া যায় না যাতে ধারণা হয় যে বৌদ্ধ ও হিন্দুদের মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠানের ব্যাপারে কোন পার্থক্য ছিল। অঙ্গরাজ্যের ভদ্রীয় নগরের ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর কন্যা বিশাখার বিবাহ উৎসবের বর্ণনা এক বিরাট আড়ম্বর ও বিলাসবহুল উৎসবের চিত্র সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। বুদ্ধঘোষও গৃহে নববধূর আগমন উপলক্ষে বলেছেন—আবাহনং নাম ইমস্স দারকস্স অমুক কুলতো অমুখ নক্খত্তেন দারিকাম আনেতা তি, আবাহম করণম্। বিবাহনম তি ইমাম দারিকাম অমুখস্স নাম দারকস্স অমুক নকখত্তেন দেথ, এবম্ অস্স বড্ঢী ভবিসসতি'তি, বিবাহ করনম্। বুদ্ধ ঘোষের এই উক্তি থেকে স্পষ্টতঃ ধারণা হয় যে, তৎকালীন সমাজ অনুকূল নক্ষত্র ও কাল্পনিক বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে নববধূকে গৃহে আনার দিনস্থির করত।

ধম্মপদ অট্ঠকথা গ্রন্থে বিবৃত আছে যে গৃহী বৌদ্ধগণ তাঁদের কন্যার বিবাহে বুদ্ধদেব ও তাঁর শিষ্যদের নিমন্ত্রণ করতেন[32]। সুতরাং একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে বৌদ্ধবিবাহে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, শপথ ও দায়িত্ব গ্রহণ, নৈবেদ্য নিবেদন ইত্যাদির নিশ্চয়ই বিশেষ স্থান ছিল। বৌদ্ধযুগেও প্রাক্ বৌদ্ধযুগের প্রায়

---

29 বৌদ্ধ রমণী, ডঃ শ্রীবিমলাচরণ লাহা, পৃঃ ৮

30 জাতক, ২য় খণ্ড (ফোসবোল সম্পাদিত), পৃঃ ২২৫—১২৬

31 I B, Horner "Women Under Primitive Buddhism," p 34

32 ধম্মপদট্ঠকথা Vagga P. T S

সমস্ত ভারতীয় রীতি ও ঐতিহ্যের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং বৌদ্ধদৃষ্টি দিয়ে বিচার করলে বোঝা যায়, বৌদ্ধগণ তাঁদের সমসাময়িক ভারতীয় সমাজব্যবস্থা থেকে কিছুটা বিচ্যুত হয়েছিলেন।

পতিগৃহে যাবার পূর্বে কন্যাদের প্রতি পিতার উপদেশ[33] :

১ গৃহের অগ্নি বাহির আনিবে না
(অন্তোগ্গি বহি ন নীহারিতব্বো।)

২ বাহিরের অগ্নি গৃহে আনিবে না
(বহি অগ্গি অন্তো ন পবেসেতব্বো)।

৩ যে অর্পণ করে তাহাকে অর্পণ করিবে
(দদন্তসস এব দাতব্বম)।

৪. যে অর্পণ করে না তাহাকে অর্পণ করিবে না
(অদদন্তস্‌স ন দাতব্বম্‌)

৫ যে অর্পণের যোগ্য, সমর্থ বা অসমর্থ হইলেও
তাহাকে অর্পণ করিবে
(দদন্তসসাপি অদদন্তস্‌সাপি দাতব্বং)

৬ সুখে উপবেশন করিবে
(সুখং নিসীদিতব্বম্‌)।

৭. সুখে ভোজন করিবে
(সুখং ভুঞ্জিতব্বং)।

৮. সুখে শয়ন করিবে
(সুখং নিপজ্জিতব্বং)।

৯ অগ্নি পরিচর্যা করিবে
(অগ্গি পরিচরিতব্বো)।

১০ গুরুজন ও শ্রমন-ব্রাহ্মণকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করিবে
(অন্তোদেবতাপি নমস্‌সিতব্বা'তি ইদং দসবিধং ওবাদং)

বরপণ :

পালিসাহিত্যে বরপণ গ্রহণের বিষয়ে কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু অঙ্গুত্তর নিকায় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, কথা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বলেছেন - প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণী ক্রয়ও করতেন না, বিক্রয়ও করতেন না। পারস্পরিক অনুরাগেই তাঁদের দাম্পত্য-জীবন পরিপুষ্ট হত, কিন্তু অধুনা তাঁরা এই সকল কর্ম

---

33 ধম্মপদট্ঠকথা, পৃ. বিসাখাবত্থু

(অর্থাৎ কন্যা ক্রয়-বিক্রয়) করেন। .[34] বুদ্ধদেবের এই উক্তি থেকে মনে হয় বৌদ্ধযুগে বরপণ নেওয়ার প্রথা তেমন প্রকট না হলেও প্রচলিত ছিল[35]।

কন্যাপণ ঃ

পালিসাহিত্যে বরপণ নেওয়ার কথার উল্লেখ না থাকলেও কন্যাপণ যে নেওয়া হত তার প্রমাণ থেরীগাথা[36]; মিলিন্দ প্রশ্ন[37], জাতক[38] প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, কন্যাপণ গ্রহণ বুদ্ধদেব কর্তৃক নিন্দিত[39]।

যৌতুক ঃ

কন্যার বিবাহের সময় পিতা তাঁর সাধ্যমত বস্ত্র-অলঙ্কারাদি কন্যাকে যৌতুক স্বরূপে দিতেন[40]। পালিসাহিত্য পাঠে জানা যায়, বিশেষ করে ব্রাহ্মণপরিবারে ও সম্ভ্রান্ত নাগরিক পরিবারে কন্যার বিবাহে মহার্ঘবস্ত্র অলংকার ও নানাবিধ বস্তু প্রচুর পরিমাণে কন্যাকে যৌতুকস্বরূপ দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী তাঁর কন্যা বিশাখার বিবাহে এবং অনাথপিণ্ডিক তাঁর কন্যার বিবাহে পর্যাপ্ত পরিমাণে দান সামগ্রী যৌতুক দিয়েছিলেন। কোসলাধিপতি তাঁর কন্যা কোসলদেবীর বিবাহে স্নানব্যয় নির্বাহের জন্য কাশীরাজ্য যৌতুক দিয়েছিলেন। বৌদ্ধযুগে পুত্রকন্যার বিবাহ উপলক্ষ্যে গ্রামবাসিগণের নিকট থেকে উপঢৌকন আদায় করার প্রথা বিদ্যমান ছিল[41]। ধম্মপদট্ঠকথা গ্রন্থে উল্লেখ আছে, ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর কন্যা বিশাখার সঙ্গে মিগার শ্রেষ্ঠীর পুত্র পুর্ণবর্ধনের বিবাহ উপলক্ষ্যে একশত গ্রাম থেকে একশত প্রকার উপঢৌকন আদায় করা হয়েছিল।

জাতিকুল-বংশমর্যাদার বিষয়ে বিবেচনা ব্যতিরেকে বিবাহ ঃ

অনেক ক্ষেত্রে জাতিকুল বা বংশমর্যাদার বিষয়ে চিন্তা না করেও যে বিবাহ হত তার উদাহরণ অবদান কল্পলতা, দিব্যাবদান, মহাবংশ, জাতক, থেরীগাথা প্রভৃতি বৌদ্ধ সংস্কৃত ও পালিগ্রন্থে পাওয়া যায়। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ শাক্য মহানামের দাসীকন্যা মল্লিকাকে বিবাহ করে তাঁকে তাঁর প্রধানামহিষীর পদমর্যাদায়

34 অঙ্গুত্তর নিকায়, তৃতীয় খণ্ড, পি টি এস, পৃঃ ১৬২
35 The position of Women in Hindu civilization, A S Altekar, p 84
36 থেরীগাথা, গাথাসংখ্যা ১৬৩, ৪২০
37 মিলিন্দ প্রশ্ন, ২ ২ ৬
38 Jatak Book (E B Cowell), Vol VI, p 270 and pp 163—165
38 Suttampata, P T S, p. 289
40 Women under primitive Buddhism, I B Horner, p 35
41 বৌদ্ধ রমণী, ডঃ শ্রীবিমলাচরণ লাহা, পৃঃ ৯৭

ভূষিত করেছিলেন[42]। জনৈক ধনী বণিক নিজের পদমর্যাদার প্রতি লক্ষ্য না রেখেই এক দরিদ্র পরিবার থেকে কৃশা গৌতমীকে (কিসা গোতমী) পুত্রবধূরূপে স্বগৃহে নিয়ে আসেন[43]। ভদ্রাকুণ্ডলকেশার (ভদ্দাকুণ্ডল কেসা) পিতা মাতা কুল শীল-মান মর্যাদার অভিমান বিসর্জন দিয়ে কন্যার মনোনীত প্রণয়ী এক তস্করের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেন[44]। বঙ্কহার প্রদেশের শিকারীদের রাজা তাঁর কন্যা চাপার পাণিপ্রার্থী উপক নামে এক পরিব্রাজকের সঙ্গে চাপার বিবাহ দেন[45]। সম্রাট অশোক বিদিশার জনৈক বণিকের কন্যা দেবীকে বিবাহ করেন[46]। এই দেবীর গর্ভেই সম্রাট অশোকের পুত্র মহেন্দ্র (মহিন্দ) ও কন্যা সংঘমিত্রার (সংঘমিত্তা) জন্ম হয়[47]।

বৈদিক শাস্ত্রে স্ববর্ণ-বিবাহ শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য হলেও অনুলোম (উচ্চবর্ণের পুরুষের সহিত নিম্নবর্ণের নারীর বিবাহ) ও প্রতিলোম (উচ্চবর্ণের নারীর সহিত নিম্নবর্ণের পুরুষের বিবাহ) রীতির বিবাহ সমাজে প্রচলিত ছিল[48]। পালিসাহিত্যে অনুলোম বিবাহ রীতির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, কিন্তু প্রতিলোম বিবাহ রীতির কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না, তবে বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ দিব্যাবদানে চণ্ডাল সর্দার ত্রিশঙ্কুর উপাখ্যানে চণ্ডালসর্দারের শিক্ষিত পুত্র শার্দূলকর্ণের সঙ্গে এক ব্রাহ্মণকন্যার বিবাহ ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে[49]।

(খ) স্বয়ম্বর বিবাহ ঃ

প্রাক্ বৌদ্ধযুগে স্বয়ম্বর বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল[50]। তদানীন্তন সাহিত্যে দেখা যায়, স্বয়ম্বর সভায় কন্যার নির্বাচনই চরম। কন্যা কর্তৃক পাত্র মনোনয়নের পর সেই পাত্রের কোনো দোষের কথা জানা গেলেও 'পাত্র' পরিবর্তন করা হত না[51]।

বৌদ্ধযুগেও যে স্বয়ম্বর বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল পালিসাহিত্যে তার কয়েকটি

---

42 Buddhist Legends (Burlingame), Book 2, p 24

43 Paramattha Dipani, P T S., Vol, V, p 147

44 Ibid , p 100

45 Ibid , p 220

46 Mahavansa, VIII, 8

47 Asoka and his inscription, part I & II, B M Barua, p 9 cf "Of Devi were borm the son Mahendra and the daughter Sanghamitra" Asoka, Radhakumud Mookherjee, p 8

48 The position of women in Hindu civilisation, A S Altekar, p 88

49 দিব্যাবদান, পৃঃ ৬০

50 The Age of Imperial Unity (Bharatiya Vidya Bhawan), pp 560—561

51 বৌদ্ধরমণী, ডঃ শ্রীবিমলাচরণ লাহা, পৃঃ ১১

দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কুণাল জাতক কাহিনীতে বলা হয়েছে, রাজকুমারী কৃষ্ণা (কন্হা) তাঁর স্বয়ম্বর সভায় আহূত পাণিপ্রার্থীদের মধ্যে পঞ্চপাণ্ডবকে দেখে মুগ্ধ হন এবং একই সঙ্গে উক্ত পঞ্চজনকে পতিরূপে লাভ করেন[52]। কুলাবক জাতক কাহিনীতে উল্লিখিত অসুররাজ বেপচিত্তির তাঁর কন্যা সুজাতার জন্য উপযুক্ত পাত্র নির্বাচনের উদ্দেশে এক স্বয়ম্বর সভা আহ্বান করেন, এবং সুজাতা সেই সভাস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একজনকে পতিরূপে নির্বাচন করে তাঁর কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করেন[53]। কিন্তু জাতক গ্রন্থ পাঠে একথাও জানা যায়, স্বয়ম্বর সভায় কন্যার মনোনীত পাত্রকে যদি কোনো কারণে কন্যার পিতা অপছন্দ করতেন, তবে তিনি উক্ত মনোনীত পাত্রটির সঙ্গে কন্যার বিবাহ না দিয়ে নিজের পছন্দমত অন্য কোনো পাত্রের হস্তে (কন্যার মতামতের অপেক্ষা না করেই) কন্যাদান করতে পারতেন[54]।

(গ) গান্ধর্ব-বিবাহ ঃ

পালিসাহিত্যে গান্ধর্ববিবাহের উদাহরণ কয়েকটি জাতক[55] কাহিনীতে ও পরমত্থদীপনী[56] গ্রন্থে পাওয়া যায়। গান্ধর্ব-বিবাহ রীতিতে মাতা-পিতা বা অভিভাবকদের অজ্ঞাতসারে এবং কোনো প্রকার শাস্ত্রীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে প্রণয়ীযুগল পারস্পরিক প্রণয়বশে পরস্পরের কণ্ঠে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে বিবাহ কার্য সম্পাদন করেন। পালিসাহিত্যের অন্তর্গত অঙ্গুত্তর নিকায়[57] গ্রন্থে দেখা যায় এইরূপ কামাশক্তিবশতঃ বিবাহ বুদ্ধদের কর্তৃক নিন্দিত হয়েছে।

গান্ধর্ব বিবাহের আর একটি নিদর্শন পাওয়া যায় ধম্মপদট্ঠকথা[58] গ্রন্থে উল্লিখত উজ্জয়িণীরাজ চণ্ডপ্রদ্যোতের কন্যা বাসুলদত্তা ও কৌশম্বীরাজ উদয়ন ঘটনাচক্রে পরস্পরের প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়েন, ফলে বাসুলদত্তা গোপনে পিতৃগৃহ ত্যাগ করে উদয়নের সঙ্গে পলায়ন করেন। অবশ্য পরে উদয়ন বাসুলদত্তাকে বিবাহ করেন এবং তাঁকে রাজমহিষীর পদমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, গান্ধর্ব-বিবাহ—যা কামাসক্ত নর-নারীর দৈহিক মিলনমাত্র এবং সমাজশাস্ত্রকারগণের দ্বারা নিন্দিত তা সসম্মানে সমাজস্বীকৃত ছিল[59]।

---

52 জাতক (ফোসবোল সম্পাদিত), পঞ্চম খণ্ড, পৃ ৪২৬—৪২৭

53 জাতক (ফোসবোল সম্পাদিত), ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৫—২০৬

54 জাতক (ঈশানচন্দ্র ঘোষ কৃত বঙ্গানুবাদ), প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৭১—৭২

55 জাতক সংখ্যা—৭, ১১২, ২২৫

56 পরমত্থদীপনী (পি টি এস) পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৯৯

57 অঙ্গুত্তর নিকায় (পি টি এস) দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৬৭

58 ধম্মপদট্ঠকথা, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৯১

59 The wonder that was India, A L Basham, p 168

রাক্ষস বিবাহ :

পালিসাহিত্যে 'রাক্ষস' পদ্ধতিতে (অর্থাৎ কন্যার আত্মীয়স্বজনকে বিনাশ করে অথবা যুদ্ধে জয়লাভ করে বলপূর্বক কন্যাকে হরণ করে বিবাহ) বিবাহঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। জনৈক তক্র বিক্রেতার স্ত্রী দুষ্টকুমারীকে জনৈক দস্যুদলপতি বলপূর্বক হরণ করে বিবাহ করে[60]। কোশলরাজ বারাণসীর রাজাকে নিহত করে তাঁর রাজ্য অধিকার করেন এবং বারাণসীরাজের অগ্রমহিষীকে স্বীয় প্রধানামহিষীরূপে গ্রহণ করেন[61]।

সহোদর ভ্রাতা-ভগ্নীর বিবাহ :

প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রে সহোদর ভ্রাতা-ভগ্নীর বিবাহ অনুমোদন করা হয়নি[62]। কিন্তু পালি সাহিত্য পাঠে জানা যায়, আভিজাত্য গর্বে গর্বিত রাজকুলে একদা সহোদর ভ্রাতা-ভগ্নীর বিবাহের ফলে যে বংশের সৃষ্টি হল পরে সেই বংশই শাক্যবংশ নামে খ্যাত হয়[63]। শাক্যবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে পালিসাহিত্যের দীঘনিকায়ের অন্তর্গত অম্বট্‌ঠ সুত্ত সহ ঐ গ্রন্থের টীকা সুমঙ্গল-বিলাসিনী গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে—রাজা ওক্‌কাকের ঔরসে তাঁর প্রধানা মহিষীর গর্ভে পাঁচটি কন্যা ও চারটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। এই সন্তানগুলি সকলেই যখন সাবালিকা ও সাবালক হয়ে উঠেছে তখন তাদের গর্ভধারিনী জননীর মৃত্যু হয়। এই ঘটনার কিছুদিন পরে রাজা ওক্‌কাক আর একটি সুন্দরী রমনীর পাণি গ্রহণ করেন। উক্ত নারীটির সাংসারিক বুদ্ধি তীক্ষ্ন থাকায় বিবাহের পূর্বেই তিনি রাজা ওক্‌কাককে এই মর্মে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ করিয়ে নিয়েছিলেন যে, তাঁর গর্ভজাত পুত্রই হবে রাজা রাজা ওক্‌কাকের ভাবী সিংহাসনের অধিকারী। কামার্তরাজা উক্ত শর্তেই রমনীটিকে বিবাহ করেন এবং নববধূর প্ররোচনায় পুত্রদের তাঁর রাজ্য ত্যাগ করে চলে যাবার জন্য আদেশ দেন। রাজপুত্রগণ আপন সহোদরা ভগ্নীদের সঙ্গে নিয়ে পিতৃরাজ্য ত্যাগ করে হিমালয়ের পাদদেশে এক অরণ্যে (উত্তর বিহার আধুনিক নেপাল রাজ্যের সীমা) আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই অরণ্যে কপিল নামে এক মুনির সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়। কপিল মুনির আদেশে রাজপুত্রগণ সেই অরণ্যে নগর প্রতিষ্ঠা করেন এবং কপিল মুনির নামানুসারে তাঁদের প্রতিষ্ঠিত নগরের নাম কপিলবস্তু রাখেন।

---

60 তক্ক জাতক, সংখ্যা ৬৩

61 অসাতরূপ জাতক, সংখ্যা ১০০

62 প্রাচীন ভারতে নারী, শ্রীক্ষিতিমোহন সেন, পৃঃ ১৪
তুলনীয় : বৌদ্ধ রমণী, ডঃ শ্রীবিমলাচরণ লাহা, পৃঃ ৩

63 সুমঙ্গল বিলাসিনী, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৫৮—২৬০ পি. টি এস

তাঁদের সমপর্যায় বর্ণের বর না পাওয়ায় জ্যেষ্ঠা ভগিনীটি বিবাহই করলেন না, এবং সমপর্যায় বর্ণের কন্যা না পাওয়ায় চারজন রাজপুত্রই সহোদরা চারভগ্নীকে বিবাহ করেন[64]।

পালি সাহিত্যে সহোদর ভ্রাতা-ভগ্নীর বিবাহের ফলে আরও কয়েকটি বংশের উদ্ভবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। খুদ্দকপাঠোট্ঠকথা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে—সহোদর ভ্রাতা-ভগ্নীর বিবাহের ফলে লিচ্ছবি রাজবংশের উদ্ভব হয়[65]। পালি সাহিত্যে লিচ্ছবিদের বজ্জী (বৃজি) নামেও উল্লেখ করা হয়েছে। লিচ্ছবিরা যে নগর পত্তন করেন ক্রমশঃ তার আয়তনও হয়ে উঠেছিল বিশাল, সে কারণে তাঁদের রাজধানীর নাম রাখা হয় বৈশালী[66]। বুদ্ধদেবের সময় বৈশালী অতি সমৃদ্ধশালী ছিল[67]। এই লিচ্ছবিগণ পুরুষাণুক্রমে বুদ্ধদেবের সময় পর্যন্ত সাতপুরুষ রাজত্ব করেছিলেন[68]।

সীহবাহু তাঁর সহোদরা ভগ্নী সিংহসিবলীকে বিবাহ করেন[69]। উদয় জাতক কাহিনী থেকে জানা যায়, কাশী রাজ্যের যুবরাজ উদয় ভদ্দ তাঁর মনোমত পাত্রী অন্বেষণে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে তাঁর বৈমাত্রেয় ভগ্নী উদয়ভদ্দাকে বিবাহ করেন[70]।

মাতুলকন্যার সহিত বিবাহ ঃ

সহোদরা বা বৈমাত্রেয় ভগ্নী ছাড়াও মাতুলকন্যাকে বিবাহ করেছেন এমন কয়েকজনের নাম পালিসাহিত্যে উল্লিখিত আছে। মগধরাজ অজাতশত্রু তাঁর মাতুলকন্যা রাজকুমারী বজিরাকে[71], নন্দিয় তাঁর মাতুলকন্যা রেবতীকে[72] এবং পুণ্ডকাভয় তাঁর মাতুলকন্যা সুবর্ণপালিকে[73] বিবাহ করেন। সাধারণ গৃহস্থ

---

64 "তে জাতি সম্ভেদ ভযেন জেট্ঠম্ ভগিনিম মাতিঠানে ঠপেত্বা অবসেসাভি সংবাসং কপ্পেসুং"

সুমঙ্গলবিলাসিনী, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৬০, পি টি এস

65 খুদ্দকপাঠোট্ঠকথা (এইচ স্মিথ সম্পাদিত), পৃঃ ১৫৮—১৬০

66 মহাপরিনির্বাণ সূত্রং (মূলসহ বংগানুবাদ) রাজগুরু জ্ঞানরত্ন মহাস্থবির, পরিশিষ্ট পৃঃ ২৪২

67. The age of Imyenal Unity, p 6

68 মহাপরিনির্বাণ সূত্রং (মূলসহ বংগানুবাদ) শ্রীধর্মরত্ন মহাস্থবির, পরিশিষ্ট পৃঃ ২৪২

69 মহাবংস (গাইগার সম্পাদিত) পৃঃ ৫৩

70 জাতক (ই. বি কোয়েল) ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৬৭

71 মহাবগ্গো, ৮৭ ১, ২, ৩

72 ধম্মপদট্ঠকথা, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৭১ (পি টি. এস.)

73 প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১২ "

পরিবারেও এইরূপ বিবাহ রীতির প্রচলন ছিল। মগধরাজ্যের মঘ নামে জনৈক গৃহস্থ তাঁর মাতুলকন্যা সুজাতাকে বিবাহ করেন[74]।

জাতক গ্রন্থের নচ্চ, অসিলক্ষণ, মুদুপাণি, বড্ঢকিসূকর প্রভৃতি কয়েকটি জাতক কাহিনী পাঠে এই ধারণা হয় যে, বৌদ্ধযুগে ক্ষত্রিয় রাজাদের মধ্যে ভাগিনেয়র সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল[75]।

নারীর বহুবিবাহ ঃ

সমগ্র পালিসাহিত্যে একনারীর একই সঙ্গে একাধিক পতি গ্রহণের একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেখা যায়[76]। কিন্তু পুরুষেরা যে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতেন সে বিষয়ে পালিসাহিত্যে বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। সাধারণতঃ রাজা রাজপুত্র এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের পুরুষরাই বহুপত্নীক হতেন। কোনো কোনো জাতকে এমন রাজার কথাও বলা হয়েছে যাঁদের স্ত্রীর সংখ্যা ষোলো হাজার পর্যন্ত ছিল[77]। রাজা বিম্বিসারের পাঁচশত রাণী ছিলেন[78]। রাজা ওক্কাকার পাঁচজন মহিষী ছিলেন[79]। শাক্যরাজ শুদ্ধোদন দুইজন নারীর পাণিগ্রহণ করেছিলেন[80]। সাধারণ গৃহস্থ পরিবারে একটি স্ত্রী গ্রহণ করে গৃহী মানুষ তাঁর গার্হস্থ্য জীবন যাপন করতেন। কিন্তু মঘ নামে জনৈক গৃহস্থ ব্যক্তির সুধম্মা, চিত্তা, নন্দা ও সুজাতা নামে চারজন পত্নী ছিল[81]।

---

74 প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৭১ "

75 "ভাগিনেয়র সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া ক্ষত্রিয় রাজাদের মধ্যে অসঙ্গত ছিল না।" জাতক, প্রথম খণ্ড ঈশানচন্দ্র ঘোষ, পৃঃ ২৩৭

76 কুণাল জাতক

77 জাতক সংখ্যা ৫১৪ ও ৫০৮

78 মহাবগ্গো, ৮. ১, ১৫

79 সুমঙ্গল বিলাসিনী, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৫৮

80 মহাবংস (গাইগার সম্পাদিত) পৃঃ ১৪ , E J Thomas—The Life of Buddha, পৃঃ ২৪—২৫

উল্লেখ্য ঃ

তদানীন্তন দেশের আইনে কোনো নাগরিকের পক্ষে একাধিক পত্নী গ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু শুদ্ধোদন যুবরাজপদে থাকাকালীন পাণ্ডব নামক এক পার্বত্য জাতিকে পরাস্ত করায় সেই কর্মের পুরস্কার স্বরূপ যুবরাজ শুদ্ধোদনকে দুইটি বিবাহ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

বৌদ্ধরমণী, ডঃ বিমলাচরণ লাহা, পৃ ২৯

81 কুলাবক জাতক, সংখ্যা ৩১ ; ধম্মপদট্‌ঠকথা—মহালিপঞ্ঞুহবত্থু (Vol 1)

সপত্নী ঃ

সাধারণতঃ প্রথমা স্ত্রী বন্ধ্যা হলে স্বামী দ্বিতীয়া স্ত্রী গৃহে আনতেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বন্ধ্যা স্ত্রী মনে করতেন স্বামীর বংশ রক্ষা করা পতিব্রতা স্ত্রীর ধর্ম, এই অনুপ্রেরণায় বন্ধ্যা স্ত্রী কখনও বা স্বামীকে অনুরোধ করে তাঁকে দ্বিতীয়বার বিবাহে রাজী করিয়েছেন[৪২]; কখনও বা নিজেই উদ্যোগী হয়ে স্বামীর বিবাহ দিয়ে গৃহে সপত্নী এনেছেন[৪৩]। কোনো ক্ষেত্রে আবার স্বামী মনগড়া কোনো ধারণার বশবর্তী হয়ে দ্বিতীয়া স্ত্রী গৃহে এনেছেন এমন একটি ঘটনার উল্লেখ পেতবত্থু গ্রন্থে দেখা যায়। জনৈক তন্তুবায় মনে করতেন সন্তানবতী হয়ে তাঁর গর্বিতা স্ত্রী তাঁকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন, তাই স্ত্রীর দর্প চূর্ণ করার অভিলাষে উক্ত তন্তুবায়টি পুনরায় বিবাহ করেন। বব্বু জাতক[৪৪] কাহিনীতে দেখা যায় জনৈক গৃহস্থের স্ত্রী তাঁর মাতার গৃহে গেছিলেন, কিন্তু অনিবার্য কারণবশতঃ পতিগৃহে ফিরে আসতে বিলম্ব হওয়ায় প্রভুত্ব পরায়ণ ক্রোধান্ধ স্বামী স্ত্রী কর্তৃক অপমানিত হয়েছেন এই বোধে স্ত্রীকে দমন করার উদ্দেশে আর একটি বিবাহ করেন। আর একটি জাতক[৪৫] কাহিনীতে দেখা যায়, বারাণসীরাজার পুরোহিত বহুক ব্যাভিচারিণী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে দ্বিতীয়া স্ত্রী গৃহে আনেন।

সপত্নী যন্ত্রণা ঃ

আইনের সমর্থন থাকায় পুরুষরা নানা অজুহাতে একাধিক বিবাহ করতেন[৪৬]। ফলে নারীদের সপত্নী-যন্ত্রণা ভোগ করতে হত, কারণ পূর্ণভাবে স্বামীকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক স্ত্রী-ই হৃদয়ে পোষণ করতেন, কিন্তু গৃহে সপত্নী বর্তমানে কোনো স্ত্রীরই সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হতে পারত না। সুতরাং পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা-দ্বেষবশতঃ পত্নীগণ প্রায়ই কলহ-বিবাদে লিপ্ত থাকতেন, ফলে গৃহজীবন অশান্তিময় হয়ে উঠত। এই ভাবে সপত্নীসহ বাস নারীর পক্ষে চরম দুঃখজনক এই ধারণার সৃষ্টি হল। কোনো এক রাজকন্যার পিতা যখন তাঁর কন্যাকে পাত্রস্থ করার চিন্তা করছিলেন, সেই সময় একদিন তিনি তাঁর মহিষীর কাছে জানতে চান, নারীদের সব চেয়ে বড় দুঃখ কি? উত্তরে তার মহিষী বললেন, 'সপত্তিরোসদুক্খম' অর্থাৎ সপত্নীর সহিত কলহ সব চেয়ে বড় দুঃখ[৪৭]।

---

৪২ পেত বত্থু, পৃঃ ৬, পি টি এস

৪৩ ধম্মপদট্ঠকথা, কালিযক্খিনী বত্থু, ৪ ১—১১

৪৪ জাতক সংখ্যা ১৩৭

৪৫. জাতক সংখ্যা ১১১

৪৬ বৌদ্ধরমণী, ডঃ বিমলাচরণ লাহা, পৃঃ ২২

৪৭ জাতক, ৪র্থ খণ্ড (ফোসবোল সম্পাদিত) পৃঃ ৩২০

কিসা গোতমীও (কৃশা গৌতমী) বলেছেন—'সপত্তিকমপি দুক্খং' অর্থাৎ সপত্নীর সহিত বাস দুঃখজনক[৮৮]। ভূরিদত্ত জাতক[৮৯] কাহিনীর নাগকন্যা বলেছেন—'সপত্তিবাসো ভাবিবো' (সপত্নীর বোষ বড় ভয়ঙ্কর)। সুরুচিজাতক[৯০] কাহিনীতে দেখা যায়, বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত সপত্নীবর্তমান এমন গৃহে কন্যাদান করবেন না এই যুক্তিতে তাঁর কন্যা সুমেধার পাণিপ্রার্থী সুরুচিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, কারণ তাঁর মতে সপত্নীসহ বাস নারীজীবনের সব চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য।

সপত্নীগণের ঈর্ষা দ্বেষপ্রসূত কলহ-বিবাদের বিষক্রিয়া ঃ

ঈর্ষা-দ্বেষ প্রসূত কলহ-বিবাদের বিষক্রিয়া কেবল মাত্র সপত্নীগণের পরস্পরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত না, তা তাঁদের সন্তানদেরও যে স্পর্শ করত এমন উদাহরণও পালিসাহিত্যে পাওয়া যায়। বন্ধ্যা কালীযক্খিণী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে স্বামীর বিবাহ দিলেও সপত্নী সন্তানসম্ভবা হলে ঈর্ষাতুর হৃদয়ে বার বার সপত্নীর গর্ভপাতের চেষ্টা করেছেন এবং পরিণামে সপত্নী হত্যার দায়ে নিজেও স্বামী কর্তৃক নিহত হয়েছেন[৯১]। দশরথ-জাতক কাহিনীর রাজা দশরথ তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয়তমা দ্বিতীয়া মহিষীর কূট-কৌশলে তাঁর প্রধানামহিষীর গর্ভজাত পুত্রকে বনবাসে পাঠান এবং দ্বিতীয়া মহিষীর গর্ভজাত পুত্রকে তাঁর সিংহাসনের ভাবী অধিকারীরূপে স্বীকৃতি দান করেছিলেন[৯২]। রাজা ওক্কাক তাঁর দ্বিতীয়া পত্নীর প্ররোচনায় দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত পুত্রকে তাঁর সিংহাসনের ভাবী অধিকারী বলে স্বীকার করেন এবং তাঁর অগ্রমহিষীর পুত্রদের তাঁর রাজ্য থেকে বহিষ্কারের আদেশ দেন[৯৩]। কালীযক্খিণীর কাহিনীর অনুরূপ আর একটি কাহিনী বিমান বত্থু ভাষ্য গ্রন্থে উল্লিখিত আছে[৯৪]।

সহমরণ বা সতীদাহ প্রথা ঃ

মৃতস্বামীর জ্বলন্ত চিতায় বিধবা স্ত্রীর আত্মাহুতি দেওয়ার রীতিকে 'সহমরণ'

---

88 থেরীগাথা, গাথা সংখ্যা ২১৬

89 জাতক, ষষ্ঠ খণ্ড (ফোসবোল সম্পাদিত), পৃঃ ১৬০

90 জাতক বুক, ৪র্থ খণ্ড (ই বি কোওয়েল), পৃঃ ১১৮

91 ধম্মপদট্ঠকথা, কালীযক্খিণী বত্থু, ৪ ১—১১

92 জাতক, ৪র্থ খণ্ড (ফোসবোল সম্পাদিত) পৃঃ ১২৪

93 দীঘ নিকায়, প্রথম খণ্ড, এন. কে ভাগবত, পৃঃ ১০৩

94 বিমান বত্থু ভাষ্য, পৃঃ ১৪১—১৫৬

তুলনীয় ঃ

বৌদ্ধরমণী, ডঃ বিমলাচরণ লাহা, পৃঃ ২৩

বা 'সতীদাহ' প্রথা বলা হয়। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে সতীদাহ প্রথাকে বিশেষ পুণ্যকর্ম বলে মনে করা হত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় পালিসাহিত্য এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব। এতদ্দৃষ্টে মনে হয়, বৌদ্ধযুগের উত্থান পর্বে সম্ভবতঃ তৎকালীন সমাজে সতীদাহ বা সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল না[95]।

বিবাহ বিচ্ছেদ ও নারীর গত্যন্তর গ্রহণ :

বৌদ্ধযুগে বিবাহবিচ্ছেদ প্রথা যে বিদ্যমান ছিল তার প্রমাণ দেখা যায় পালি সাহিত্যের অন্তর্গত থেরীগাথা[96] মজ্‌ঝিম নিকায়[97] ধম্মপদট্‌ঠকথা[98], বিনয়পিটক[99] প্রভৃতি গ্রন্থে। কিন্তু এ সম্বন্ধে যে সামাজিক আইনেরও নির্দেশ ছিল এমন কোনো নিদর্শন পালিসাহিত্যে দেখা যায় না[100]। কণ্হদীপায়ন জাতক কাহিনীতে দেখা যায় এক নির্যাতিতা গৃহস্থবধূ বিবাহবিচ্ছেদ করে পুনর্বিবাহে সম্মত হন নি, কারণ তা ছিল তাঁর সামাজিক মর্যাদার পরিপন্থী।

বিধবা বিবাহ ও গত্যন্তর গ্রহণ :

বিবাহিতা নারীর এবং বিধবা নারীর পুনর্বিবাহ বহুল প্রচলিত না হলেও মনে হয় প্রচলিত ছিল। ভূরিদত্ত জাতক পাঠে জানা যায়[101] ব্রহ্মদত্তের পুত্র এক জন নাম্নী বিধবা রমণীকে বিবাহ করেছিলেন। 'পরমাত্থদীপনী'তে 'নিয়োগ প্রথা' সম্বন্ধে কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ব্যাখ্যাকার ধর্মপাল লতা-বিমান কাহিনীটির ব্যাখ্যা কালে দেবর শব্দটিকে দুতিয়ো বরোতি ব দেবরো[102], রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু এ-রকম সামান্য দৃষ্টান্ত থেকে আমরা কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি না। তবে বৈদিক সূত্র হিসাবে এগুলি নিঃসন্দেহে মূল্যবান বলে মনে হয়।

থেরীগাথা গ্রন্থের ইসিদাসীর কাহিনী থেকে প্রমাণিত হয় যে কোন স্ত্রী প্রথম পতি কর্তৃক পরিত্যক্ত হলে দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করার পক্ষে সামাজিক কোন বাধা

---

95 "The custom of Sati was quite absent in those days "
Pre-Buddhist India,
Ratilal N Mehta, p 297

96 থেরীগাথা, গাথা সংখ্যা ৪২০, ৪২১

97 মজ্‌ঝিমনিকায়, প্রথম খণ্ড, পি টি. এস পৃষ্ঠা ১০১

98 ধম্মপদট্‌ঠকথা, শ্লোকসংখ্যা ৫, পি টি এস

99 বিনয়পিটক, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৮৩

100 "Divorce was allowed, but it seems without any formal decree". Pre-Buddhist India, Ratilal N Mehta, p 285

101 E B Cowell "Jataka Book," Vol VI, p 80

102 Par. Dip Vol IV, p, 135, P T S., Meena Talim—Woman in early Buddhist Literature, p 164

নিষেধ ছিল না বা নিন্দনীয় কার্যরূপে তা গণ্য করা হত না। ইসিদাসীর পিতা তাঁর সমপর্যায়ের এক যুবকের সঙ্গে ইসিদাসীর বিবাহ দেন, কিন্তু ইসিদাসীর পতি ইসিদাসীর সঙ্গে বসবাস করতে অসমর্থ হয়ে তাকে তার পিত্রালয়ে ফেরৎ পাঠায়। এই ঘটনার পর ইসিদাসীর পিতা অন্য একটি যুবকের সঙ্গে ইসিদাসীর পুনরায় বিবাহ দেন। মহাগোবিন্দ সুত্তে আমরা দেখি মহাগোবিন্দ আধ্যাত্মিক জীবন লাভের উদ্দেশে সংসার ত্যাগ করে যাবার পূর্বে তার চল্লিশ জন পত্নীকে আহ্বান করে বললেন যে যদি তাঁর স্ত্রীরা তাঁর গৃহে থাকতে ইচ্ছুক না হন তবে তাঁরা আপন আপন আত্মীয় স্বজনের কাছে ফিরে যেতে পারেন অথবা ইচ্ছা হলে অন্য পতি গ্রহণ করতে পারেন[103]। অঙ্গুত্তর নিকায় গ্রন্থে[104] বগ্গ বেসালি সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে সে কথা বুদ্ধদেবকে জানালেন যে তাঁর চারজন পত্নী আছে। বেসালী তাঁর স্ত্রীদের সম্ভাষণ করে বললেন, "যিনি ইচ্ছা করেন তিনি এই স্থানের সম্পত্তি উপভোগ করতে পারেন, অথবা প্রশংসনীয় সম্মানার্হ কোন কাজ করতে পারেন, কিম্বা এমন কোনও ব্যক্তি আছেন কি যাঁকে আমি আপনাদের সমর্পণ করতে পারি?" কথিত আছে, জ্যেষ্ঠা স্ত্রী কোনও এক বিশেষ ব্যক্তিকে লাভ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় বেসালি দক্ষিণ হস্তে এক জলপাত্র এবং বামহস্তে ঐ স্ত্রীর হস্ত ধারণ করে ঐ স্ত্রীর আকাঙ্ক্ষিত পুরুষের হস্তে অর্পণ করলেন। মহাউম্মগ জাতকে[105] পিঙ্গুত্তর নামে এক বালকের কাহিনী আছে। পিঙ্গুত্তর তক্ষশিলায় এক প্রসিদ্ধ অধ্যাপকের কাছে বিদ্যার্জনের জন্য গিয়েছিল এবং শিক্ষাসমাপণান্তে অধ্যাপক স্বীয় কন্যার সঙ্গে তার বিবাহ দেন। এই প্রসঙ্গে মনে হয় সেই সময়ে অধ্যাপকগণ নিজ ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে কাউকে যোগ্য বিবেচনা করলে আপন কন্যার সঙ্গে সেই যোগ্য ছাত্রটির বিবাহ দিতেন, এমন একটা রীতির প্রচলন ছিল।

বিবাহের পরে ছাত্রটি তার নবপরিণীতাকে সঙ্গে নিয়ে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করে। পথে কিন্তু সে স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্যবহার করে এমন কি গাছ থেকে ফল তুলে সে নিজে খায় কিন্তু ক্ষুধার্ত স্ত্রীকে ফলের ভাগ দেয় না। ক্ষুধায় কাতর স্ত্রীটি ফল পাড়বার জন্যে যখন একটি বৃক্ষে আরোহণ করে, তখন ঐ যুবকটি বৃক্ষটির চতুর্দিকে এমন ভাবে কাঁটা বিছিয়ে দেয় যাতে তার স্ত্রী গাছ থেকে নামতে না পারে, আর ঐ অবস্থায় সে তার স্ত্রীকে রেখে সেই স্থান পরিত্যাগ করে। ঘটনাচক্রে কোনও এক রাজা ঐ পথ দিয়ে যাবার সময় বৃক্ষোপরি ঐ কন্যাটিকে দেখেন এবং তার প্রতি আকৃষ্ট হন। কন্যাটির এমন অবস্থার কারণ জানতে চাইলে সে তখন

103. N. K. Bhagwat, Digh Nik, Vol II, p 185

104 Ang, N K Vol, IV, p 210, P. T S, Meena Talim—Woman is early Buddhist Literature, p, 164

105 E B Cowell, 'Jataka Book," Vol VI p 73

আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা রাজাকে নিবেদন করলে দযার্দচিত্ত রাজা তাকে সেই অবস্থা থেকে মুক্ত করে স্বীয় রাজ্যে নিয়ে যান এবং তাকে বিবাহ করে রাণীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। উপরোক্ত ঘটনা গুলি থেকে এই রূপই ইঙ্গিত পাওয়া যায়—তদানীন্তন কালে কোন নারী স্বামী কর্তৃক অবহেলিতা বা পরিত্যক্তা হলে সেই নারীর পুনর্বিবাহ করার পথে কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল না।

বিবাহোৎসব ঃ

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই এই মত প্রকাশ করেছেন যে বৌদ্ধগণের মধ্যে বিবাহ উপলক্ষ্যে কোন উৎসব পালন করা হত না[106]। এই প্রসঙ্গে I B Horner বলেছেন—বৌদ্ধগণের বিবাহে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছিল না, কোনও শপথ বাক্য উচ্চারিত হত না, ধর্মকর্মে উৎসর্গীত নৈবেদ্যরূপে কোন জিনিষও থাকত না অথবা কুসংস্কার থেকে পরিত্রাতা রূপে কেউই উপস্থিত থাকতেন না[107] কিন্তু পালিসাহিত্য আলোচনা করলে উপোরক্ত মত সমর্থন করা যায় না, কারণ পালিসাহিত্য পাঠে গভীর ভাবে অনুভব করা যায় যে বৌদ্ধগণ একান্তভাবে ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী। ভারতীয় জীবনধারনের রীতিনীতির ক্ষেত্রে প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধগণ হিন্দুদের কয়েকটি সামাজিক রীতি এবং প্রথা বর্জন করেছেন মাত্র; অন্যথায় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব বেশী সাদৃশ্য দেখা যায়। এমন কি পালি অনুশাসনেও কোথাও এমন কোন কথার উল্লেখ পাওয়া যায় না যাতে ধারণা হয় যে বৌদ্ধ ও হিন্দুদের মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠানের ব্যাপারে কোনো পার্থক্য ছিল। অঙ্গরাজ্যের ভদ্রীয় নগরের পালিসাহিত্য পাঠে জানা যায়, বৌদ্ধযুগে নারীর পত্যন্তর গ্রহণের রীতি প্রচলিত ছিল। বিবাহিতা নারী স্বামী কর্তৃক প্রত্যাখাতা হলে তিনি পুনরায় বিবাহ করতে পারতেন[108]। স্বামী প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলে স্ত্রী ইচ্ছা করলে পুনর্বিবাহ করতে পারতেন। দীঘনিকায় গ্রন্থের অন্তর্গত মহাগোবিন্দসুত্তে দেখা যায়, প্রব্রজ্যা গ্রহণের প্রাক্‌কালে মহাগোবিন্দ তাঁর চল্লিশজন পত্নীকে সম্বোধন করে বলেছিলেন যে, তিনি প্রব্রজিত হওয়ার পর যদি তাঁর স্ত্রীগণ তাঁর গৃহে বাস করতে অনিচ্ছুক হন তবে তাঁর স্ত্রীরা ইচ্ছা করলে কোনো আত্মীয়স্বজনের গৃহে বাস করতে পারেন অথবা দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করতে পারেন[109]। অনুরূপ একটি ঘটনা অঙ্গুত্তরনিকায় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে[110]।

106 "Art and Family" (Buddhist), E R E
107 I B Horner, "women under primitive Buddhism;" p 34
108 পরমত্থদীপনী, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১৩৫, পি টি এস
109 দীঘনিকায়, ২য় খন্ড (বঙ্গানুবাদ), ভিক্ষু শীলভদ্র, পৃঃ ২২২
110 অঙ্গুত্তর নিকায়, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ২১০, পি টি এস

স্বামী পরিত্যক্তা স্ত্রীরও পুনর্বিবাহে বাধা ছিল না। পিঙ্গুত্তর নামে জনৈক ব্যক্তি এক গভীর অরণ্যে নিষ্ঠুরভাবে তার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে। সেই অরণ্যে ঘটনাক্রমে এক রাজা উপস্থিত হন এবং উক্ত স্বামীপরিত্যক্তা স্ত্রীর নিকট সকল বৃত্তান্ত অবগত হয়ে তাকে নিজের রাণীর পদমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন[111]। পত্যন্তর গ্রহণ যে বক্ষ্যমাণ যুগের নারীদের পক্ষে বাধা ছিল না তার আরও একটি প্রমাণ পাওয়া যায় বেস্সন্তর জাতক কাহিনীতে। পিতা কর্তৃক নির্বাসনদণ্ড প্রাপ্ত বেস্সন্তর পত্নী মাদ্রীকে অনুরোধ করেছেন, তিনি নির্বাসনে চলে গেলে মাদ্রী যেন মনোমত দ্বিতীয় ভর্তা খুঁজে নেন, এবং কায়-মনো-বাক্যে সেই দ্বিতীয় ভর্তার পরিচর্যা করেন[112]।

বিধবা বিবাহ ঃ

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীরা সহমৃতা হতেন কি না সে বিষয়ে পালিসাহিত্যে কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না, কিন্তু বিধবাবিবাহ যে তৎকালীন সমাজে প্রচলিত ছিল তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় পালিসাহিত্যে লিপিবদ্ধ নকুলমাতার[113] কাহিনী ও উৎসঙ্গ জাতকে বর্ণিত জনৈক রমণীর কাহিনী থেকে[114]। অসতরূপ জাতকে উল্লিখিত স্ফুপবাসার [115] উক্তি থেকে তৎকালীন ভদ্রসমাজে যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল তার একটি আভাষ পাওয়া যায়। রাজা খল্লাটাঙ্গের মৃত্যুর পর, রাজা বটগামনি তাঁর বিধবা ভ্রাতৃজায়া (খল্লাটাঙ্গের মহিষী) অনুলা দেবীকে বিবাহ করেন[116]। ভূরিদত্ত জাতক কাহিনীতে দেখা যায়, বারাণসীর ব্রহ্মদত্তের পুত্র এক বিধবা নাগরমনীকে বিবাহ করেছেন[117]।

নারীর বৈধব্য জীবন ঃ

পালিসাহিত্যে নারীর বৈধব্য জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে পালিসাহিত্য পাঠে এই ধারণা হয় যে, বিধবাদের ক্ষেত্রে স্মৃতিশাস্ত্র-কারগণের নির্দেশিত বিধি-নিষেধের কঠোরতা খুব অল্পই প্রযোজ্য হত। যদিও বৌদ্ধযুগে বিধবার সাংসারিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটত, কিন্তু তার ফলে সামাজিক মর্যাদা যে তাতে তাঁর ক্ষুণ্ণ হত এমন কোনো কথার উল্লেখ পালিসাহিত্যে পাওয়া

---

111 মহা উম্মগ্‌গ জাতক

112 জাতক, ৬ষ্ঠ, খণ্ড বেস্সন্তর জাতক

113 অঙ্গুত্তর নিকায়, ৩য় খণ্ড (পি টি. এস), পৃঃ ২৯৫

114 জাতক সংখ্যা ৬৭

115 জাতক সংখ্যা ৬০

116 মহাবংস (গাইগার সম্পাদিত) পৃঃ ২৬৯—২৭০

117. জাতক বুক (কোওয়েল), ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৮০

যায় না। তাঁকে কেশমুণ্ডন করতে হত না, অলংকার, গন্ধদ্রব্য ইত্যাদির ব্যবহার ত্যাগ করতেও হত না। অশুভের প্রতীক বিধবা নারী এই ধারণায় বিধবা নারী কোনো মাঙ্গলিক কর্মে যোগ দিতে পারতেন না এমন কোনো কথার উল্লেখও পালিসাহিত্যে দেখা যায় না। মহাপ্রজাবতী গোতমী স্বামীর মৃত্যুর পর মস্তক মুণ্ডন করেন নি, কিন্তু যখন তিনি সংসারে বীতরাগ হয়ে সংসার ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবেন বলে স্থির করলেন, তখন তিনি মস্তক মুণ্ডণ করে কাষায় বস্ত্র পরিধান করেছিলেন[118] থেরীগাথা[119] গ্রন্থে দেখা যায় বিধবা নারী প্রব্রজ্যা গ্রহণের পূর্বে মস্তক মুণ্ডন করে কাষায় বস্ত্র ধারণ করেছেন।

বেস্সন্তর জাতক কাহিনীতে শিবিরাজ্যের রাজবধূ মাদ্রীর উক্তির মাধ্যমে তৎকালীন সমাজে বিধবা নারীর নানা দুঃখ-দুর্দশাময় অপমান লাঞ্ছিত মর্যাদাহীন বৈধব্য-জীবনের একটি অতি করুণ চিত্র সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই চিত্র পরিস্ফুটনে মাদ্রীর বর্ণন তুলিকায় বিধবা নারী কোথাওই নিরাভরণা, মুণ্ডিতমস্তক রূপে চিত্রিত হয় নি। তবে বৈধব্যজীবন বর্ণনা প্রসঙ্গে মাদ্রীর উক্তির মধ্যে 'অনাথা', 'সহায়বিহীনা', 'জলহীনা নদী' ইত্যাদি শব্দগুলির প্রয়োগ দেখে মনে হয়, তৎকালের সমাজে বিধবা নারীর নিরাপত্তার একান্তই অভাব ছিল। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পতিহীনা নারীকে মাতা, পিতা, ভ্রাতা অথবা কোনো আত্মীয় স্বজনের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে হত। আশ্রয় প্রার্থনার মাঝে যে হীনমন্যতা থাকে তাকেই হয়ত প্রাধান্য দিয়ে জাতককার বৈধব্যজীবনকে এইরকম করুণ রূপে বর্ণনা করেছেন[120]। নানা দুঃখময় বৈধব্য জীবন থেকে নিষ্কৃতি বা মুক্তি লাভের উপায় স্বরূপ সমাজস্বীকৃত বিধবাবিবাহ প্রথা তৎকালে প্রচলিত থাকলেও অনেক বিধবা নারী এই সমাজ-ব্যবস্থাকে আন্তরিক ভাবে সমর্থন করতে পারেন নি বলে মনে হয়[121]। কারণ নারীদের মধ্যে মাতৃত্বের যে দায় ও অন্তর্নিহিত কল্যাণের যে আদর্শ আছে তাকে উপেক্ষা করে সমাজস্বীকৃত উক্ত ব্যবস্থাকে গ্রহণ করতে তাঁরা সক্ষম হননি। অবশ্য যাঁরা এই দুঃসহ বৈধব্যজীবন থেকে প্রকৃতভাবে মুক্তি লাভ করতে চেয়েছিলেন তাঁরা তা পেয়েও ছিলেন, তবে তা পুনর্বিবাহের মাধ্যমে কোনো পুরুষ বিশেষকে আশ্রয় করে নয়, সে মুক্তি তাঁরা পেয়েছিলেন ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘকে আশ্রয় করে, যার সাক্ষ্য আছে থেরীগাথা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ কয়েকটি গাথায়[122]।

---

118 মনোরথপূরণী, প্রথম খণ্ড (পি টি এস), পৃঃ ৩৪০

119 থেরীগাথা, গাথা সংখ্যা ১০৩

120 Women under Primitive Buddhism, I B Horner, p 73

121 The position of women in Hindu civilization, A S Altdkar, p 170.

122 থেরীগাথা, গাথা সংখ্যা ১০৮—১০৯, ১১৩, ১২২—১২৬, ১৫৭

বিভিন্ন রূপে নারী

সমাজে নারী সাধারণতঃ জায়া, জননী ও কন্যা এই তিনরূপে তাঁর ভূমিকা গ্রহণ করেন। পালিসাহিত্যে বিশেষ করে তার অন্তর্গত জাতক গ্রন্থের কাহিনীগুলিতে যে সামাজিক তথ্য রয়েছে তাতে নারীকে তাঁর উক্ত ত্রয়ী ভূমিকায় অধিষ্ঠিতা দেখা যায়।

সৌন্দর্য সচেতনতা ঃ

বৌদ্ধযুগে সৌন্দর্যকে শ্রদ্ধা ও প্রশংসা করা হত এবং খুব উচ্চে স্থান দেওয়া হত। যদিও বৌদ্ধ গ্রন্থগুলিতে প্রধানতঃ সন্ন্যাস জীবনের বৃত্তান্তই বিবৃত হয়েছে; তথাপি সেগুলিতে শিল্পীজন সুলভ উপলব্ধি গোপন করার কোন প্রয়াস দেখা যায় না। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় শিল্পীসুলভ অনুভূতি এবং উপলব্ধি বৌদ্ধ সমাজের প্রধান গুণ ছিল। সুন্দরী নারীদের "জনপদবধূ কল্যাণী" এই বিশেষ উপাধিতে ভূষিতা করা হত। দেশের সর্বশ্রেষ্ঠা-সুন্দরীকে বলা হত "নগর শোভিনী"। এই উপাধি প্রাপ্তি বিষয়ে কোন জাতিগত বাধা ছিল না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র যে কোন জাতির সুন্দরী কন্যাগণ এই উপাধি লাভ করতে পারত। এই রকম সম্মানজনক উপাধি লাভ করার পক্ষে বারাঙ্গনাদেরও কোনও বাধা ছিল না। বর্তমান কালে প্রাপ্ত বৌদ্ধযুগের স্থাপত্য ও চিত্রকলায় বৌদ্ধযুগের সৌন্দর্য উপলব্ধির যে পরিচয় পাওয়া যায় সে গুলিকে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কেবলমাত্র সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে গণ্ডীবদ্ধ না রেখে অনুভূতিশীল হৃদয় দিয়ে বিচার করলে সে গুলিকে কেন্দ্র করে বহু পুস্তক রচনা করা যায়।

বৌদ্ধধর্মের অন্তর্গত নিকায় গ্রন্থগুলিতে সৌন্দর্য সম্বন্ধে খুবই অল্প বলা হয়েছে; কিন্তু জাতক ও অট্ঠকথা ভাষ্যগুলিতে এর বিস্তৃত বর্ণনা আছে[123] মনিচোর জাতকে বোধিসত্ত্বের স্ত্রীকে 'দেবকন্যার মত সুন্দর, জড়ানো লতার মত লালিত্যপূর্ণ এবং পরীর মত মনোহর এক সুন্দরী কন্যা রূপে বর্ণনা করা হয়েছে; বিমানবত্থু[124] গ্রন্থে দেখা যায় মহারথ বিমানের নারীর সৌন্দর্যের বিবরণ দিতে গিয়ে লেখক আরও বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর ঘনপল্লব যুক্ত বিশাল চক্ষু-যুগল মৃগনয়নের মত (মিগমন্দলোচনা) কোমল ও স্নিগ্ধ ছিল। তিনি স্মিত হাস্যমুখে মৃদুমধুর স্বরে কথা বলতেন। তাঁর গাত্রবর্ণ ছিল সুগৌর, তাঁর

123 E B Cowell, "Jataka Book," Vol, II, p. 85

124 H. S Gehman and J Kennedy, "The Minor Anthologyies of the Pali Canon" part IV, pp, 102—103

কটি দেশ, নিতম্ব, জঙ্ঘা এবং বক্ষযুগল ছিল অতীব সুন্দর সুগঠিত এবং মনোহর। তাঁর অঙ্গুলিগুলি ছিল পুষ্ট ও সুগঠিত এবং তাঁর উজ্জ্বল কেশরাশি সুচারুরূপে বেণীবদ্ধ ছিল।

নারীর সৌন্দর্য সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা ছিল যে নারীর সৌন্দর্য পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে নিহিত, সেই পাঁচটি বিষয় হল—কেশ, মাংস, অস্থি, ত্বক ও যৌবন। ধম্মপদ অট্ঠকথা গ্রন্থে বিশাখামিগার মাতার কাহিনী প্রসঙ্গে নারী সৌন্দর্য বিষয়ে উল্লিখিত আছে—সেই নারীর ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় কেশরাশি খুলিয়া দিলে পরিহিত বস্ত্রের নিম্নভাগ পর্যন্ত লুণ্ঠিত হয়, এই হল কেশরাশির সৌন্দর্য। সুন্দর উজ্জ্বল রং-এর ওষ্ঠযুগল যা পেলব লতার মত এবং যা স্পর্শ সুখকর—এই হল শারীরিক সৌন্দর্য। শুভ্র সুন্দর দন্তরাজি যা ঝিনুকের মধ্যে সুসজ্জিত ও শ্রেণীবদ্ধ ভাবে গ্রথিত হীরার মত, এই হল অস্থির সৌন্দর্য। সেই নারীর গাত্র চন্দন লেপন ছাড়াই সুগন্ধিত, কোন বিলেপন বিনাই নীল পদ্মমালার ন্যায় উজ্জ্বল এবং কংকার ফুলের মত শুভ্র, এই হল ত্বকের সৌন্দর্য। তাঁর যৌবনসুলভ সজীবতা, তাঁর দশবারের সন্তান উপস্থিতিকে মনে হত একবারের উপস্থিতি, এই হল যৌবনের সৌন্দর্য[125]।

ধম্মপাল অম্বপালি (আম্রপালি)র সৌন্দর্যের একটি প্রাণবন্ত চিত্র অঙ্কিত করেছেন[126]। অম্বপালির প্রতিটি অঙ্গ যেন সৌন্দর্যের আকর ছিল; সেই জন্য ধম্মপাল বিশেষ বিস্তৃতভাবে তাঁর কবিতায় অম্বপালির প্রতিটি অঙ্গের সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা করেছেন। অম্বপালির কুঞ্চিত কেশরাশি ঘনকৃষ্ণ ও নীলাভ ছিল। এই কেশের সৌন্দর্য, সুন্দর ও সুবিন্যস্ত ভাবে লাগান নিবিড় অরণ্যের মত ছিল। সুদক্ষ শিল্পীর নিপুণ হাতে আঁকার মত তাঁর ভ্রূযুগল সুন্দর ছিল। অঙ্গুরীতে গ্রথিত মণির মত (মনি মুদ্দিকাবযা) উজ্জ্বল ও সুন্দর ছিল তাঁর চক্ষুদুটি। তাঁর নাসিকা তাঁর মুখমণ্ডলের অনুরূপ (মুখাবয়ানমূ অনুরূপা) সুগঠিত ছিল। সৃষ্টিকর্তার কারিগরি নৈপুণ্যে গঠিত ছিল তাঁর কর্ণযুগল। তাঁর দন্তরাজির বর্ণ ছিল কদলীমুকুলের ন্যায় (কদলি মকুল সাদিসা বণ্ণা)। বনের স্বাধীন কোকিলের মত সুরেলা সুরের মত ছিল তাঁর কণ্ঠস্বর। অতুলনীয় সুন্দর সুবর্ণ শঙ্খের মত (সুবম্ম সংখজ বিব) ছিল তাঁর কমনীয় গ্রীবা। তাঁর হস্ত ও বাহুদ্বয় সুগঠিত এবং তাঁর দৈহিক আকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে গঠিত ছিল তাঁর পেলব হস্ত ও বাহুদ্বয়। সুপুষ্ট গোলাকৃতি ও সুউচ্চ ছিল তাঁর স্বর্ণবর্ণের (সুবণ্ণ কলাপিবো) স্তনযুগল। তাঁর সুন্দর উরুদ্বয় ছিল মসৃণ। তাঁর পদদ্বয়

---

125 H. Warren, "Buddhism in Translation," p 454, P. T. S , ধম্মপদট্ঠকথা বিসাখা বত্থু

126 Par, Dip *Vol*, V p, 135

ছিল কোমল ও সুন্দর এবং যেন তালপত্রদ্বারা প্রস্তুত পাদুকার ন্যায় চিক্কন (মুদুসিনিগ্ধ ভাবেন সিংবলী তূলপণ্ণ পালিগুণ্ঠিতা উপাহনম সাদিসা)। তাঁর সমস্ত শরীর ছিল সুমার্জিত সুবর্ণ পাত্রের মত উজ্জ্বল।

তৎকালীন সমাজ সৌন্দর্য সম্বন্ধে উপোরক্ত ধারণা পোষণ করত।

সাধারণতঃ মানুষের কাছে গৌরবর্ণেরই বেশী আদর ছিল। পালিসাহিত্য পাঠে জানা যায় বিম্বিসারের পত্নী ক্ষেমার গাত্রবর্ণ স্বর্ণাভ গৌর ছিল। কিন্তু অনুমান করা যায় যে কেবল মাত্র গৌরবর্ণই সৌন্দর্যের মাপকাঠী ছিল না। উপ্পলবন্নার[127] সৌন্দর্যের খ্যাতি জম্বুদ্বীপের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। উপ্পলবন্নার (উৎপলবর্ণা) গাত্রবর্ণ ছিল নীলপদ্মের ভেতরের অংশের বর্ণের মত। এই থেকে সাধারণ মানুষের সৌন্দর্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। মার তাকে বলেছিল—'তোমার সমান সুন্দরী কেহ নাই।"

অপদান সাহিত্যের এই ক্ষেত্রে অবদান আছে অর্থাৎ সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা বিস্তৃত দেওয়া আছে। বিম্বিসারের রূপগর্বিতা পত্নী ক্ষেমাকে বুদ্ধদেব এমন এক সর্বাঙ্গ সুন্দরী রমণীমূর্তি দেখান, যার পদ্মপলাশ লোচনযুগল মনোরম অথচ নম্র ছিল (মনোনেত্তা সান্নলা)। যার দেহ যেন ফুলেভরা যূঁইলতার মত (কুন্দসুসনা) ধীর ওষ্ঠদ্বয় যেন পক্কবিম্বফলের মত (বিম্বোঠি যার গাত্রবর্ণ স্বর্ণাভ গৌর ছিল)[128]।

সংস্কৃত ভাষায় রচিত বৌদ্ধগ্রন্থগুলি সৌন্দর্য বর্ণনায় আরও বিস্তৃত। ললিতবিস্তর গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিম্বসম্রাটের রাণীর সৌন্দর্যবর্ণনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলেছেন তিনি খুব দীর্ঘাঙ্গী বা হ্রস্বাঙ্গী, নাতিস্থূল, নাতিক্ষীণ, নাতি গৌরী, নাতি কৃষ্ণা ছিলেন না, কিন্তু অত্যন্ত সুন্দরী এবং অনুপমা সুদর্শনা ছিলেন; তাঁর অঙ্গের সুবাস চন্দনের সুগন্ধ এবং তার মুখের গন্ধ পদ্মগন্ধ স্মরণ করিয়ে দেয়। তাঁর পদদ্বয় শীতকালের উষ্ণতা এবং গ্রীষ্মকালের শীতলতা স্মরণ করিয়ে দেয়[129]।

অশ্বঘোষ সুন্দরী নামে এক লাবণ্যময়ী নারীর রূপবর্ণনায় আরও উৎকৃষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন। এই নারিটি সুন্দরী নামে অভিহিত হয়েছিল কারণ এই নারীটির প্রতিটি অঙ্গ সুন্দর ছিল। তার অহঙ্কার ও জেদের জন্য তাকে 'মানিনী' এবং প্রেম ও তেজস্বিতার জন্য 'ভামিনী' বলা হত[130]। সুন্দরীর রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে অশ্বঘোষ আরও বলেছেন যে, সুন্দরী যেন স্ত্রীরূপে এক পদ্মসরোবর, তার হাস্যধ্বনি যেন রাজহংসের কলকণ্ঠ, ভ্রমরের মত তার চক্ষুযুগল, তার স্তনদ্বয় যেন সরোবরে উন্নত পদ্মকোরকের মত। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, মনুষ্যসমাজে

127 Per, Dip, V p 197, Meena Talim—Woman in early Buddhist Lit p 168

128 M E Lilley, "Theri Apadana", p 548

129 R Mitra, "Lalita Vitara," ch III

130 E H Johnstone, "The Sundamananda or Nanda the Fair," p 20

সুন্দরীতুল্য কোন রমণী ছিল না। সুন্দরী ছিলেন নন্দনকাননে ইতস্ততঃ ভ্রমণরতা দেবীর ন্যায় যাঁর পদযুগল ও ওষ্ঠাধরের রং ছিল লালপদ্মের পাপড়ির মত[131]।

এখন বিপরীতদিক থেকে সমালোচনা করলে বক্ষ্যমান প্রবন্ধে উল্লিখিত তৎকালে প্রচলিত সৌন্দর্যের ধারণা সম্বন্ধে আরও বিশদ ভাবে বোঝা যাবে। অবদানশতকে কুৎসিত শরীরের আঠারটি সংজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন—পিঙ্গলাক্ষী, ব্রণাঙ্কিত মুখ, স্থূল ওষ্ঠ্য (লম্বোষ্ঠ), উর্ধ্বকেশা, ক্ষুদ্রললাট (হ্রস্বললাট) সিংহভ্রূ, সাদাদাগযুক্ত নখ (পুষ্পিতনখ), ফাঁক ফাঁক দাঁত (প্রবিরল দন্ত), খাড়া খাড়া লম্বা দাঁত (dantur) অতি দীর্ঘ বা অতি হ্রস্ব বাহু, অতি কৃষ্ণ, বাহ্বাসি, বিকটপদ, অতি গৌরবর্ণ, তীক্ষ্ণস্বর (খরালাপ), অস্থিপ্রকটিত দেহ, অতি কর্কশাঙ্গ)[132]। এই আঠার প্রকার কুৎসিৎ দেহের সংজ্ঞা সুন্দর দেহের বৈপরীত্য প্রমাণ করে।

বৌদ্ধ সাহিত্যের নানা পুস্তকে সৌন্দর্য সম্বন্ধে অনেক তথ্য পরিবেশিত হয়েছে, যা খুবই চিত্তাকর্ষক। ত্রিপিটকেও সৌন্দর্যের প্রশংসার বীজ অন্তর্নিহিত ভাবে রয়েছে যা প্রথমে চোখে পড়ে না কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মনে হয় ত্রিপিটক গ্রন্থগুলি প্রধানতঃ মঠে উৎসর্গ করার উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা। সেকারণে সৌন্দর্যের ধারণা সম্বন্ধে সাবলীল প্রকাশে কিছুটা বাধা থাকায় গ্রন্থকারগণ আভাসে ইঙ্গিতে সৌন্দর্য সম্বন্ধে একটা ধারণা দেবার প্রয়াসী হয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ ত্রিপিটকের অন্তর্গত বিমানবত্থু জাতক এবং অপদান গ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য। অট্ঠকথা গ্রন্থে সৌন্দর্য সম্বন্ধে ধারণা আরও প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে, মহাযান বৌদ্ধসাহিত্য যা আরও শিল্পীসুলভ দক্ষতা, সুরুচি ও সংস্কৃতি সম্পন্ন এবং মার্জিত কাব্যিক উপাদানে গঠিত। এইভাবে বৌদ্ধসাহিত্যের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজের মানুষের সৌন্দর্য-বোধের ক্রমবিকাশের প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই।

যেহেতু সাহিত্য সমাজের প্রতিবিম্ব, সেহেতু পালিসাহিত্যও এর ব্যতিক্রম নয়, তাই দেখা যায়, তখনকার দিনের সমাজস্বরূপের চিহ্ন সে বহন করে আছে। তবে দৃষ্টিতে যখন বাস্তব সত্যের রূপান্তর ঘটে তখন তা আর বাস্তবসত্যের হুবহু অনুকরণ মাত্র থাকে না—হয়ে ওঠে এক নতুন সৃষ্টি। পাশ্চাত্য সাহিত্যসমালোচকগণ এই সৃষ্টি—পালি সাহিত্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, সাহিত্যের সত্য আর বাস্তব সত্য এক নয় যদিও তাদের উৎস মূল[133] একই। তির্যক

131 Ibid pp. 20—22

132 J S Speyer, "Buddhist Bibliotheca, Vol III, Avadana Satakam Vol II, p 52

133 সাহিত্য তত্ত্ব, সাধনকুমার ভট্টাচার্য, পৃঃ ৩৫৪

উপায়ে কবি বা সাহিত্যিক তাঁর নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করেন—কখনও মনুষ্যেতর জীব-জন্তুর আধারে, কখনও বা মনুষ্যশক্তি অপেক্ষা বলবান অতিমানবের কার্যাবলীর মাধ্যমে। জাতক গ্রন্থে আমরা এই উভয় শ্রেণীর সঙ্গেই পরিচিত হই। আবার যেখানে কোনো নীতিকথা গল্পের মাধ্যমে সোচ্চার হয়ে উঠেছে, তাও জাতক গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। সুতরাং বলা চলে, তৎকালীন সম্পূর্ণ সমাজ-ব্যবস্থাকেই জাতকগ্রন্থে রূপায়িত করার প্রচেষ্টা হয়েছে, আর সে সমাজব্যবস্থার প্রধান ভূমিকায় রয়েছে নারী, যে নারী একদিকে স্নেহে, প্রেমে, ধর্মে, সহিষ্ণুতায় মহীয়সী[134] অপর দিকে হিংস্রতায়, ক্রূরতায়, জিঘাংসায় ভয়ঙ্করী[135]।

একটি জাতক কাহিনীতে[136] বলা হয়েছে, নয়টি কারণে রমণীদের ওপর দোষারোপ করা হয়। আর একটি জাতক কাহিনীতে[137] দেখা যায়, পঁচিশটি বিভিন্ন উপায়ের দ্বারা কিভাবে-অসৎ প্রকৃতির নারীকে চিনতে পারা যায়। স্ত্রী চরিত্রের অসাধুতা ও হীনতা সম্বন্ধে পালি সাহিত্যের অন্তর্গত মিলিন্দ পঞ্হ, অঙ্গুত্তর নিকায়, সংযুক্ত নিকায় প্রভৃতি গ্রন্থে নানাবিধ মন্তব্য লিপিবদ্ধ আছে দেখা যায়। আবার ধম্মপদট্‌ঠকথা অঙ্গুত্তর নিকায়, সংযুক্ত নিকায়, পরমত্থদীপনী প্রভৃতি গ্রন্থে নারী-চরিত্র সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও সম্মানসূচক বহু মন্তব্য লক্ষ্য করা যায়। বিমানবত্থু গ্রন্থে সুশীলা, সাধ্বী, ধর্মপরায়ণা আদর্শ নারী মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে গিয়ে কিভাবে স্বর্গসুখ উপভোগ করেন এবং পেতবত্থু গ্রন্থে অসৎচরিত্রা, বিশ্বাস-ঘাতিনী, হিংসাপরায়ণা, অসতী নারীগণ মৃত্যুর পর নরকে গিয়ে কিভাবে -নরক যন্ত্রণা ভোগ করেন তার বিশদ বিবরণ সহ বহু দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ আছে। এইভাবে দেখা যায়, সুন্দর ও অসুন্দরের, ভাল ও মন্দের সদ্ভাবে পালি সাহিত্যের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ।

---

134 সম্বুল, অকৃকটা, সুজাতা, অসিতাভু, সাকেত, মদুলকৃখণা, তেমিয়, মহাজনক প্রভৃতি জাতককাহিনী দ্রষ্টব্য।

135 অসাতমন্ত, অন্ধভূত, তক্ক, দুবয়ান, অনভিরতি, কুণাল প্রভৃতি জাতক কাহিনী দ্রষ্টব্য।

136 জাতক, পঞ্চম খণ্ড (ফোসবোল সম্পাদিত) ; G 296—7

137 প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩৪—৪৩৫

পালিসাহিত্যে নারী জায়ারূপে

পালিসাহিত্যে নারী জায়ারূপে চরিত্রগত নানা বৈশিষ্ট্যসহ উপস্থাপিত হয়েছেন। অঙ্গুত্তর[138] নিকায় গ্রন্থে সাত প্রকার চরিত্রের (যথা—বধকা, চোরী, অয্যা, মাতা, ভগিনী, সখী এবং দাসী) স্ত্রীর বিষয়ে এবং বিনয়পিটকে[139] দশ প্রকার চরিত্রের (যথা—ধনক্কিতা, ছন্দবাসিনী, ভোগবাসিনী, পটবাসিনী, ওদপত্তকিনী, ওভতচুম্বটা, দাসী চ ভরিয়া, কম্মকারী চ ভরিয়া, ধজাহট এবং মুহুত্তিকা) স্ত্রীর বিষয়ে উল্লেখ আছে দেখা যায়।

সমাজে স্বামীর নামেই স্ত্রীর পরিচয় হত[140]। পরিবারে গৃহকর্তার স্থান সর্বোচ্চরূপে স্বীকৃত হলেও গৃহিণীই ছিলেন সংসারে সর্বময়ী[141] কর্ত্রী। তবে পতিব্রতা নারী তাঁর স্বামীর পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ হয় বা তাঁর অমনোনীত হয় এমন কোনো কাজ করবেন না, এমন কি এর জন্য তিনি নিজের ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পর্যন্ত অনায়াসে ত্যাগ করেন। এইজন্য ভার্যাকে পরমসখী বলা হয়েছে। পতিব্রতা স্ত্রী স্বামীর ধর্মসঙ্গিনী। স্বামী সংসার ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলে পতিব্রতা স্ত্রী স্বামীর অনুগামিনী হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে ধম্মদিন্না[142]; ভদ্দা-কাপিলানী[143], নকুলমাতা[144] প্রভৃতি পতিব্রতা নারীর নাম উল্লেখযোগ্য।

পতিগতপ্রাণা প্রেমিকা স্ত্রী স্বামীকে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ রাখতে চান। ধম্মপদট্‌ঠকথা গ্রন্থে দেখা যায়, জনৈকা গৃহস্থ বধূ নানা অজুহাতে স্বামীর প্রব্রজ্যা গ্রহণে বাধা দেবার[145] চেষ্টা করেছিলেন। বন্ধনাগার[146] জাতক কাহিনীতে অনুরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। সঙ্গমজীর স্ত্রী[147], গোদিকের

---

138 অঙ্গুত্তর নিকায়, চতুর্থ খণ্ড (পি টি. এস) পৃঃ ৯১—৯৪

তুলনীয় : জাতক, ২য় খণ্ড (ফোসবোল সম্পাদিত) পৃঃ ২০৯, সুজাতা জাতক।

139 বিনয় পিটক, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৩৯

140 সংযুত্ত নিকায়, ১ম খণ্ড (পি টি এস) পৃঃ ৪২

14– প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭

142 পরমত্থদীপনী, পঞ্চম খণ্ড (পি টি এস), পৃঃ ১৫—১৬

143 প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৮

144 অঙ্গুত্তর নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড (পি টি এস), পৃঃ ৬১

145 ধম্মপদট্‌ঠকথা, দ্বিতীয় খণ্ড, পাণ্ডুবগ্গো

146 জাতক, দ্বিতীয় খণ্ড (ফোসবোল সম্পাদিত), পৃঃ ১৩৯—১৪১

147 Psalms of the Brethren, Mrs Rhys Davids, p 39

স্ত্রী[148], পুণ্ণমাসের স্ত্রী[149], বীরের স্ত্রী[150] প্রভৃতি নারীগণ সকলেই নিজ নিজ প্রব্রজিত স্বামীকে গৃহে ফিরিয়ে আনার জন্য বহু চেষ্টা করেও ব্যর্থ মনোরথ হয়েছিলেন। অবশ্য ইন্দ্রিয়[151] জাতকে দেখা যায় জনৈক প্রব্রজিত ব্যক্তিকে তাঁর স্ত্রী গৃহজীবনে ফিরিয়ে আনতে শেষ পর্যন্ত সক্ষম হয়েছিলেন।

স্ত্রীর কর্তব্য ঃ

স্ত্রীর কর্তব্য সম্বন্ধে অঙ্গুত্তর[152] নিকায় গ্রন্থে বুদ্ধদেবের যে উপদেশ লিপিবদ্ধ আছে তাতে দেখা যায় এই কর্তব্য সম্পাদনে স্ত্রীর নিম্নলিখিত চারটি গুণ থাকা প্রয়োজন, যথা ঃ

কর্মক্ষমতা
দাস-দাসী পরিচালন ক্ষমতা
স্বামীর প্রতি প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার এবং স্বামীর ধনরক্ষার ক্ষমতা।

উক্ত চারটি গুণের অধিকারিণী স্ত্রী কর্তব্যপরায়ণা গৃহিণীরূপে সুখ্যাতি লাভ করেন।

দীঘনিকায় গ্রন্থের অন্তর্গত সিঙ্গালোবাদ[153] সুত্তে দেখা যায়, জনৈক গৃহস্থ পুত্রকে উপদেশ দান কালে বুদ্ধদেব বলেছেন, পঞ্চ প্রকারে স্বামী পশ্চিম দিকরূপা ভার্যার সেবা করবেন, যথা: সম্মানের দ্বারা, অবজ্ঞাবর্জনের দ্বারা, অবিচলিত আনুরক্তির দ্বারা, ঐশ্বর্য ও অলঙ্কার প্রদানের দ্বারা। এইভাবে স্বামী কর্তৃক সেবিতা হলে স্ত্রীও স্বামীর প্রতি পাঁচ প্রকারে অনুকম্পা প্রদর্শন করেন, যথা ঃ তিনি গৃহকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন, পরিজনবর্গকে উত্তমরূপে প্রতিপালন করেন, তিনি ব্যভিচারিণী হন না, এমন কি কামার্ত হৃদয়ে আপন পতি ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের কথা চিন্তামাত্রও করেন না[154], স্বামীর ধনসম্পত্তি রক্ষা করেন এবং গৃহস্থালীর সর্বকার্যে দক্ষ ও আলস্যবিহীনা হন। এইরূপ আদর্শ স্ত্রীই 'স্ত্রীরত্ন[155] রূপে চিহ্নিত হন।

---

148 Theragatha, N K Bhagvat, pp 42—43
149 Paramattha Dipani, Vol V, pp 56–57 (P T S)
150 Ibid pp 52—53
151 Jataka, Vol, III, (V Fousboll), p 462
152 অঙ্গুত্তর নিকায়, চতুর্থ খণ্ড (পি টি এস.), পৃঃ ২৭০
153 সিংগালোবাদ সুত্তান্ত, ৩০
154 পরমত্থদীপনী, চতুর্থ খণ্ড (পি. টি এস), পৃঃ ৫৮
155 দীঘনিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড (পি. টি এস.), পৃঃ ১৭৫

তুলনীয় ঃ বিমানবত্থু, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, পৃঃ ২৫—২৬

দাম্পত্য জীবন ঃ

নর-নারীর মিলিত জীবনে অর্থাৎ দাম্পত্যজীবনে নর অপেক্ষা নারীর ভূমিকা গুরুত্বর, কারণ গৃহজীবনে শান্তি বা অশান্তি প্রধান ভাবে নারীর আচরণের ওপর নির্ভরশীল। সেই হিসাবে নারীকে গৃহজীবনের ভিত্তি স্বরূপ বলা যায়। আদর্শ গৃহিনীর সংজ্ঞা পালিসাহিত্যের অন্তর্গত দীঘনিকায়[156] ও বিমান বত্থু[157] এই দুই গ্রন্থে উল্লিখিত আছে।

অঙ্গুত্তর নিকায়[158] গ্রন্থে চার প্রকার দম্পতীর বিষয়ে উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা ঃ—

(ক) স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই চরিত্র অসৎ,

(খ) স্ত্রী সচ্চরিত্রা, ভক্তি ও কর্তব্যপরায়ণা, কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর বিপরীত চরিত্রের ;

(গ) স্বামী সৎ, বিশুদ্ধ চরিত্র, ভক্তি ও কর্তব্য পরায়ণ কিন্তু স্ত্রীর চরিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত।

(ঘ) স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই সৎ, বিশুদ্ধ চরিত্র, ভক্তি ও কর্তব্যপরায়ণ এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা—প্রীতি-ভালবাসার বন্ধনে উভয়ে আবদ্ধ।

শেষোক্ত প্রকার দম্পতীই আদর্শ দম্পতীরূপে চিহ্নিত। দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বলেছেন—ভালবাসাহীন দাম্পত্যজীবন সম্পূর্ণরূপে মূল্যহীন[159]। পালিসাহিত্যে উল্লিখিত আদর্শ দম্পতীর মধ্যে প্রসেনজিৎ-মল্লিকা[160], বিম্বিসার-বৈদেহী[161] এবং নকুলমাতা-নকুলপিতার[162] নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সন্তান ঃ

প্রাচীনকালে ভারতীয় সমাজে পিতা-মাতা পুত্র-সন্তানের জন্মকে সৌভাগ্য-সূচক এবং কন্যাসন্তানের জন্মকে দুর্ভাগ্যসূচক বলে মনে করতেন। ভারতীয় সমাজতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বলেন, নিজ সন্তান সম্বন্ধে এইরূপ বিপরীত

---

156 দীঘ নিকায়, ২য় খণ্ড পৃঃ ৭৫. পি টি এস

157 বিমানবত্থু, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, পৃঃ ২৫—২৬

158 অঙ্গুত্তর নিকায়, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৯, পি টি. এস

159 জাতক বুক, ২য় খণ্ড (ই বি কোওয়েল), পৃঃ ১৪২

160. ধম্মপদট্ঠকথা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৪

161 সুমঙ্গল বিলাসিনী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৩—১৩৮, পি. টি. এস্

162. অঙ্গুত্তর নিকায়, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬১, পি টি. এস.

মনোভাব গড়ে ওঠার মূল কারণ হল, ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের উচ্চারিত একটি বাক্যের অন্তর্গত 'যাহা পুত্রকামনা তাহাই বিত্তকামনা এবং যাহা বিত্তকামনা তাহাই পুত্রকামনা[163], (কারণ উভয়ই দৃষ্টফলের উৎপাদক-পুত্রের দ্বারা ইহলোক জয় ও বিত্তের দ্বারা যজ্ঞাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়); এই শব্দ কয়টি মাত্র গ্রহণ করে এবং তারই ওপর ভিত্তি স্থাপন করে স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ যে সামাজিক অনুশাসন প্রবর্তন করলেন তাতে বলা হল, পুত্রসন্তান পিতাকে 'পুন্নাম' নরকে (পুত্রসন্তান লাভ না করলে যে নরকে মানুষকে পতিত হতে হয়) পতিত হওয়ার আশংকা থেকে মুক্ত করে। পুত্র-সন্তানের দ্বারা মানুষ নিজ বংশধারা অব্যাহত রাখতে পারে। জীবিকা অর্জনের জন্য পিতার কর্মে সাহায্যকারী হয়ে পুত্র পিতাকে উপকৃত করে। পিতা-মাতার বৃদ্ধবয়সে পুত্রের দ্বারাই তাঁদের ভরণপোষণ নির্বাহ হয়[164]। অন্ততঃ পক্ষে একটি পুত্রসন্তানের জন্ম হওয়া একান্তই প্রয়োজন, কারণ দেহান্তের পর পুত্র কর্তৃক অনুষ্ঠিত পারলৌকিক ক্রিয়ার দ্বারা দেহহীন পিতৃ-আত্মার স্বর্গগমনের পথটি বাধাহীন হয়ে ওঠে[165]। অপরপক্ষে কন্যা-সন্তানের দ্বারা পিতা-মাতা ইহলোক বা পরলোকে কোনো ভাবেই উপকৃত হন না। উপরন্তু আত্মজার লালন-পালন, বসন-ভূষণ, শিক্ষা প্রভৃতি ব্যাপারে পিতা-মাতাকে অর্থ-সামর্থ ব্যয় করতে হয়, এবং আরও অর্থব্যয় করে যৌতুকাদি সহ কন্যার বিবাহ দিয়ে তাকে তার পতিগৃহে প্রেরণ করতে হয়। সর্বোপরি কন্যার বিবাহের পর সেই কন্যার উপর পিতা-মাতার আর কোনো অধিকারও থাকে না। সুতরাং কন্যাসন্তানের জন্ম পিতা-মাতার পক্ষে দুঃখজনক [166]; কিন্তু এই যুক্তিনির্ভর সামাজিক অনুশাসনটি সর্বক্ষেত্রে বিশেষ করে সম্ভ্রান্ত বংশের শিক্ষা সংস্কৃতি-সম্পন্ন পিতা-মাতার সন্তান স্নেহকে প্রভাবিত করতে পারে নি. তাঁরা পুত্রকন্যা নির্বিশেষে সকল সন্তানকে সমান স্নেহযত্নে লালন-পালন করতেন[167]।

পালি সাহিত্যের অন্তর্গত অঙ্গুত্তর নিকায়[168] গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, পাঁচটি কারণে মাতা-পিতার নিকট কন্যাসন্তান অপেক্ষা পুত্রসন্তানের জন্ম অধিকতর কাম্য ছিল।

---

163 বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৩। ৫। ১, উপনিষৎ গ্রন্থাবলী, তৃতীয় ভাগ, স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত, পৃঃ ২৩৩—২৩৪

164 Pre-Buddhist India, Ratilal N. Mehta, p 267

165 The wonder that was India, A L Basham, p 160

166 The wonder that was India, A L Basham, p 160

167 Pre-Buddhist India, Ratilal N Mehta, pp 276—277

Cf The wonder that was India, A L Basham, p' 160

168. Anguttara Nikaya, Vol III, p, 43, P T S

এই পাঁচটি কারণ, যথা ঃ

(ক) পুত্র মাতা-পিতাকে ভরণ-পোষণ করে

(খ) পুত্র অর্থকরী কর্ম করে।

(গ) পুত্র পিতার বংশধারা অব্যাহত রাখে ;

(ঘ) পুত্র তার মৃত পূর্বপুরুষকে পিণ্ডদান করে ;

(ঙ) পুত্র পিতার ধনসম্পদের অধিকারী হয়।

উপরোক্ত মতবাদ যে প্রাচীন ভারতের নর-নারীকে প্রভাবিত করেছিল পালি-সাহিত্যে তারও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সুজাতা সেনানী[169] বৃক্ষ দেবতার কাছে এই বলে মানসিক করছেন-তার প্রথম গর্ভজাত সন্তান যদি পুত্র হয় তবে তিনি বৃক্ষদেবতাকে পূজা দেবেন। কট্‌ঠহারী ও উদ্দালক নামক দুটি জাতক কাহিনী এবং অভয়মাতার[170] কাহিনী থেকে কন্যা-সন্তান অপেক্ষা পুত্রসন্তান যে অধিকতর কাম্য ছিল তার আভাষ পাওয়া যায়।

'কোসল রাজমহিষী এক কন্যাসন্তান প্রসব করেছেন' এই সংবাদ শ্রবণে বিমর্ষচিত্ত কোসলরাজ প্রসেনজিৎ উক্ত সংবাদটি যখন বুদ্ধদেবকে নিবেদন করেছিলেন তখন বুদ্ধদেব তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, কন্যাগণের জন্মহেতু দুঃখিত হওয়া উচিত নয় ; নিজগুণে কন্যাসন্তানও সুসন্তান হওয়ার যোগ্যতা রাখে[171]। কোনো এক পরিবারে একটি কন্যা সন্তানের জন্ম হওয়ায় পরিবারস্থ প্রতিটি মানুষ আনন্দিত হয়েছিল, এমন একটি ঘটনার উল্লেখ অবদান শতকম্[172] নামক একটি গ্রন্থে পাওয়া যায়।

এই দুটি দৃষ্টান্ত ছাড়া পালিসাহিত্যে কন্যাসন্তানের জন্মসম্বন্ধে আর কোনো বিশেষ উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় না।

কোনো নারী অন্য কারো সন্তানকে 'দত্তক সন্তান' রূপে গ্রহণ করেছেন বা নিজ সন্তানকে অপরকে 'দত্তক সন্তান' রূপে দান করেছেন এমন কোনো কথার উল্লেখও পালিসাহিত্যে পাওয়া যায় না।

জাতক গ্রন্থের অনেকগুলি কাহিনী থেকে প্রাচীন কালে প্রচলিত সামাজিক রীতি-নীতি, আচার ব্যবহার, প্রথা, সংস্কার প্রভৃতির বিষয়ে অনেক তথ্য জানা যায়[173]।

---

169 Nidanakatha, N K Bhagwat, p 91

170 Paramathadipani, Vol V, p 38, P T S

171 Sanjukta Nikaya, 3 2, 6

Cf Kindered Sayings, Vol 1, Mrs Phys Davids, p 111

172 Avadana Satakam, Vel II p 21

173 জাতক ১ম খণ্ড (বঙ্গানুবাদ), ঈশানচন্দ্র ঘোষ, উপক্রমণিকা পৃঃ ৯। ৎ

সুতরাং এই সূত্র অবলম্বনে বলা যায়, তৎকালীন সমাজে সাধারণতঃ সকল দম্পতীই সন্তান কামনা করতেন। পুত্র বা কন্যা যে কোনো একটি সন্তান লাভের জন্য সন্তানহীন মানুষ বৃক্ষদেবতার নিকট কাতর প্রার্থনা জানাচ্ছেন, মানসিক করছেন, মন্ত্র-তন্ত্র ইত্যাদির শরণ নিচ্ছেন। এই সন্তানপ্রার্থীদলের মধ্যে যেমন রাজাও আছেন, আবার অতি সাধারণ মানুষও আছেন। সংসারী মানুষের গৃহস্থাবাসে সন্তানগণ আনন্দদীপস্বরূপ ছিল। কোনো গৃহে শিশুর জন্ম হলে মিষ্টান্ন (ক্ষীরমূলং) হস্তে প্রতিবেশী মহিলা-পুরুষগণ নবজাত শিশুর মাতা-পিতাকে অভিনন্দন জানাতে আসতেন। জাত-সন্তানের নামকরণের দিন ধার্য করা হত। শিশুরা মাতা-পিতার স্নেহ-যত্নে হেসে-খেলে-আনন্দে (আনন্দো চ পমাদো চ সদা হত্থকীলিতং) বড় হয়ে উঠত।

কৃষিকর্মের জন্য যেতে অনিচ্ছুক বালকের দুরন্তপনায় মাতার বিরক্তি, মাতা-পুত্রের কপটকলহ, মান-অভিমান, আদর-সোহাগ প্রভৃতি মনস্তত্ত্বপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা বা দৃশ্য জাতককারের সুনিপুণ দক্ষতায় জাতকাহিনীগুলিতে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

জাতক কাহিনীগুলি পাঠে এই ধারণা হয় যে, সাধারণতঃ পুত্র-কন্যার সঙ্গে মাতা-পিতার এবং মাতাপিতার সঙ্গে পুত্র-কন্যার সম্পর্ক যথাক্রমে স্নেহ-মমতা-ভালবাসা এবং ভালবাসা-ভক্তি শ্রদ্ধা পূর্ণ ছিল।

পালি সাহিত্য পাঠে জানা যায়, নবজাত শিশুর গাত্রবর্ণ বা দৈহিক কোনো চিহ্নের ওপর ভিত্তি করে শিশুর নামকরণের প্রথাটি বিশেষ প্রচলিত ছিল। মাদ্রীর (মদ্দী) কন্যার গাত্রবর্ণ কৃষ্ণ হওয়ার তার নাম কৃষ্ণজিনা (কণ্হজিনা)[174], শ্রাবস্তী নগরের জনৈক শ্রেষ্ঠীর কন্যার গাত্রবর্ণ নীলোৎপলের আভ্যন্তরীণ বর্ণের সদৃশ হওয়ার তার নাম উৎপলবর্ণা (উপ্‌পলবন্না)[175] রাখা হয়। কৌশাম্বী নগরের ঘোষিত শ্রেষ্ঠীর এক ধাত্রীর কন্যা উত্তরা জন্মকাল থেকেই কুব্জপৃষ্ঠ হওয়ায় তিনি কুব্জউত্তরা (খুজ্জুত্তরা)[176] নামে এবং শ্রাবস্তী নগরের গৃহস্থকন্যা গৌতমী অত্যন্ত কৃশদেহা হওয়ায় তিনি কৃশা গৌতমী (কিসা গোতমী)[177] নামে অভিহিত হন।

পালিসাহিত্যে নারী জননীরূপে ঃ

ভারতীয় সমাজে জননীরূপে নারীর সম্মান চিরদিনই অক্ষুণ্ণ আছে। পালি-সাহিত্যে দেখা যায় মাতা-পিতার প্রতি পুত্রের কর্তব্য সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের উপদেশ-

---

174 জাতক, (ফোসবোল সম্পাদিত), ৬ষ্ঠ খণ্ড, বেস্সন্তর জাতক।

175 পরমত্থদীপনী, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৯০, পি. টি. এস

176 ধম্মপদট্‌ঠকথা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৮১—৮৪

177. পরমত্থদীপনী, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৪—১৭৫

পুত্র পূর্বোক্তরূপ মাতা-পিতাকে পঞ্চপ্রকারে সেবা করবেন[178]। অপর পক্ষে সন্তানের প্রতি মাতাপিতার কর্তব্য সম্বন্ধে যে উপদেশ বুদ্ধদেব দিয়েছেন তা দীঘনিকায়[179] গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, যথা: তাঁরা অর্থাৎ মাতা-পিতা পাপ থেকে সন্তানদের রক্ষা করবেন, কল্যাণকর্মে সন্তানদের প্রণোদিত করবেন, সন্তানদের যথাযোগ্য শিক্ষাদীক্ষা দেবেন, বয়োপ্রাপ্ত সন্তানদের উপযুক্ত বিবাহ দেবেন। পালিসাহিত্যের অন্তর্গত জাতক গ্রন্থের কাহিনীতে বলা হয়েছে—যে সংসারে মাতা-পিতা সসম্মানে অধিষ্ঠিত থাকেন সে সংসার সমৃদ্ধশালী[180] হয়।

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে বন্ধ্যা নারী অপেক্ষা সন্তানবতী নারীকে অধিকতর সম্মানীয়া রূপে গণ্য করা হত। ভদ্দসাল জাতক কাহিনীতে দেখা যায়, বধূ মল্লিকা বন্ধ্যা এই অনুমানে বধূকে পিত্রালয়ে ফেরৎ পাঠান হয়[181]। কিসা গোতমী[182]। যতদিন না সন্তানবতী হয়েছিলেন ততদিন পর্যন্ত স্বামীর সংসারে সম্মানীয়া হন নি। পুত্রবতী জননী অনেক ক্ষেত্রে পুত্রের নামে পরিচিত হতেন, যেমন-অভয়মাতা[183], বড্ডমাতা[184], সুমঙ্গলমাতা[185] ইত্যাদি।

মাতৃস্নেহ-পারাবার অতল, অপার। মৈত্রীভাবনার যে ক্রম বা পর্যায় তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব মাতার অকৃত্রিম অপত্য স্নেহের সঙ্গে তুলনা দিয়ে তা বুঝিয়েছেন[186]।

নারীজীবনের চরম সার্থকতার পূর্ণরূপ মাতৃমূর্তিতে[187] এই কারণেই নারী প্রজাবতী (সন্তানবতী) নামে অভিহিত।

---

178 সিংগালোবাদ সুত্তন্ত, ২৮,

179 দীঘনিকায়, তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ১৮০, পি টি. এস.

180 জাতক বুক, ৪র্থ খন্ড (ই বি কোওয়েল), পৃঃ ২৩

181 জাতক, ৪র্থ খন্ড ফোসবোল সম্পাদিত), পৃঃ ১৪৮

182 'পুত্তলাভেন চ' সুসো সম্মানং অকংসু'—পরমত্থদীপনী, ৫ম খন্ড, পৃঃ ১৭৪ পি. টি এস.

183 Meena Talim—Woman in early Buddhist literature পৃঃ ১৪৬

184. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৬

185 প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৬

186 সুত্তনিপাত, ১ ৮ ৭

187 "ইহাই সর্বদেশে নারীদের ইতিহাস, সকল কালেরও ইহা মহাসত্য।" প্রাচীন ভারতে নারী, শ্রীক্ষিতিমোহন সেন, পৃঃ ৬২

নারীই জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদরূপে পরিগণিত[188], যেহেতু তাঁরই গর্ভে বোধিসত্ত্ব ও পৃথিবীর অন্যান্য সাধকগণ জন্মগ্রহণ করেন।

পালিসাহিত্যে নারী কন্যারূপে ঃ

পুত্র-কন্যা নির্বিশেষে সকল সন্তান মাতা-পিতা কর্তৃক সমান স্নেহযত্নে লালিত-পালিত হলেও পুত্রদের তুলনায় তৎকালীন সমাজে কন্যাদের স্বাধীনতা বেশ কিছুটা খর্ব ছিল, কারণ পালিসাহিত্য পাঠে জানা যায়, কন্যাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের জন্য বা তাদের সুরক্ষার জন্য কোনো না কোনো অভিভাবকের হস্তে কন্যাদের দায়িত্বভার অর্পণ করা হত। এই প্রসঙ্গে বিনয়পিটকে[189] কন্যাদের জন্য দশ প্রকার অভিভাবক বা রক্ষাকারীর কথা লিপিবদ্ধ আছে, যথা ঃ মাতা, পিতা, উভয় মাতাপিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্বজন, জ্ঞাতি, কুল, ধর্ম ও দণ্ডনীতি (সপরিদণ্ড), এবং মজ্‌ঝিমনিকায়[190] গ্রন্থে পাঁচ প্রকার অভিভাবকের ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে, যথা ঃ মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী বা কোনো আত্মীয়। এই ব্যবস্থার মনে হয় তৎকালীন সমাজব্যবস্থাপকগণ কন্যাদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে বিশেষ চিন্তাশীল ছিলেন। যদিও তাঁরা কোনো না কোনো অভিভাবকের অধীনে থেকে কন্যাদের শিক্ষা-দীক্ষা-লাভ এবং তাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা দিয়েছেন তথাপি একথা উল্লেখযোগ্য যে, অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে দুটি বিষয়ে, যথা ঃ (ক) ধর্মাচরণে ও (খ) জীবনসঙ্গী নির্বাচনে কন্যাদের সম্পূর্ণ স্বাধীন মতে ও পথে চলার অধিকার স্বীকার করেছেন। কারণ ধর্মাচরণ ক্ষেত্রে কন্যারা যে স্বাধীন মতে চলতেন তার বহু দৃষ্টান্ত পালিসাহিত্যের অন্তর্গত ধম্মপদট্‌ঠকথা, পরমত্থদীপনী, থেরীঅপদান থেরীগাথা প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে, , সুমেধা[191], সুমনা[192], সোমা[193] শুভ্রা[194] প্রভৃতি ধর্মানুরাগিণী কন্যাদের নাম উল্লেখ করা যায়।

কন্যাদের স্বাধীনভাবে জীবনসঙ্গী নির্বাচনের দৃষ্টান্তও পালিসাহিত্যে বিরল নয়। জনৈক লঙ্ঘন নর্তকের (অর্থাৎ বাজীকরের) দুহিতা উগ্‌গসেন নামক এক

---

188 Kindred Sayings, Vol 1, C A. F Rhys Davids, p 61

189 বিনয়পিটকম্ (ওল্ডেনবার্গ), তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৩৯

190 মজ্‌ঝিমনিকায়, প্রথম খণ্ড, পি টি এস

191 পরমত্থদীপনী, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ২৭২—২৭৩, পি টি এস

192 ধম্মপদট্‌ঠকথা, ১৩ ১—৫

193 পরমত্থদীপনী, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৬৬, পি টি. এস

194. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৫—২৬০

যুবককে বিবাহ করেন[195], জনৈক শ্রেষ্ঠীর সুন্দরী ও শিক্ষিতা কন্যা অমরা[196] মহৌষধ কুমার নামক এক যুবককে এবং ভদ্দাকুণ্ডলকেসা[197] আপন মনোনীত প্রণয়ী সত্তুক নামে এক যুবককে বিবাহ করেন। অবশ্য উক্ত বিবাহগুলি সবই মাতা-পিতা বা অভিভাবকের সম্মতি প্রাপ্ত ও সমাজস্বীকৃত ছিল।

পালিসাহিত্য পাঠে জানা যায়, প্রাগুক্ত ধর্মাচরণের ও জীবনসঙ্গী নির্বাচনের স্বাধীনতা ছাড়াও সেই যুগের কন্যারা স্বগৃহে ও সমাজে আরও কয়েকটি বিষয়ে কিছু কিছু স্বাধীনতা উপভোগ করতেন[198]। যেমন, তাঁরা সখীদের সঙ্গে প্রমোদ উদ্যানে যেতেন অথবা কোনো উপবনে গিয়ে পান-ভোজন করে আনন্দে সারাদিন কাটিয়ে আসতে পারতেন। বুদ্ধদেবকে দর্শন ও তাঁর বাণী শ্রবণের জন্য যেতে তাদের কোনো বাধা ছিল না। গৃহকর্ম ছাড়াও তাঁরা ভিক্ষু ও শ্রমণের সেবায় নিযুক্ত থাকতে পারতেন। এইভাবে মাতা-পিতার স্নেহযত্নে লালিত-পালিত শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্পন্না কন্যাগণ ভদ্রসমাজের উপযুক্ত হয়ে উঠতেন। যৌবনপ্রাপ্ত হলে কন্যার বিবাহ দেওয়া মাতা-পিতার কর্তব্যের অন্তর্গত ছিল[199]। পতিগৃহে প্রেরণের পূর্বে কন্যাকে শিক্ষা দেওয়া হত[200]। বধূজীবনের আদর্শ সম্বন্ধে ও কর্তব্য সম্বন্ধে বিবাহিতা কন্যাকে উপদেশ দেওয়া হত[201]।

পালিসাহিত্যে উল্লিখিত নারীদের বসন-ভূষণ অঙ্গরাগ ইত্যাদি ঃ

বসন-ভূষণপ্রিয়তা নারীগণের সহজাত সংস্কার বলা যায়। পালিসাহিত্যে উল্লিখিত নারীগণও এই সংস্কারের বহির্ভূত ছিলেন না। নারীরা সাধারণতঃ দুই প্রস্ত (অন্তর্বাস ও বহির্বাস) বস্ত্র ব্যবহার করতেন। সুন্দর সূচীকর্মযুক্ত, ঝালর দেওয়া সূক্ষ্ম বস্ত্র ও মহার্ঘ রেশমী বস্ত্র ধনীগৃহের মহিলারা ব্যবহার করতেন। পালি সাহিত্যে, কাসিক[202], বারাণসী[203], সবনা[204], নিবাসনা[205] প্রভৃতি বস্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়।

---

195 ধম্মপদট্ঠকথা, Uggasena-vatthu, P T S Vol IV, pp 59—65

196 জাতক বুক, ষষ্ঠ খণ্ড, মহাউম্মগ্গ জাতক

197 DPPN, II pp 355—356

198 Pre-Buddhist India, Ratilal N. Mehta, pp. 291—293

199 Digha Nikaya, Vol III, p 180, P T S

200 Anguttara Nikaya, Vol III, p p 36—38, P T S.

Cf D hammapadat thaka tha, Vol 1, pp 400—404

201 Anguttara Nikaya, Vol, IV, pp 265—266, P T S.

202 থেরী অপদান, পৃঃ ৫৮৮

203, প্রাগুক্ত,

204 পরমত্থদীপনী, ৪র্থ খণ্ড, মহারথ বিমান, পি টি এস ; 205 প্রাগুক্ত

বুদ্ধদেব ছয় প্রকার (পরিভাষ্ট) বস্ত্র[206] (যথা-খোম-খসিনা বা তিসি-শস্য-গাছের তন্তু, কপ্পাসিকো=কার্পাস বা সূতী, কোসেয্য=রেশমী, কম্বলো-পশমী, সান=শন, এবং ভংগ=পাট) সংগ্রহের দ্বারা স্বয়ং প্রস্তুত চাঁদর ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিলেন। এই সূত্রে অনুমান করা যায়, তৎকালে উক্ত ছয় প্রকার বস্ত্র মহিলারাও ব্যবহার করতেন।

বিনয়পিটকে[207] মস্তক, কণ্ঠ, কর্ণ, হস্ত ও পদে ব্যবহৃত নানাবিধ অলংকারের উল্লেখ দেখা যায়। রমণীগণ কেয়ূর[208] বা কম্বুকেয়ূর[209], মেখলা[210], নানাবিধ কণ্ঠহার, কুন্ডল, অঙ্গুরী, কঙ্কন ইত্যাদি বিবিধ প্রকার অলংকার এবং মুক্তামালা, ও মণি-মুক্তা-হীরা-পান্না প্রভৃতি মূল্যবান রত্নখচিত অলংকার ব্যবহার করতেন। সাজ-সজ্জা কালে তাঁরা ব্যবহার করতেন হস্তীদন্তের উপর কারুকার্যকরা সুদৃশ্য হাতল যুক্ত দর্পণ। এক ধরণের পাদুকাও তাঁরা ব্যবহার করতেন[211]।

রমণী গণ মস্তকে স্বর্ণালংকার ও মুক্তার মালা ছাড়াও চম্পক, মল্লিকা, যূথিকা প্রভৃতি পুষ্পের মালা ধারণ করতেন[212]। সুমঙ্গলবিলাসিনী[213] গ্রন্থে সৌন্দর্যবর্ধক নানাবিধ অঙ্গরাগের উল্লেখ দেখা যায়, যথা: চন্দন, হরিদ্রা, নানা প্রকার বৃক্ষপত্রের পিষ্টপ্রলেপ ইত্যাদি। অম্বপালী[214] নিজ দেহকে শ্রী ও সুষমামণ্ডিত করার জন্য হিংগুল[215] চূর্ণ ব্যবহার করতেন।

বিভিন্ন পুষ্পের সৌরভযুক্ত সুগন্ধি দ্রব্যও তাঁরা ব্যবহার করতেন[216]। অবশ্য উক্ত বসন-ভূষণ, অঙ্গরাগ, সুগন্ধি দ্রব্য ইত্যাদি ধনীগৃহের মার্জিত রুচিসম্পন্না মহিলারাই ব্যবহার করতে সমর্থা হতেন[217]।

---

205 বিনয় পিটক, (মহাবগ্গ)

207. বিনয় পিটক, ৪র্থ খণ্ড, (মহাবগ্গ), পৃঃ ৩৪০

208. সুমঙ্গলবিলাসিনী, ১ম খণ্ড পৃঃ ৮২, পি টি এস.

209. পরমত্থদীপনী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২১০, পি টি. এস.

210. প্রাগুক্ত. পৃঃ ২১২

211. Pre-Buddhist India, Ratilal N Mehta, p 293

212. জাতক, তৃতীয় খণ্ড (ঈশানচন্দ্র সম্পাদিত), পৃঃ ৩৭৪

213. সুমঙ্গলবিলাসিনী প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৮৮, পি. টি. এস.

214. পরমত্থদীপনী. প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২১২, পি. টি. এস.

215. হিংগুল — রক্তবর্ণ দ্রব্য। হিংগুল তিন প্রকার, যথা: (ক) চূর্ণ হিংগুল (রক্তবর্ণ), (খ) শুকতুণ্ড হিংগুল (গৌরবর্ণ) (গ) হংসপাদ হিংগুল (জবা পুষ্পের মত লোহিত বর্ণ)।

216. পরমত্থদীপনী, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২০৪, পি. টি. এস.

217. Pre-Buddhist India, Ratilal N. Mehta, p 293

পালিসাহিত্যে নারী আরও কয়েকটি বিভিন্নরূপে

নর্তকীরূপে ঃ

সাধারণতঃ রাজাদের আমোদ-প্রমোদের জন্য নৃত্য-গীত-বাদ্য-কুশলা নর্তকী নামে অভিহিতা এক শ্রেণীর রমণী নিযুক্ত হত। পুরুষদের বিলাস-ব্যসন চরিতার্থ করাই ছিল এই শ্রেণীর নারীদের প্রধান কর্ম। শাক্যরাজ শুদ্ধোদন ও তাঁর পুত্র সিদ্ধার্থের মনোরঞ্জনের জন্য একদল নর্তকী নিযুক্ত করেছিলেন[218]।

বারবণিতারূপে ঃ

যদিও বারবণিতা নামে অভিহিতা রমণীগণ গণিকা বৃত্তির দ্বারা নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করতেন তথাপি বৌদ্ধযুগের সমাজে এঁরা অনাদৃতা বা অবহেলিতা ছিলেন না। পালিসাহিত্যে গণিকা অভয়মাতা[219] 'নগরশোভিনী' বিশেষণমণ্ডিতা হয়ে উল্লিখিত হয়েছেন দেখা যায়। স্বয়ং বুদ্ধদেব গণিকা আম্রপালীর গৃহে আহারের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন[220]। উত্তরা উপাসিকা অনন্যমনা হয়ে উপোসথ-ব্রত পালন করার উদ্দেশে সিরিমা নাম্নী এক বারাঙ্গনাকে কয়েকদিনের শর্তে নিজ স্বামীর সেবা-পরিচর্যার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন[221]। সামাজিক ব্যবস্থায় গৃহ-বধূরূপে সম্মান লাভ না করলেও এই শ্রেণীর নারীর গর্ভজাত সন্তান সমাজ কর্তৃক সামাজিক মর্যাদায় গৃহীত হত[222]। তৎকালীন সমাজগত এই তথ্য গণিকা সালবতীর পুত্র জীবকের[223] কাহিনী থেকে জানা যায়।

রূপাজীবা (রূপোজীবনী) ঃ

মিলিন্দ প্রশ্ন গ্রন্থে[224] নারীদের জীবিকা নির্বাহের উপায় স্বরূপ কতকগুলি ব্যবসার নাম উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে পতিতাবৃত্তি ছিল একটি উপায়। তৎকালীন সমাজ পতিতাবৃত্তিকে ঘৃণার বা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখত না। এই প্রসঙ্গে I B Horner বলেছেন, এটি ছিল কর্মের ধারণা সম্পর্কে আংশিক বিশ্বাস[225]।

---

218 জাতক নিদান, ধর্মপাল ভিক্ষু, পৃঃ ৮০, ৮৫

219 পরমত্থদীপনী, পঞ্চম খণ্ড, পি টি এস, পৃঃ ৩১

220 মহাপরিনিব্বান সুত্ত, সুকুমার দত্তের অনুবাদ, পৃঃ ৩০

221 ধম্মপদট্ঠকথা, ৪র্থ খণ্ড, কোম বগ্গো, পি টি এস

222 বৌদ্ধরমণী, ডঃ শ্রীবিমলাচরণ লাহা, পৃঃ ৩৫

223 মহাবগ্গো, ৮ ১—৪, নালন্দা সংস্করণ

224 R D Vedakar, "Milindapanha," p 324

225 I B Horner "Women under primitive Buddhism" p 94।

পালিসাহিত্যের মিলিন্দ প্রশ্ন (মিলিন্দপঞ্‌হো) গ্রন্থে নারীদের জীবিকানির্বাহের উপায় স্বরূপ কতকগুলি ব্যবসার নাম উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে 'পতিতাবৃত্তি' (বেশ্যাবৃত্তি) ছিল একটি উপায়। এই প্রসঙ্গে I. B. Horner বলেছেন—

পতিতাবৃত্তি ছিল কর্ম সম্বন্ধে ধারণার অঙ্গীভূত, তাই এই বৃত্তি প্রকাশ্যভাবে সমাজ স্বীকৃত ছিল এবং এই বৃত্তি গ্রহণ বর্তমান কালের মত ঘৃণার্হ বা নিন্দার্হ ছিলই না বরং সহৃদয়তার দৃষ্টিতে দেখত সে যুগের মানবসমাজ। কিন্তু বহুকাল যাবৎ নারীরা জন্মগত সূত্রে এই বৃত্তি গ্রহণ করত না, জীবিকানির্বাহের উপায় স্বরূপ তারা এটি গ্রহণ করত। উদাহরণস্বরূপ অড্‌ঢকাসী[226] (অর্ধকাশীর) নাম উল্লেখ করা যায়, যে জন্মেছিল এক বণিক পরিবারে, কিন্তু জীবননির্বাহের উপায় স্বরূপ পতিতা বৃত্তিকে গ্রহণ করেছিল।

সমাজে পতিতাদের স্থান ঃ

এই শ্রেণীর রমণীরা সমাজে সম্মানীয়া ছিলেন। তাঁরা একাকী জীবন যাপন করতেন না। সামাজিক উৎসব ও ভোজে তাঁরাও অংশ গ্রহণ করতেন। সাধারণ জনসমাজে মেলামেশা করার পক্ষে তাঁদের কোনও বাধা ছিল না। নিজেদের সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে তাঁরা সমাজে বাস করতেন। 'জনপদ কল্যানী' অথবা 'নগরশোভিনী' নামে উপাধি লাভ করার পক্ষে তাঁদের কোন বাধা ছিল না। উদাহরণ স্বরূপ অভয়মাতার নাম উল্লেখ করা যায়, যিনি 'নগরশোভিনী'[227] উপাধি লাভ করেছিলেন। বৌদ্ধধর্মসভায় ধর্মালোচনা শোনার পক্ষে তাঁদের কোন বাধা ছিল না। বৌদ্ধ সঙ্ঘে প্রবেশের দ্বার তাঁদের জন্যও উন্মুক্ত ছিল। জনসাধারণের কাছ থেকে তাঁরা সর্বদা শ্রদ্ধা ব্যবহার পেতেন। একদা আম্রপালী সসঙ্ঘ বুদ্ধদেবকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন[228], কিন্তু সেই দিনই লিচ্ছবীরাও বুদ্ধদেবকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, কিন্তু আম্রপালীর নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করে লিচ্ছবীদের নিমন্ত্রণ বুদ্ধদেব গ্রহণ করেননি। এই একটি উদাহরণেই স্পষ্টতই বোঝা যায় তৎকালীন সমাজে বারবণিতাগণ এখনকার সমাজের মত অনাদৃতা ছিলেন না। অবিবাহিত যুবকগণ যখন কোন বনভোজন করবার উদ্দেশে কোন স্থানে যেতেন, তখন বারাঙ্গনাদেরও সঙ্গে নিতেন। কিন্তু সব সময় বারাঙ্গনারা নিজেদের সততা যে বজায় রাখতে পারতেন না তার একটা উদাহরণ উল্লেখ করা যায়। এক সময় একদল যুবক একজন বারবণিতাকে সঙ্গে নিয়ে আনন্দ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে কোনও

226. Par, Dip Vol V, pp 31—33, P T S
227. Pna. Dip p 39
228 Digha, Nik. Vol II pp 102—103, P T. S

এক অরণ্যে গেছিল, কিন্তু ঐ বারাঙ্গনা সততা রক্ষা করতে পারেনি, সে আমোদ-প্রমোদের পর যুবকবৃন্দের জিনিস পত্র অপহরণ করে পলায়ন করে। যুবকদল ঐ নারীটিকে ধরবার জন্য যখন চেষ্টা করছিল তখন তারা দেখে, এক বৃক্ষ তলে স্বয়ং বুদ্ধদেব বসে আছেন। তিনি যুবকদলটিকে মৃদু ভৎর্সনা সহ সতর্ক করে দেন।

উত্তরা নামে এক বণিকের স্ত্রী, ধর্মকর্ম করার জন্য অত্যন্ত ইচ্ছুক হয়ে তাঁর স্বামী ও সংসার দেখাশোনার ভার কয়েক দিনের জন্য সিরিমা নামে এক বারবণিতার হাতে সমর্পণ করেছিলেন[229]। এইভাবে বোঝা যায় বারবণিতারা সমাজের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গস্বরূপা ছিলেন, যার ফলে পুরনারীরা তাঁদের সঙ্গে অসঙ্কোচে মেলামেশা করতেন, সম্মান প্রদর্শন করতেন।

সমাজের বিধি ও শৃংখলা রক্ষার্থে বারবণিতারা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করতেন। বুদ্ধদেবের সময়ে সমাজের বহু যুবক সংসারধর্ম ত্যাগ করে সন্ন্যাস জীবন লাভের জন্য উৎসুক হতেন যার ফলে বহুবিধ সামাজিক সমস্যা দেখা দিত। সমাজের এই পারিপার্শ্বিক হাঙ্গামা থেকে নিজ পুত্রগণদের রক্ষার্থে সমাজ-কর্তাগণ বারবণিতাদের সাহায্য গ্রহণ করার মনস্থ করলেন। ধম্মপদ অট্ঠকথায় বর্ণিত এক যুবকের কাহিনী থেকে জানা যায়, যুবকটি যখন এক গভীর বনে অধ্যাত্মসাধনায় মগ্ন ছিলেন তখন এক বারবণিতা তাঁকে প্রলোভিত করার চেষ্টা করে[230]। সুন্দরসমুদ্দর মাতা[231] এক বারবণিতাকে নিয়োগ করেছিলেন তাঁর পুত্রকে সন্ন্যাসজীবন থেকে সংসারজীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য, কিন্তু ঐ নিয়োজিত বারবণিতাটি তার উদ্দেশ সাধনে বিফল হয়েছিল। পালি সাহিত্যের অন্তর্গত অধিকাংশ কাহিনীতে বিবৃত হয়েছে তদানীন্তন কালের প্রব্রজিত বৌদ্ধ ভিক্ষুগণকে সন্ন্যাসজীবন থেকে পুনরায় গৃহজীবনে ফিরিয়ে আনার পক্ষে বারবণিতাদের অনর্থ পরাজয় ঘটেছে, কিংবা হয়ত ইচ্ছাকৃত ভাবেই কেবলমাত্র উক্ত ক্ষেত্রে বারবণিতাদের পরাজয়ের কাহিনীই লেখকগণ প্রকাশ করেছেন মাত্র; কোন কোন ক্ষেত্রে যে তারা কৃতকার্যও হয়েছিল সে কথা তাঁহারা সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে গেছেন। বিনয়পিটকে দেখা যায়, বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের ধর্মপথ থেকে বিচ্যুত করার প্রচেষ্টা লিপিবদ্ধ আছে। পরিশেষে একথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়, বারবণিতারা সমাজ জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় হলেও, ভালো অথবা মন্দ যে ধরনের কাজই করুক, তারা যে তপস্যার পথে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে বিঘ্ন স্বরূপ ছিল একথা স্বীকৃত সত্য।

---

229 Dham, Alth, Part IV, Kodha Vagga P T S

230 E W Burlingame, "Buddhist Legends" Part II, Arhant Vagga, 10.

231 E W Burlingame, Buddhsit Legends Part III, p 308

বিবাহিত জীবন লাভের পক্ষে বারবণিতাদের কোন বাধার সম্মুখীন হতে হত না একথা মনে করা যেতে পারে। কারণ বিনয়পিটকে উল্লিখিত আছে যে এক ব্যক্তি জনৈকা বারনারীর কন্যার পানিপ্রার্থনা করেছিলেন[232] নগ্ন সন্ন্যাসী দলের কয়েকজন শিষ্য জনৈকা রূপজীবাকে অনুরোধ করে বলেছিল, তিনি (ঐ রূপজীবা) যেন তাঁর কন্যার বিবাহ দেন। সুন্দর সমুদ্দেবী মাতা (পূর্বে যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে), তিনি তার পুত্রকে সন্ন্যাসজীবন থেকে ফিরিয়ে আনার ভার যে বারবণিতার হাতে ন্যস্ত করেছিলেন, তাকে তিনি কথা দিয়েছিলেন যে, যদি সে তাঁর উদ্দেশ্য সফল করতে পারে তবে তিনি তাঁর গৃহের কর্তৃত্ব ভার ঐ বারবণিতাকে অর্পণ করবেন।

সম্পদ ও বিলাসিতা :

বারবণিতাদের মধ্যে অনেকেই অত্যন্ত ধনশালিনী ছিলেন এবং বিলাসবহুল জীবনযাপন করতেন। সীমা[233] নাম্নী এক বারবণিতার পাঁচশত ক্রীতদাসী ছিল। তার প্রতিরাত্রির মূল্য ধার্য ছিল একহাজার মুদ্রা। সুলসা[234] নাম্নী আর এক বারবণিতার অনুচরীবর্গের সংখ্যা ছিল পাঁচশত এবং তারও প্রতি রাত্রির জন্য মূল্য ধার্য ছিল এক হাজার মুদ্রা। অট্ঠান জাতক[235] কাহিনীতেও ধনী ও উচ্চমূল্যের এক বারবণিতার কাহিনী বলা হয়েছে। মথুরা নগরবাসিনী বারাঙ্গণা বাসবদত্তারও[236] প্রতিরাত্রির মূল্য ছিল পাঁচশত পুরাণ।

কিন্তু বারবণিতাদের জীবনে নিরাপত্তা ছিল না। বারাঙ্গণা অড্ঢকাসী যখন তাঁর বিলাসবহুল জীবন পরিত্যাগ করে ভিক্ষুণী জীবন গ্রহণ করলেন তখনও তাঁকে দুশ্চরিত্র লম্পট পুরুষদের উপদ্রব সহ্য করতে হয়েছে। এমন কি অড্ঢকাসী উপসম্পদা উৎসব উপলক্ষ্যে বুদ্ধদেবকে দর্শনাভিলাষিনী হয়ে পথে যাচ্ছিলেন তখন কয়েকজন দুশ্চরিত্র মানুষ তাঁকে নিপীড়িত করেছিল[237]। এই ভাবে দেখা যায়, বিশেষ করে যাঁরা পতিতা বৃত্তিতে লিপ্ত থাকতেন, তাঁদের জীবনে নিরাপত্তার বিশেষ অভাব ছিল। ধম্মপদ অট্ঠকথায় বর্ণিত এক কাহিনী থেকে জানা যায়— চারজন যুবক নিজেদের মধ্যে ষড়যন্ত্র করে ঠিক করেছিল, জনৈকা বারবণিতাকে উপভোগের পর তাঁকে হত্যা করে তার সমস্ত সম্পদ লুণ্ঠন করে নেবে[238]। এই

---

232 [H. Oldenbarg, "Vinaya Pitakam Vol III, pp. 135—138]
233 E. B. Cowell, Jataka Book, III, p. 39
234. V. Fausboll, "Jataka," Vol III, p 435
235. V. Fausball, "Jataka", Vol III, p 475
236 E B Cowell, "Divyavadana," p 554
237. N. K. Bhagwat, "Therigatha," p 53
238 E. W Burlingame, "Buddhist Legends." II, Bala Vaga 7

ধরনের আর একটি উদাহরণ উদান গ্রন্থে[239] পাওয়া যায়—রাজগৃহের কোন এক গণিকার প্রণয়াসক্ত দুটি দল (পূগ) পরস্পরের মধ্যে বিবাদ করে, এবং গুরুতর ভাবে আঘাতের ফলে উভয় দলই আহত হয়। উদাহরণ স্বরূপ আর একটি ঘটনা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য মথুরানগরের খ্যাতনাম্নী বারবণিতা বাসবদত্তাকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়ে তার নাসা-কর্ণ, হস্ত পদ ছেদন করে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, মৃত্যুর পর তার ঐ বীভৎস শরীর শ্মশানে নিক্ষেপ করা হয়েছিল[240]। উপরোক্ত ঘটনাগুলি থেকে মনে হয়, বারবণিতারা কোন কারণে তাদের জীবিকার ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে সুন্দর ও স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য অভিলাষিণী হয়ে উঠেছিল। এক্ষেত্রে সুলসা[241] নামের এক বারবণিতার কথা উল্লেখযোগ্য। ঘটনাচক্রে সুলসা যখন এক দস্যুর প্রেমে পড়েছিল তখন সে মনে মনে চিন্তা করেছিল যে, যদি সে ঐ বলবান যুবককে মুক্ত করতে পারে, তবে সে তার পতিতাবৃত্তি পরিত্যাগ করে ঐ দস্যুর সঙ্গে মিলিত হয়ে সম্মানের সঙ্গে জীবনযাপন করতে পারবে।

পালিসাহিত্যে বারবণিতাদের নৈতিক বোধ কেমন ছিল সে বিষয়েও উল্লেখ করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে তাঁরা নীতিগত প্রথা মেনে চলতেন। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ্য— জনৈক বণিক প্রায়ই এমন একজন গণিকার সঙ্গে মিলিত হতেন, যাঁর দর্শনী মূল্য ছিল একহাজার স্বর্ণমুদ্রা। একদিন ঐ বণিক বিনা দর্শনীমূল্যে ঐ গণিকার সঙ্গে দেখা করতে যান, কিন্তু গণিকাটি ঐ বণিককে এমতাবস্থায় প্রত্যাখ্যান করে বলে যে, সে একজন বারবণিতা, বিনামূল্যে সে কাউকে তার সঙ্গ দান করে না, অতএব দর্শনীমূল্যসহ তার দর্শনাভিলাষীকে আসতে হবে[242] এই ভাবে তাঁদের বৃত্তিগত প্রথা মেনে চলতেন।

বারবণিতাদের নৈতিক বোধের আর একটি উদাহরণ উল্লেখ করা যায়। মিলিন্দ পঞ্‌হ গ্রন্থে[243] শ্রদ্ধেয় নাগসেন বিন্দুমতীর কাহিনীর প্রসঙ্গে সত্য-নিষ্ঠ বিন্দুমতীর আত্মশক্তির কথা উল্লেখ করেছেন। একদা সম্রাট অশোককে বিন্দুমতী বলেন যে, তাঁর এমন শক্তি আছে যার বলে তিনি স্রোতস্বিনীর জলধারা বিপরীত মুখে প্রবাহিত করতে পারেন। বিন্দুমতীর এই স্পর্ধোক্তিতে সম্রাট অশোক রীতিমত বিস্মিত হয়ে বলেন, ভ্রষ্টচরিত্রা, ধর্মভ্রষ্টা নারী হয়ে বিন্দুমতী কেমন করে এমন শক্তি লাভ করতে পারে যার বলে সে এমন অসাধ্য

239 Udanam," p 71, P T S

240 R Nittra, "Nepalese Buddhist Text" Upagupta Avadana LXXII, p 67

241 E B Cowell, 'Jataka Book,' Vol II p 261

242 E B Cowell, 'Jataka Book' Vol III p 282

243 T W Rhys Davids, 'Question of king Milinda' pp 182—184,
সুকুমার সেনগুপ্ত—উপক্রমণিকা (ধর্মধার মহাস্থবিরের মিলিন্দপ্রশ্ন) পৃঃ ১০—১২

কর্ম করতে পারে? সম্রাট অশোকের এই কথার উত্তরে বিন্দুমতী বলেন, বিন্দুমতীর সম্বন্ধে সম্রাটের উক্তি সবই সত্য। কিন্তু তিনি সত্যনিষ্ঠ, এবং এই সত্যনিষ্ঠার ফলশ্রুতি হিসাবে তিনি এমন এক শক্তি লাভ করেছেন যার বলে তিনি পৃথিবীকে উলটে দিতে পারেন। বিন্দুমতীর এই কথা শেষ হলে দেখা গেল, কোন এক মহাশক্তি বলে স্রোতস্বিনী দিক পরিবর্তন করে বিপরীত মুখে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। বিন্দুমতী পরে এই ঘটনার আরও ব্যাখ্যা করে বলেন - যে কেউ সে রাজা অথবা কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বা কোন দাসও যদি বিন্দুমতীর ন্যায্য প্রাপ্য স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করে, তবে সে ক্ষেত্রে বিন্দুমতীর ব্যক্তিগত পছন্দ বা অপছন্দের প্রশ্ন ওঠে না, তখন বিন্দুমতী সেই মূল্যদাতাকে বিন্দুমতীর কাছে তার প্রাপ্য পরিচর্যা করে থাকেন। বিন্দুমতী তাঁর কঠোর সত্যনিষ্ঠার বলে ঐ রকম দৃঢ় আত্মশক্তি লাভ করেছিলেন।

সত্যনিষ্ঠার উপরোক্ত মূলতত্ত্ব অনুসরণ করে চলতেন সেই সময়ের অনেক বারবণিতা।

দাসী বা ক্রীতদাসীরূপে:

রাজপরিবার থেকে আরম্ভ করে সাধারণ গৃহস্থ পরিবারে পরিবারভুক্ত দাসী বা ক্রীতদাসীরূপে যে শ্রেণীর নারীগণ তৎকালীন সমাজে বাস করতেন, তাঁদের ওপর তাঁদের প্রভু ও প্রভুপত্নীর পূর্ণ অধিকার থাকত। এই শ্রেণীর নারীরা যে সংসারভুক্তা হতেন, সেই সংসারের ধানভাঙ্গা, চালপেরা, জল আনা, হাটবাজার করা ইত্যাদি কর্ম করতেন[244]। পালিসাহিত্য পাঠে জানা যায়, এই শ্রেণীর নারীরা তাঁদের প্রভু বা প্রভুপত্নীর নিকট সর্বদা সদয় ব্যবহার পেতেন না; তবে একথাও জানা যায় যে, এমন দয়ালু প্রভু বা প্রভুপত্নীও ছিলেন যাঁরা ক্রীতদাসীর কোনো সৎকর্মের জন্য সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে ক্রীতদাসীত্ব থেকে চিরমুক্তি দান করেছেন[245]।

স্বাধীন জীবিকা অর্জনকারিণীরূপে:

বৌদ্ধযুগে সাধারণ শ্রেণীর নারীদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের জীবিকা নিজেরাই অর্জন করে নিতেন। সুমঙ্গলবিলাসিনী[246] গ্রন্থে রাজার দেহরক্ষীরূপে

---

244 বৌদ্ধরমণী, ডঃ শ্রীবিমলাচরণ লাহা, পৃঃ ২৬

245 পরমত্থদীপনী, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১৯৯—২০০, পি টি. এস
এবং ধম্মপদট্ঠকথা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৮৯ – ৮৪

246 সুমঙ্গলবিলাসিনী, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৪৭ – ১৪৮, পি. টি. এস.

হস্তীপৃষ্ঠারূঢ়া নারীর উল্লেখ দেখা যায়। কালী[247] নাম্নী এক নারী শ্মশানে শবদাহিকা (ছবদাহিকা) রূপে ধর্ম করতেন। কোনো কোনো নারী ব্যবসা[248] করতেন। কেউ বা ফেরীওয়ালীরূপে[249] জীবিকা অর্জন করতেন। ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষ পাঠে জানা যায়, ভিক্ষুনীদের পক্ষে ধানভাণা, সূতাকাটা, বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি কর্ম নিষিদ্ধ ছিল, সুতরাং এই সূত্রে অনুমাণ করা যায়, ভিক্ষুণী সংঘ বহির্ভূতা সাধারণ শ্রেণীর নারীগণ উক্ত কর্মগুলির দ্বারা নিজের নিজের জীবিকা নির্বাহ করতেন। কোনো কোনো নারী সেবিকা বা ধাত্রীরূপে[250] রাজান্তপুরে বা ধনীগৃহে নিযুক্ত হতেন।

দাসীত্বমুক্ত নারী, নর্তকী, বারবণিতা প্রভৃতি রমণীগণের পক্ষে বুদ্ধদেব দর্শনে ও ধর্মদেশনা শ্রবণে কোনো বাধা ছিল না এবং ধর্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হবে ভিক্ষুণী ব্রত গ্রহণ করে তাঁরাও ভিক্ষুণী সংঘভুক্তা হতে পারতেন, কারণ উদার বৌদ্ধধর্ম সমাজের সর্বশ্রেণীর মানবীকে আন্তরিক আহ্বান জানিয়েছিল।

নারী ধাত্রীরূপে ঃ

নারীদের জীবিকার মধ্যে সর্বপেক্ষা জনপ্রিয় ছিল ধাত্রীত্ব। পালিসাহিত্যে এই শ্রেণীর নারীকে বলা হত ধাতি (ধাত্রী)। দিব্যাবদানে এই শ্রেণীর নারীদের কর্তব্য সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 'অঙ্কধাত্রী'র কর্তব্য ছিল ভারপ্রাপ্ত শিশুটিকে তার উরুদ্বয়ের ওপর বসিয়ে তা শিশুটির পাদুটিকে দুপাশে ঝুলিয়ে শিশুর অঙ্গের প্রতি লক্ষ্য রেখে সেগুলির পরিচর্যা করা অর্থাৎ সেগুলিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা এবং সেগুলির বলবৃদ্ধির ওপর লক্ষ্য রাখা। স্তন্যধাত্রী যিনি তিনি শিশুটিকে নিজের স্তন্যদুগ্ধ পান করাবেন। 'মালধাত্রী'র কর্তব্য ছিল শিশুটিকে স্নান করান এবং তার পোষাকপরিচ্ছদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। ক্রীড়পনিক ধাত্রী যিনি, তিনি শিশুটির সঙ্গে নানাবিধ খেলনা নিয়ে খেলে তাকে আনন্দে রাখার চেষ্টা করবেন[251] জীবক কুমারভচ্চ এই ভাবে ধাত্রীগণের দ্বারা লালিত-পালিত হয়েছিলেন। যখন রাজপুত্র কুমার ঐ শিশুটিকে দেখলেন তখন তিনি বললেন, শিশুটিকে অন্দরমহলে নিয়ে যাও এবং এর লালনপালনের ভার

---

247 ধম্মপদট্‌ঠকথা, I, p 57, Thag 151 Thag A, 1, 271

248 Buddhist Conception of Spirit, B C Law, p 62

249 পেতবত্থু, পৃঃ ৯, পি. টি এস.

250 সুমঙ্গলবিলাসিনী, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৩৩, পি টি এস.

251. E B Cowell, Divyavadana, p 475

ধাত্রীগণের হস্তে অর্পন করা[252] বেস্‌সন্তর জাতক ও মূগপক্‌খ জাতককাহিনী হবে উল্লেখ আছে যে ধাত্রীদের অঙ্গ সূলক্ষণ যুক্ত চিহ্ন থাকা আবশ্যক। এই রকম ধাত্রীরা নাতিদীর্ঘ নাতিহ্রস্ব দেহা হবেন, তাঁদের কোনরকম অঙ্গবৈকল্য থাকবে না এবং সুমিষ্ট স্তন্যদুগ্ধ প্রদায়িনী হবেন।

উপরোক্ত নানাবিধ জীবিকা বৌদ্ধযুগের মহিলারা গ্রহণ করতেন। তাঁরা তাঁদের জীবিকা নিজেরাই অর্জন করতেন এবং আত্মনির্ভরশীল ছিলেন। দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত অবস্থার নারীগণ এই ধরণের জীবিকা গ্রহণ করতেন। এই প্রসঙ্গে নকুল-মাতার কথা উল্লেখ্য—তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত স্বামীকে কথা দিয়েছিলেন যে তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর নিজেই নিজের জীবিকা গ্রহণ করবেন।[253]

---

252 Sum, Vil, Vol 1, p 133, P. T. S

253 Ang. I, 26, II, 61

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিক্ষা-দীক্ষা

"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে" (দুটি বিদ্যা জ্ঞাতব্য) এই বাণী ভারতীয় সভ্যতার স্মরণাতীত যুগে বিদ্যা শিক্ষার্থীগণের উদ্দেশে ব্রহ্মবিদ্ এক ঋষিকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল। সেই দুটি জ্ঞাতব্য বিদ্যা কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হল—"পরা চৈবাপরা চ"[1] (পরা ও অপরা বিদ্যা)।

যে বিদ্যার দ্বারা মানুষ স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে কিন্তু সর্বজ্ঞত্ব প্রাপ্ত হতে বা শান্তি লাভ করতে পারে না, সেই বিদ্যার নাম অপরাবিদ্যা। চারিবেদ[2] ও ছয়[3] বেদাঙ্গ অন্তর্গত। অপর পক্ষে যে বিদ্যার দ্বারা মানুষ সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় সমূহে জ্ঞান লাভ করে এবং যে বিদ্যা সম্যকভাবে অধিগত হলে জিজ্ঞাসুর সর্বসংশয়[4] ছিন্ন হয়। ফলে তিনি সর্বজ্ঞতা ও পরমানন্দ লাভ করেন, সেই বিদ্যাই হল পরাবিদ্যা বা শ্রেষ্ঠবিদ্যা। এই দুই বিদ্যা সম্বন্ধে এক কথায় বলা যায়—অপরাবিদ্যা বস্তুনির্ভর এবং পরাবিদ্যা অনুভূতিনির্ভর। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে বলা হয়েছে যে, পরাবিদ্যা লাভই হল মানুষের পরমকাম্যবস্তু[5]।

বেদপন্থী শিক্ষা ব্যবস্থার চতুরাশ্রমের কথা বলা হয়েছে, যথা: ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রম। পূর্ববর্তী তিনটি আশ্রমের উদ্দেশ্য হল—ইন্দ্রিয়গুলিকে ভোগ্য বিষয়বস্তু সমূহ থেকে প্রত্যাহৃত করে এমন ভাবে অন্তর্মুখী

---

1. "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্‌ব্রহ্মবিদো বদন্তি—পরা চৈবাপরা চ"

মুণ্ডকোপনিষৎ, ১ ১, ৪,

উপনিষৎ গ্রন্থাবলী, স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত, পৃঃ ১৯৩

2 চারিবেদ যথা: ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব বেদ। প্রতিবেদে মন্ত্র (যার অপর নাম সংহিতা) ও ব্রাহ্মণ নামে দুটি করে বিভাগ আছে। ব্রাহ্মণ ভাগে বিধিনিষেধ, যাগ-যজ্ঞ, ইতিবৃত্ত, অর্থবাদ, উপাসনা ও ব্রহ্মবিদ্যা নিবদ্ধ করা হয়েছে। ব্রাহ্মণেরই অংশবিশেষকে আরণ্যক বলা হয়।

3 ছয় বেদাঙ্গ, যথা: শিক্ষা-বর্ণোচ্চারণাদি বিষয়ক গ্রন্থ, কল্প-শ্রৌত কর্মানুষ্ঠানের জ্ঞাপক সূত্রগ্রন্থ, নিরুক্ত-বৈদিক শব্দসমূহের অর্থপ্রকাশক গ্রন্থ, ছন্দঃ-গায়ত্র্যাদি ছন্দের প্রকাশক গ্রন্থ, ব্যাকরণ ও জ্যোতিষ।

4 "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

মুণ্ডকোপনিষৎ, ২। ২। ৮

5. কেনোপনিষৎ, ২। ৫, উপনিষৎ গ্রন্থাবলী, স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত, পৃঃ ৯৯

করার প্রচেষ্টা যার ফলে স্থূল ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সর্ববস্তুতে বিতৃষ্ণা জন্মায় এবং ক্রমে মানুষকে সন্ন্যাস গ্রহণের যোগ্য করে তোলে। এই সঙ্গে আরও বলা হয়েছে যে, যাঁরা পূর্বজন্মের সুকৃতি বশতঃ সহজাত বৈরাগ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁদের পক্ষে বৈরাগ্য জন্মানর জন্য পূর্ববর্তী তিনটি আশ্রম পরিভ্রমণ করতে হয় না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়—ঐতিহাসিক কালে গৌতম বুদ্ধ ও শ্রীচৈতন্য গার্হস্থ্য আশ্রম থেকেই সন্ন্যাস গ্রহণ করায় তাঁদের পক্ষে বানপ্রস্থ আশ্রমের প্রয়োজন হয়নি। আট বৎসর বয়সে শঙ্করাচার্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। এই জন্যই প্রাচীন ভারতের ঋষিগণ বলেছেন যে, চিত্তে যখনই বৈরাগ্যের উদয় হবে তখনই সন্ন্যাস গ্রহণ বা প্রব্রজ্যা অবলম্বন করা কর্তব্য[6]।

বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে প্রাক্‌ব্রাহ্মণ্যযুগ পর্যন্ত প্রাগুক্ত পরা ও অপরাবিদ্যা সকল শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া হত[7]। শিক্ষা দিতেন ব্রহ্মবিদ্ গুরুগণ। যাঁরা কোনও এক তপোবনে ব্যক্তিগত কুটীরে একাকী অথবা সস্ত্রীক বাস করতেন। এই রকম কোনও এক গুরুগৃহের আশ্রয়ে থেকে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে শিক্ষার্থীরা বিদ্যার্জন করতেন। বেদই ছিল প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়। অবশ্য বেদাঙ্গের অন্তর্গত যে কোনও বিষয় শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ পছন্দ মত শিখতে পারতেন। গুরু ও শিষ্যের মধ্যে সম্বন্ধ ছিল পিতা ও পুত্রের মত। অভিলষিত বিদ্যা শিক্ষা সমাপ্ত হলে, যথোচিত গুরুদক্ষিণা দিয়ে শিষ্য ইচ্ছা করলে ব্রহ্মচর্য আশ্রম থেকে গার্হস্থ্য আশ্রমে ফিরে যেতে পারতেন[8]।

কালক্রমে শিক্ষা জগতের ধারক ও বাহক হয়ে উঠলেন[9] ব্রাহ্মণগণ; এবং তাঁদেরই অনুশাসনে ব্রাহ্মণজাতি ছাড়া অন্য কোনও জাতির বেদশিক্ষার অধিকার রইল না। যুদ্ধ বা অস্ত্রবিদ্যা, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিদ্যা শিক্ষা রাজপুত্র ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী-পুত্র বা ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত বংশজাত শিক্ষার্থীদের জন্য সীমাবদ্ধ হয়ে রইল, ফলে সমাজের মধ্য ও নিম্নবিত্ত গৃহের সন্তানগণ উচ্চ-মানের শিক্ষালাভ থেকে বঞ্চিত[10] হল।

ভারতীয় শিক্ষাজগতের এই যুগে অপূর্ব ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আবির্ভূত হলেন পরমকরুণাময়, সর্বমানবের কল্যাণকামী গৌতম বুদ্ধ-যিনি

---

6 'হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব,' ('ভারতবর্ষ' নামক পত্রিকার ১৩৮৫ সালের শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত, পৃঃ ১১৪ দ্রষ্টব্য) ডঃ দুর্গাদাস বসু সরস্বতী।

7 The Vedic Age, Ep by R C Mazumder, p 455

8 The Vedic Age, Ed by R C Mazumder, p 455

9. বৌদ্ধসাহিত্য ও শিক্ষা-দীক্ষার রূপরেখা—ডঃ শ্রীঅনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৪৬

10 The wonder that was India, A L Basham, pp 163–164

ধর্মজগতের সঙ্গে শিক্ষা জগতেও আনলেন এক বিপ্লব। তিনি ঘোষণা করলেন—প্রত্যেকটি মানুষের পরা ও অপরা এই দ্বিবিধ বিদ্যা শিক্ষা লাভের[11] অধিকার আছে। কারণ সকল মানুষই[12] বুদ্ধাঙ্কুর। বীজস্থ প্রত্যেক অঙ্কুর যেমন উপযুক্ত আলো, জল, মাটী, বাতাস প্রভৃতির আনুকূল্যে নিজেকে পূর্ণভাবে প্রকাশিত করতে পারে, সেই রকম প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অঙ্কুরবৎ যে শক্তি নিহিত আছে, উপযুক্ত পরিবেশ ও পরিস্থিতির আনুকূল্যে সেই শক্তিই পূর্ণ মনুষ্যত্বরূপে অর্থাৎ বোধিসত্ত্বরূপে বিকশিত[13] হয়।

শুভাকাঙ্খী মানব ও দেবতাগণের[14] মঙ্গলকর চিন্তা কি? এই প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে মঙ্গলপ্রদ শিক্ষা সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বললেন বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন, বহু শিল্পশিক্ষা, বিনয়ে সুশিক্ষিত হওয়া এবং সুভাষিত বাক্য বলা এই হচ্ছে উত্তম[15] মঙ্গল।

বুদ্ধবাণী অনুসরণ করে শিক্ষা ও ধর্মের সংজ্ঞা রূপে একথা বলা যায়-মানুষের মধ্যে নিত্যবর্তমান যে পূর্ণতা আছে অথচ যা অপ্রকাশিত অবস্থায় রয়েছে, তার অভিব্যক্তির নাম শিক্ষা এবং মানব অন্তরে নিহিত অথচ অপ্রকাশিত যে দেবভাব রয়েছে তার অভিব্যক্তির নাম ধর্ম।

ভারতীয় দর্শনে বলা হয়েছে,[16] 'কর্মই ধর্ম', 'ধর্মই কর্ম'। বুদ্ধদেব ছিলেন দৃঢ়প্রত্যয়ী[17] কর্মবাদী। তাই তাঁর ধর্মমত কর্মবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। জীব অর্থাৎ মানুষ কল্যাণ বা পাপ (কল্যাণং বা পাপকং বা) যে কোনো প্রকার কর্মই করে সেইটির উত্তরাধিকারী (তস্স দাযা দো) সে নিজেই হয়, অর্থাৎ মানুষ স্বয়ংকৃত কুশল বা অকুশল কর্মানুসারে তার ফলস্বরূপ সুখ বা দুঃখ ভোগ করে। সুতরাং অকুশল কর্ম ত্যাগ করে কুশল কর্ম করতে শিক্ষা দিয়ে

---

11 বৌদ্ধসাহিত্য ও শিক্ষা-দীক্ষার রূপরেখা—ডঃ শ্রীঅনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৫৯

12 বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন, ধর্মাধার মহাস্থবির, পৃঃ ১১৮

13 "বৌদ্ধধর্মেই মানবকে দেবতার স্থান প্রথম দেওয়া হইয়াছে।" বুদ্ধদেব, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৫২

14 খুদ্দক পাঠো, মহামঙ্গলসুত্তং, ২

15 "বাহুসচ্চঞ্চ সিপ্পঞ্চবিনয়ো চ সুসিক্খিতো
সুভাসিতা চ যা বাচা এতং মঙ্গলমুত্তমং।"
খুদ্দকপাঠো, মহামঙ্গলসুত্তং, ৫

16 ধম্ম পদং, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ১৩

17 বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম, ডঃ শ্রীঅনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৪৩

বুদ্ধদেব বললেন[18] 'অপ্পমাদেন সম্পাদেথ' (অপ্রমত্ত হয়ে কুশলকর্ম সম্পাদন করে)। শিষ্য সম্প্রদায়ের প্রতি উক্ত বাক্যটিই হল বুদ্ধদেবের শেষ উপদেশ বাক্য।

অপ্রমত্ত হয়ে কর্ম সম্পাদন করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন চরিত্র গঠন। কারণ, বিশুদ্ধ চরিত্র হল সাধনায় সিদ্ধিলাভের ভিত্তিস্বরূপ। এই জন্য বুদ্ধদেব শিক্ষার্থীকে প্রথমে কয়েকটি শীল[19] পালন করতে অনুজ্ঞা দিয়ে বললেন, আর্যশ্রাবকেরা প্রতিদিন নিজেদের এই শীলগুলিকে স্মরণ করেন (ইধ অরিয়সাবকো অত্তনো সীলানি অনুস্সরতি)। চারিত্রিক বিশুদ্ধতা লাভের প্রধান উপায় চিত্তসংযম। চঞ্চলতা চিত্তের স্বভাব বা ধর্ম। এই স্বভাব বশতঃ চিত্ত তাই কখনও কোনো একস্থানে আবদ্ধ থাকতে পারে না, ফলে ন্যায়-অন্যায় বা লাভ-ক্ষতি সম্বন্ধে অবহিত না হয়ে বা বিচার না করেই স্থূল ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য আপাতমধুর বিষয় বস্তুতে আকৃষ্ট হয়ে যথেচ্ছ বিচরণ করে।

সতত স্পন্দনশীল অর্থাৎ চঞ্চল[20] চিত্ত দুরক্ষ্য এবং দুর্নিবার্য (ফন্দনং চপলং চিত্তং দুরক্খং দুন্নিবারযং) কিন্তু যে ব্যক্তি শীলপালন জাত সংযমের দ্বারা স্বভাব-চঞ্চল, স্বেচ্ছা-বিহারী চিত্তকে নিয়ন্ত্রিত করে আপন লক্ষ্যপথে তাকে চালিত করতে পারেন, বিশুদ্ধ চরিত্র লাভে তিনিই সক্ষম হন। বিশুদ্ধ চরিত্র ব্যক্তি নিজের কুশলকর্মজাত পুণ্য বলে আত্মবিশ্বাস লাভ করে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হন, এবং স্বার্থ বিসর্জনে বাধাহীন ভাবে প্রেম-দয়া-মৈত্রীকে বিস্তার করতে পারেন, পরিণামে নির্বাণরূপ মুক্তি লাভের অধিকার প্রাপ্ত হন[21]।

---

18 "হন্দদানি ভিক্খবে আমন্তয়ামি বো, বয়ধম্মা সঙ্খারা অপ্পমাদেন সম্পাদেথাতি।" অযং তথাগতস্স পচ্ছিমা বাচা। ('ভিক্ষুগণ, তোমাদের সম্বোধন করে বলছি যে, সংস্কার সমূহ ক্ষয়শীল অপ্রমাদের অর্থাৎ জ্ঞানসম্প্রযুক্ত সম্যক্ স্মৃতির সঙ্গে সর্বকার্য সম্পাদন করবে।' ইহাই তথাগতের শেষ বাক্য।)

মহাপরিনিব্বান সুত্তং, ৬. ১০

দ্রষ্টব্য : এই প্রসঙ্গে ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া তাঁর Asoka and His Inscripiton গ্রন্থে (পৃঃ ২৫০ দ্রষ্টব্য) বলেছেন—" . With Buddha appamada is the Single term by which the whole of his teaching might be summed up."

19 "...শীলে প্রতিষ্ঠিত সাধক শীলকে আশ্রয় করে, শীলের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধীন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়—এই পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবনা করেন ও বৃদ্ধি করেন।"

মিলিন্দ প্রশ্ন (বঙ্গানুবাদ), ধর্মাধার মহাস্থবির, পৃঃ ৩৪

20 ধম্মপদ, চিত্তবগ্গো, গাথা সংখ্যা ১।

21. মহাপরিনিব্বান সুত্তং, ১.১২।

বুদ্ধদেব তাঁর শিক্ষা শিক্ষার্থীদের দানের জন্য যে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন তা ভিক্ষু-সংঘ নামে পরিচিত। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দ্বার জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত হল। বৌদ্ধ-ভিক্ষুরা যে আবাসে বাস করতেন তাকে বিহার বা সঙ্ঘারাম বলা হত। এই বৌদ্ধ-বিহার বা সঙ্ঘারাম ছাড়া অন্যত্র কোথাও বৌদ্ধ শিক্ষা-দীক্ষার দান-গ্রহণের তেমন কোনো ব্যবস্থা ছিল বলে পালি সাহিত্যে উল্লেখ পাওয়া যায় না। বৌদ্ধ বিহার বা সঙ্ঘারাম গুলিতে পঠন ও পাঠন চলত কথন ও শ্রুতির মাধ্যমে এবং তা চলত গুরু-শিষ্য পরম্পরায়। তবে প্রাক্ বৌদ্ধযুগে প্রচলিত একক গুরুর পরিবর্তে বুদ্ধদেবের সময়ে (ভিক্ষু) শিক্ষকমণ্ডলীর নিকট শিক্ষার্থীদের শিক্ষা লাভ করার রীতি প্রচলিত হল[22]। ক্রমে বৌদ্ধবিহারগুলি এক একটি শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হল। এই সকল বিহারে বুদ্ধদেবের শিক্ষায় শিক্ষিত প্রাজ্ঞ ভিক্ষুগণ উপাধ্যায় (উপজঝায) ও আচার্য (আচরিযো) রূপে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করতেন। উপাধ্যায়ের অধীনে যিনি শিক্ষা গ্রহণ করতেন তাঁকে উপাধ্যায়ের সর্দ্ধিবিহারী (সদ্ধিবিহারিক) এবং আচার্যের অধীনে যিনি শিক্ষা লাভ করতেন তাঁকে আচার্যের অন্তেবাসী অর্থাৎ শিক্ষানবীশ বলা হত। উপাধ্যায় ও তাঁর সর্দ্ধিবিহারী এবং আচার্য ও তাঁর অন্তেবাসী পরস্পরের প্রতি কিরূপ আচরণ করবেন সে বিষয়ে বুদ্ধদেব যে সমস্ত উপদেশ দিয়েছেন সেগুলি পালি সাহিত্যের অন্তর্গত মহাবর্গ (মহাবগ্‌গো) গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে[23]।

বৈদিকযুগে নর-নারী নির্বিশেষে সকলেই বিদ্যার্জনের সমান সুযোগ-সুবিধা পেতেন। বালকদের মত বালিকাদেরও উপনয়ন সংস্কার হত। উপনয়ন[24]সংস্কারের পর বালিকাদের বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হত। নারীরাও যজ্ঞোপবীত[25] ধারণ করতেন।

বৈদিকযুগের ঘোষা, গোধা, বিশ্ববারা প্রভৃতি বহু ব্রহ্মবাদিনী[26] নারী-ঋষির কথা জানা যায়। এই সকল নারীঋষিদের মধ্যে অনেকেই বেদমন্ত্র[27]

---

22 বৌদ্ধ সাহিত্য ও শিক্ষা-দীক্ষার রূপরেখা, ডঃ শ্রী অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৪৭।

23. মহাবগ্‌গো, ১ ১৮-২৩, নালন্দা সংস্করণ।

24 Great women of India, Ed by Swami Madhavananda and Ramesh chandra Mazumder, p 5

Cf Women's Education in India,

Y B Mathur, p 1

25 প্রাচীন ভারতে নারী, শ্রী ক্ষিতিমোহন সেন, পৃঃ ১।

26 "বৃহদ্দেবতা ইঁহাদিগকে (অর্থাৎ ঘোষা, গোধা, বিশ্ববারা প্রভৃতি নারীদিগকে) ব্রহ্মবাদিনী বলিয়াই ঘোষণা করিলেন, সমাজেও তাঁরা ব্রহ্মবাদিনী-রূপে বিখ্যাত ছিলেন।"

প্রাচীন ভারতে নারী, শ্রী ক্ষিতিমোহন সেন, পৃঃ ৭

27 প্রাচীন ভারতে নারী, শ্রী ক্ষিতিমোহন সেন, পৃঃ ৮

রচনা করেছিলেন। উপনিষদে বলা হয়েছে, মৈত্রেয়ী (যাজ্ঞবল্ক্য-পত্নী), বাচক্নবী প্রভৃতি ব্রহ্মবাদিনী নারীগণ বড় বড় সংসদে ও বিদ্বজ্জন সভাতে যোগ[28] দিতেন। বৈদিকযুগের পরবর্তী যুগের সাহিত্যে বহু শিক্ষিতা নারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এমন কি খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে রচিত 'উত্তর রামচরিত', 'মালতীমাধব' প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে নরনারীর একত্রে আচার্যের নিকট অধ্যয়ন করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু পালি সাহিত্যে বৌদ্ধযুগের নারীগণ কি ভাবে বিদ্যার্জন করতেন তার বিশেষ কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। বৌদ্ধযুগে কাশী ও তক্ষশীলা শিক্ষাকেন্দ্র দুটি খুবই খ্যাতি[29] অর্জন করেছিল, বিশেষ করে ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত সীমায় অবস্থিত তক্ষশীলা শিক্ষাকেন্দ্রটির সুনাম সুদূরবিস্তারী হওয়ার ফলে (জাতক-কাহিনীগুলি থেকে জানা যায়) রাজগৃহ, বারাণসী, মিথিলা, উজ্জয়িনী প্রভৃতি ভারতের নানাস্থান থেকে উচ্চমানের নানা বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্য শিক্ষার্থীরা তক্ষশিলায়[30] আসতেন (কিন্তু ঐ সঙ্গে নারীরাও বিদ্যার্জন করতেন এমন কোনো কথার উল্লেখ পালিসাহিত্যে পাওয়া যায় না)। তক্ষশিলা শিক্ষাকেন্দ্রে ত্রিবেদ, দর্শন, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ প্রভৃতি নানা বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে ভৈষজ্য ও শল্য চিকিৎসা বিদ্যা এবং রাজনীতি বিদ্যাও শিক্ষা[31] দেওয়া হত। বুদ্ধদেবের পরম ভক্ত জীবক[32] (মগধরাজ বিম্বিসারের রাজবৈদ্য) এই শিক্ষাকেন্দ্র থেকে চিকিৎসাবিদ্যা আয়ত্ত করে শল্যচিকিৎসায় দক্ষতা লাভ করেন এবং এই শিক্ষাকেন্দ্র থেকেই বিখ্যাত রাজনীতিবিদ্ চাণক্য[33] রাজনীতি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন।

ভিক্ষুসংঘে শিক্ষার্থীরূপে প্রবেশের জন্য পুরুষদের পক্ষে যে নিয়মাবলী প্রযোজ্য ছিল, ভিক্ষুণী সংঘে শিক্ষার্থিনীরূপে নারীদের প্রবেশের জন্য অনুরূপ নিয়মাবলীই[34] প্রযোজ্য ছিল, অর্থাৎ কোনো নারী ভিক্ষুণী সংঘভুক্তা হওয়ার জন্য প্রার্থনা জানালে প্রার্থিণীর মনোনীতা কোনো অভিজ্ঞা ভিক্ষুণী প্রার্থিনীর উপাধ্যায়ারূপে প্রথমে প্রার্থিনীকে প্রব্রজিতা করতেন। পরে তাঁকে সংঘে প্রবেশের অনুমতি দিতেন। প্রব্রজিতা নারী তখন শিক্ষার্থিণীরূপে সংঘভুক্তা হতেন। ভিক্ষু-

---

28. ঐ
29. The wonder that was India, A. L. Basham, p 164
30. Pre-Buddhist India, Ratilal N Mehta, p 299
31. বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম, শ্রীচন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১৫১।
32. ঐ
33. বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম, শ্রী চন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১৫১।
34. Early Monastic Buddhism, Dr. Nalinaksha Dutt, p 296.

সংঘের শিক্ষার্থী ভিক্ষুদের জন্য নির্দেশিত শিক্ষাপদ সমূহ যে ভিক্ষুণী সংঘের শিক্ষার্থিণী ভিক্ষুণীরাও অনুরূপভাবে অনুশীলন করতেন সে কথা চুল্লবর্গ (চুল্লবগ্গো) গ্রন্থ পাঠে জানা যায়। মহাপ্রজাবতী গৌতমী উপসম্পদা লাভের পর বুদ্ধদেবকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন যে, ভিক্ষুণী সংঘের শিক্ষার্থিনী ভিক্ষুণীদের পক্ষে কোন কোন নীতি শিক্ষণীয় এবং কোন কোন নীতি বর্জনীয়? উত্তরে বুদ্ধদেব বললেন যে, যে শিক্ষা-পদসমূহ শিক্ষার্থী ভিক্ষুদের পক্ষে শিক্ষণীয় বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেই শিক্ষা-পদ সমূহ ভিক্ষুণীদের পক্ষেও শিক্ষণীয় এবং শিক্ষার্থী ভিক্ষুদের পক্ষে যে সকল নীতি বর্জনীয় বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেই সকল নীতি শিক্ষার্থিনী ভিক্ষুণীদের পক্ষেও বর্জনীয়, এই উপদেশ স্মরণ রেখে শিক্ষার্থিনী ভিক্ষুণীগণ শিক্ষা গ্রহণ করবেন[35]।

যদিও পালি-সাহিত্যে ভিক্ষুণীসংঘে কি ভাবে শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ করা হত এবং শিক্ষিকা ও ছাত্রীর কর্তব্য কি ছিল সে সম্বন্ধে পৃথক ভাবে কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না, তবে ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষে উপাধ্যায়া (পবর্ত্তিনী), আচার্য সহবিহারিণী বা সহজীবিনী অন্তেবাসিনী, শিক্ষমানা প্রভৃতি নামে অভিহিতা নানা শ্রেণীর ভিক্ষুণীদের উল্লেখ পাওয়া যায়, এবং শিক্ষা সম্বন্ধীয় তাঁদের নানা কার্যকলাপ ও আচার আচরণের যে বিবরণ[36] পাওয়া যায় তাতে স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয় যে, ভিক্ষুসংঘের উপাধ্যায়, আচার্য, সহবিহারী, অন্তেবাসী প্রভৃতির জন্য শিক্ষা বিষয়ক এবং আচার-ব্যবহার বিষয়ক যে সকল নীতি-নিয়ম নির্দেশ করা হয়েছিল, ভিক্ষুণী সংঘের উপাধ্যায়া, আচার্যা, সহবিহারিণী, অন্তেবাসিনী প্রভৃতির জন্য উক্ত নীতি-নিয়মগুলিই অনুরূপ ভাবে অনুসৃত হত। সুতরাং একথা বলা যায় যে, উপাধ্যায়ার সহজীবিনী অর্থাৎ উপাধ্যায়ার অধীনস্থ শিক্ষার্থিনী উপাধ্যায়ার সেবা-পরিচর্যা করতেন। নিম্নলিখিত ভাবে তাঁকে উপাধ্যায়ার সেবা-পরিচর্যা করতে হত।

প্রাতঃকালে উপাধ্যায়ার জন্য দাঁতন-কাঠি ও মুখ ধোবার জল দেওয়া, উপবেশনের জন্য আসন পেতে তাঁকে যাগু খেতে দেওয়া, তাঁর খাওয়া শেষ হলে যথাস্থানে আসন তুলে রাখা এবং উচ্ছিষ্ট পাত্র পরিষ্কার করা। ভিক্ষার্থে বা

---

35 "যানি তানি, গোতমি, ভিক্খুনীনং সিক্খাপদানি ভিক্খূহি সাধারণানি, যথা ভিক্খূ সিক্খন্তি তথা তেসু সিক্খাপদেসু সিক্খথা"..

'যানি তানি, গোতমি ভিক্খুনীনং সিক্খাপদানি ভিক্খূহি অসাধারণানি, যথাপঞ্ঞত্তেসু সিক্খাপদেসু সিক্খথা'তি"

চুল্লবগ্গো, ১০.৪, নালন্দা সংস্করণ। P T S p 258

36 ভিক্খুনী পাতিমোক্খ, পাচিত্তিয়া ধম্মা ১৪ এবং ৬৪-৮৩ দ্রষ্টব্য।

অন্য কোন কার্যবশতঃ উপাধ্যায়া বাইরে যেতে ইচ্ছুক হলে, তাঁকে তাঁর ত্রিচীবর, ভিক্ষাপাত্র প্রভৃতি দেওয়া। উপাধ্যায়া যদি শিক্ষার্থিনীকে সঙ্গে নিয়ে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন তবে উপযুক্ত ভাবে চীবর পরিধান ও ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যাওয়া কিন্তু শিক্ষার্থিণীর পক্ষে উপাধ্যায়ার পাশাপাশি পথ চলা রীতি বিরুদ্ধ ছিল, তাই সামান্য তফাৎ রেখে উপাধ্যায়ার পশ্চাদগামিনী হয়ে তাঁকে পথ চলতে হত। উপাধ্যায়া যখন কথা বলতেন, তখন শিক্ষার্থিণীর পক্ষে কোনো কথা বলা নিয়ম বিরুদ্ধ ছিল, তবে উপাধ্যায়া আপত্তিজনক কোনো কথা বললে তাঁকে শিক্ষার্থিণী নিষেধ করতে পারতেন। ফেরার পথে উপাধ্যায়া সঙ্ঘে পৌঁছবার আগেই তাঁর সহবিহারিণীকে সংঘে পৌঁছে উপাধ্যায়ার জন্য পা ধোবার জল ও বসবার জন্য আসন প্রস্তুত করে রাখতে হত। উপাধ্যায়া ফিরলে তাঁর বেশ-ভূষা পরিবর্তনের সময় তাঁকে সাহায্য করতে হত। তাঁর স্বেদসিক্ত চীবর রৌদ্রতাপে শুকিয়ে তা আবার যথাস্থানে রেখে দিতে হত। উপাধ্যায়া স্নান করতে চাইলে স্নানের জল, অঙ্গমার্জনের জন্য চূর্ণ ও জলচৌকি এবং স্নানবস্ত্র ইত্যাদি ঠিক করে দিতে হত। স্নানের পর উপাধ্যায়া খাদ্য গ্রহণে ইচ্ছুক হলে তাঁকে খাদ্য-পানীয় এনে দিতে হত। এরপর উপাধ্যায়া যদি কোনো উপদেশ দিতে চাইতেন বা কোনো প্রশ্ন করতে চাইতেন তবে শিষ্যাকে সে উপদেশ শ্রবণ এবং সে প্রশ্নের উত্তর দিতে হত। সংঘে কোনো পরিচারিকা নিযুক্ত না থাকায় উপাধ্যায়ার ব্যক্তিগত বাসগৃহ এবং তাঁর চীবর, বিছানা, বালিশ, চাদর, আসন, মাদুর, ভিক্ষা-পাত্র প্রভৃতি প্রত্যেকটি জিনিস শিক্ষার্থিণীকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুবিন্যস্ত ভাবে রাখতে হত[37]। এমন কি উপধ্যায়ার পায়খানার[38] আবর্জনাও শিক্ষার্থিণীকেই পরিষ্কার করতে হত। উপাধ্যায়াকে জিজ্ঞাসা না করে শিক্ষার্থিনী অন্য কাউকে নিজের চীবর দিতে বা অপরের চীবর গ্রহণ করতে পারতেন না[39]। সংঘ কর্তৃক কোনো শিক্ষার্থিণীর জন্য অনুমোদিত অথবা তাঁর প্রাপ্ত কোনো জিনিসের পরিবর্তে অন্য কোন জিনিষ প্রার্থনা করতে অথবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্য অন্য কোনো জিনিষ তিনি প্রার্থনা করতে পারতেন না[40]। উপাধ্যায়া অসুস্থ হলে যাবৎ তিনি সুস্থ না হয়ে ওঠেন তাবৎ তাঁর সহবিহারিণীকে তাঁর সেবা করতে হত[41]। এই ভাবে উপধ্যায়ার অধীনস্থ

---

37. বৌদ্ধ সাহিত্যে শিক্ষা-দীক্ষার রূপরেখা, ডঃ শ্রী অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৫৩-৫৪
38 ঐ ঐ পৃঃ ৫৪
39. ভিক্খুণী পাতিমোক্খ, পাচিত্তিয়া ধম্মা ২৫ ও ২৮।
40. ঐ নিস্সগ্গিয়া পাচিত্তিয়, ৫, ৬, ৭।
41. ঐ পাচিত্তিয়া ধম্মা, ৩৪

শিক্ষার্থিণী তাঁর উপাধ্যায়ার সেবা পরিচর্যা করার শিক্ষা প্রাপ্ত হতেন,[42] এবং উক্ত নিয়মেই আচার্যার অধীনস্থ শিক্ষার্থিণীরা নিজ নিজ আচার্যার সেবা পরিচর্যা করার শিক্ষা লাভ করতেন[43]।

উপাধ্যায়াকেও তাঁর অধীনস্থ সহজীবিনীর প্রতি তাঁর করণীয় কর্তব্য পালন করতে হত[44]। তিনি তাঁর অধীনস্থ শিক্ষার্থিণীর সর্বপ্রকার কাজকর্মের ওপর বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। শিক্ষার্থিনীর প্রতিটি গতিবিধির প্রতি উপাধ্যায়াকে সতর্কদৃষ্টি রাখতে হত। সহৃদয়তার সঙ্গে উপাধ্যায়া শিক্ষার্থিণীকে প্রশ্ন করতেন, উপদেশ দিতেন। সন্তানের কল্যাণের জন্য মাতা যেমন সদাজাগ্রত চিন্তায় চিন্তিত থাকেন সেই ভাবে উপাধ্যায়াও শিক্ষার্থিনীর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য সর্বদা চিন্তিত থাকতেন। সহজীবিনী অসুস্থ হয়ে পড়লে উপাধ্যায়া হয় নিজেই তাঁর সেবা করতেন অথবা অন্য কোনো ভিক্ষুণীকে পীড়িতা সহজীবিনীর সেবায় নিযুক্ত করতেন। আচার্যারও তাঁর অধীনস্থ শিক্ষার্থিণীর প্রতি কর্তব্য উপাধ্যায়ার তাঁর অধীনস্থ শিক্ষার্থিণীর প্রতি কর্তব্যের অনুরূপ ছিল। ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষ পাঠে জানা যায়, উক্ত কর্তব্যের ত্রুটি ঘটলে উভয় পক্ষকে (অর্থাৎ শিক্ষিকা ও শিষ্যাকে) ভিক্ষুণী সংঘের নিয়মানুযায়ী অপরাধী বলে গণ্য করা হত[45]।

উপাধ্যায়া শিক্ষার্থিণীকে প্রব্রজ্যা দান করতেন এবং তাঁকে প্রাথমিক শিক্ষণীয় বিষয়ে শিক্ষাদান করতেন, এবং আচার্যা শিক্ষার্থিণীকে আধ্যাত্মিক জীবন ও সাধন মার্গ সম্বন্ধে শিক্ষাদান করতেন[46]। উপাধ্যায়া তাঁর সহবিহারিণীকে কন্যার মত এবং সহবিহারিণী তাঁর উপাধ্যায়াকে মাতার মত মনে করতেন। আচার্যা তাঁর অন্তেবাসিনীকে কন্যার মত এবং অন্তেবাসিনী তাঁর আচার্যাকে মাতার মত মনে করতেন। বৌদ্ধ শিক্ষাশাস্ত্রে উক্ত রীতিকে নিস্সয়[47] নামে অভিহিত করা হয়েছে, যার অর্থ হল, উপাধ্যায়া ও তাঁর সহবিহারিণীর মধ্যে এবং আচার্যা ও তাঁর অন্তেবাসিনীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ব্যবহার ও মনোভাব। এই প্রসংগে উল্লেখ করা যায়—থেরীগাথা গ্রন্থের অন্তর্গত কয়েকটি গাথায় শিক্ষিকা ভিক্ষুণীগণের নিকট শিক্ষার্থিনীদের শিক্ষালাভের যে সকল কথা নানাভাবে উল্লেখ

---

42 বৌদ্ধ সাহিত্য ও শিক্ষা-দীক্ষার রূপরেখা, ডঃ শ্রীইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৫৪।

43 ঐ

44 চুল্লবগ্‌গো, ১০,৮, ১।

45 ভিক্খুণী পাতিমোক্খ, পাচিত্তিয়া ধম্মা, ৩৪।

46 চুল্লবগ্‌গো, ১০ ১৭

47 মহাবগ্‌গো, ১ ৩৬, ১।

করা হয়েছে তাতে এই ধারণাই করা যায় যে, শিক্ষিকা ভিক্ষুণীগণ শিক্ষার্থিনীদের রীতিমত যত্ন সহকারে শিক্ষা দান করতেন। থেরীগাথাগ্রন্থে লিপিবদ্ধ থেরীগণের ভাবিত কয়েকটি গাথার মাধ্যমে একথাও জানা যায় যে, শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থিণীর মধ্যে সম্পর্ক মাতা-পুত্রীর মত হৃদয়ের সম্পর্কে সম্পর্কিত ছিল। আদর্শ শিক্ষিকাগণের মধ্যে ভদ্দা কাপিলানি ছিলেন অগ্রগণ্যা এবং আদর্শ শিক্ষার্থিণীরূপে বিজয়ার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য[48]।

মহাবগ্‌গো[49] (মহাবর্গ) ও চুল্লবগ্‌গো (চুল্লবর্গ)[50] গ্রন্থ দুখানিতে বলা হয়েছে যে, দক্ষ ও অভিজ্ঞ আচার্যগণ বিভিন্ন বিষয়ে যাতে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান বৃদ্ধি হয় সেই উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের পরিচালিত করতেন। যেমন বিনয়ধরগণ শিক্ষার্থীদের দ্বারা বিনয় মীমাংসা করাতেন, ধর্মকথিকগণ শিক্ষার্থীদের দ্বারা ধর্মালোচনা করাতেন ইত্যাদি।

পালি সাহিত্যে মহাপঞ্‌ঞা (দিব্যজ্ঞান প্রাপ্তা) ধম্মকথিকা (ধর্মপ্রচারিকা), বিনয়ধরা (বিনয়বিশারদা) প্রভৃতি নানা বিশেষণমণ্ডিতা ভিক্ষুণীদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সূত্রে বলা যায়, ভিক্ষুণী সংঘেও প্রজ্ঞাবতী ও দক্ষা উপাধ্যায়া এবং আচার্যগণ শিক্ষার্থিণীদের জ্ঞান বিস্তারের জন্য তাদের দ্বারা বিনয় মীমাংসা, ধর্মালোচনা প্রভৃতি করাতেন। শিক্ষমানাগণের দ্বারা বার বার পাঠ করিয়ে সূত্রগুলি মুখস্থ করাতেন।

পালি সাহিত্য পাঠে জানা যায়, থেরী গাথা গ্রন্থের গাথারচয়িত্রী থেরীগণ কেউই নিতান্ত বালিকা বয়সে ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করেন নি। কিন্তু তাঁরা শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্পন্না ছিলেন কিনা এ বিষয়ে পালি সাহিত্যে কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না, তবে পালি সাহিত্যে লিপিবদ্ধ তাঁদের আচার-আচরণ থেকে অনুমান করা যায় যে, তাঁরা রীতিমত শিক্ষিতা ও সংস্কৃতি সম্পন্না ছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁরা গৃহজীবনে থাকাকালীন নারীগণের পক্ষে শিক্ষণীয় অপরাবিদ্যা বিষয়ক শিক্ষা লাভ করেছিলেন এবং যার ফলে হয়তো সংঘজীবনের শিক্ষা (পরাবিদ্যা) সহজেই আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। এ বিষয়ে উপমা দিয়ে বলা যায়—যেমন দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন চক্ষু থাকলেই দ্রষ্টব্য বস্তু দেখা যায় না, বস্তুটিকে দেখার জন্য বাইরের আলোর প্রয়োজন হয়, তেমনি অনুভূতিশীল হৃদয় থাকলেই শুধু হয়না, বিষয়-বস্তুটিকে বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা বোঝবার বা পর্যবেক্ষণ করার জন্য প্রয়োজন হয়

48 Women under in Primitive Buddhism, I. B. Horner, p 247.

49 মহাবগ্‌গো, ৪ ১৫. ৪।

50 চুল্লবগ্‌গো, ৮ ৭. ৪।

বাইরে থেকে পাওয়া শিক্ষার আলো। বস্তুতঃ অনুশীলন দ্বারা লব্ধশিক্ষার উৎকর্ষে বস্তুজ্ঞানের বা অপরাবিদ্যার জ্ঞানার্জনের সঙ্গে সঙ্গে মন ও বুদ্ধির যে তীক্ষ্ণতা ও স্বচ্ছতা লাভ হয় এবং নির্মল ঔদার্যবশতঃ পূর্ণতার যে স্ফুরণ ঘটে তাই হয়ত হয়ে উঠতে পারে ধর্মতত্ত্ব লাভের প্রস্তুতি বা পরাজ্ঞান লাভের পাথেয় স্বরূপ। সুতরাং একথা বলা যায় বক্ষ্যমাণ ভিক্ষুণীগণ লৌকিক জীবনের শোক-দুঃখ, অপমান-অভিমান ইত্যাদি থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য যে ত্রিশরণ গ্রহণ করেছিলেন, তার প্রেরণা স্বরূপ ছিল তাঁদের শিক্ষা প্রাপ্ত মন এবং বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও স্বচ্ছতা —যা তাঁদের পরাজ্ঞান লাভের জন্য গৃহজীবন থেকে গৃহহীন জীবনে পৌঁছবার পথের পাথেয় স্বরূপ ছিল।

থেরীগাথা গ্রন্থের উল্লিখিত থেরীগণ প্রায় সকলেই ছিলেন বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যা। তাঁদের রচিত গাথাগুলি পাঠ করলে স্পষ্টই ধারণা হয় যে, বুদ্ধদেবের শিক্ষা ও বৌদ্ধদর্শন তাঁরা অতি উত্তমরূপে আয়ত্ব করতে সমর্থা হয়েছিলেন। উক্ত ঋষিকল্পা নারীগণের রচিত গাথাগুলিতে ব্যবহৃত আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক পরিভাষা-গুলি তাঁদের বৌদ্ধধর্ম ও শাস্ত্রজ্ঞানের ওপর যে আলোকপাত করেছে তাতে স্বচ্ছ ভাবেই বোধগম্য হয় যে, জ্ঞানগরিমায় অর্হত্ব প্রাপ্ত থেরগণের তুলনায় তাঁরা কোনো অংশেই ন্যূন তো ছিলেনই না বরং[51] সমকক্ষই ছিলেন। পালি সাহিত্যেও তাই দেখা যায়, এই সমতার স্বীকৃতিতে অর্হত্ব প্রাপ্ত ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের নর-নারীর দেহগত পার্থক্য সীমার উর্ধ্বে গৌরবমণ্ডিত এক আর্যশ্রেণী রূপে[52] উপস্থাপিত করা হয়েছে[53]।

এই আর্যশ্রেণীর নারীগণ ভয়হীন, দ্বিধাহীন চিত্তে বিপদসঙ্কুল বন্ধুর পথে স্বাধীনভাবে[54] ধর্মপ্রচারের উদ্দেশে গমনাগমন করতেন, ধ্যান-ধারণার জন্য উত্তুঙ্গ গিরিশিখরে আরোহণ করতেন অথবা গভীর অরণ্যে নিঃশঙ্কচিত্তে প্রবেশ করতেন।

বুদ্ধদেবের সমকালীন যে সকল নারী গৃহত্যাগ করে ত্রিশরণ (অর্থাৎ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ এই তিনের নিকট শরণ গ্রহণ) গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা যে কেবল সাংসারিক নানা জ্বালাযন্ত্রনাময় দুঃখের পীড়ন থেকে পরিত্রাণ লাভ করেছিলেন তা নয়—পার্থিব সকল প্রকার সুখভোগের আকাঙ্খা বা তৃষ্ণা (তণ্হা) থেকে

51 Early Monastic Buddhism, Vol I, Dr Nalinaksha Dutta, p 115

52 অর্হৎ = কর্তব্যচারী শান্তচিত্ত জন।

53 থেরী গাথা (বঙ্গানুবাদ), ভিক্ষু শীলভদ্র ভূমিকা পৃঃ ১০

54 Early Monastic Buddhism, Vol I,
Dr Nalinaksha Dutta, p, 115-116.

চিত্তকে মুক্ত করতে সমর্থা হয়েছিলেন। চিত্তের এই মুক্তিতে এবং সাধন-মার্গে উত্তরোত্তর উন্নত হওয়ার উপলব্ধিতে এক অতীন্দ্রিয় আনন্দরসাস্বাদনে আপ্লুত হৃদয়ের যে গভীর আবেগ স্বতস্ফূর্ত সঙ্গীতরূপে তাঁদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল কালক্রমে সেগুলি সংগৃহীত হয়ে 'থেরীগাথা' নামে খ্যাত হয়। থেরীগাথা গ্রন্থ খানিকে এক উচ্চমানের[55] গ্রন্থ বলা হয়েছে। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থখানি মূলতঃ বৈরাগ্যভাব, এবং বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও মঙ্গলময়ত্ব প্রচারই এর প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হলেও তৎকালীন সমাজ-জীবনের[56] কিছু কিছু তত্ত্ব ও তথ্য এই গ্রন্থে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এর কারণ স্বরূপ বলা যায় যে, চিত্রশিল্পী যেমন তাঁর ঈপ্সিত চিত্রটি সুপরিস্ফুট করার জন্য একটি পটভূমিকা নির্বাচন করেন তেমনি ভাবে কবি থেরীগণ আধ্যাত্মিক জীবনের মহিমা পরিস্ফুটনের জন্য সুখ-দুঃখ, মিলন-বিরহ, মান-অপমান, রাগ-দ্বেষ, লোভ-মোহ ইত্যাদি সমন্বিত লৌকিক জীবনের তত্ত্ব ও তথ্যকে পটভূমিরূপে গ্রহণ করেছেন। এই পটভূমি অঙ্কন করতে গিয়ে তাঁরা তাঁদের রসগ্রাহী কবিচিত্তের পরিচয়ই দিয়েছেন। থেরীগাথা গ্রন্থের অন্তর্গত গাথাগুলি যে স্থানে স্থানে গীতিকাব্যধর্মী ও নাটকীয় গুণ সম্পন্ন হয়ে উঠেছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়[57]। গাথাগুলির মধ্যে একদিকে যেমন ক্ষুদ্রগণ্ডীবদ্ধ সংসারী মানুষের চরিত্র অকৃত্রিম ভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি আধ্যাত্মিক জীবনের অমৃত আস্বাদনের উপলব্ধি শরৎকালীন নির্মল আকাশ থেকে স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকের মত বিচ্ছুরিত হয়েছে। খ্যাতনাম্নী ধর্মপ্রচারিকারূপে যে সকল নারীর নাম পালি সাহিত্যে পাওয়া যায়, তার মধ্যে শুক্রা (সুক্কা) অন্যতমা। একদিন রাজগৃহ নগরে এক বিশাল জনতার সম্মুখে ওজস্বিনী ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় শুক্রা ধর্মবিষয়ে এমন বক্তৃতা দিলেন যে, শ্রোতৃবর্গের মর্মে তা অমৃতসমান বলে অনুমিত হওয়ায় তাঁরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ নিশ্চল হয়ে শুক্রাভাষিত সেই ধর্মদেশনা শ্রবণ করেছিলেন[58]। ফলে রাজগৃহ নগরে যখনই শুক্রা ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন তখনই উক্ত নগরের জনগণ ভক্তি আপ্লুত চিত্তে শুক্রার বক্তৃতা শুনতে আসতেন এবং পরম প্রীতি লাভ করতেন[59]।

---

55. থেরী গাথা (বঙ্গানুবাদ), ভিক্ষু শীলভদ্র, মুখবন্ধ, ডঃ নলিনাক্ষ দত্ত, পৃঃ ১১।

56 বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম, ডঃ শ্রী অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ১০৯।

57 থেরীগাথা (বঙ্গানুবাদ), ভিক্ষু শীলভদ্র, মুখবন্ধ, ডঃ নলিনাক্ষ দত্ত, পৃঃ ১১।

58. Samjukta Nikaya (P. T. S.), 1,1,

59. Ibid.

ভিক্ষুণী[60] ক্ষেমা (খেমা) বিনয়[61] উত্তমরূপে আয়ত্ত করেছিলেন। শিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী ক্ষেমা চমৎকার বক্তৃতা করতে পারতেন, এবং তাঁর অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল।

একদিন কোশলরাজ প্রসেনজিৎ (পসেনদি) ক্ষেমার সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁকে যথাবিধি সম্মান প্রদর্শন করে আচার্যের সম্মুখে যে ভাবে শিষ্যের উপবেশন করা কর্তব্য সেই ভাবে উপবিষ্ট হয়ে ক্ষেমাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন এবং সেই সূত্রে উভয়ের মধ্যে যে প্রশ্ন-উত্তর বিনিময় হয়েছিল তা নিম্নে উদ্ধৃত করা হল ঃ

প্রসেনজিতের প্রশ্ন ঃ মৃত্যুর পর জীবের পুনর্জন্ম হয় কিনা ?

ক্ষেমার উত্তর ঃ ভগবান বুদ্ধ এ প্রশ্নের কোনো উত্তর দেন নি।

প্রসেনজিতের প্রশ্ন ঃ ভগবান বুদ্ধ এ প্রশ্নের উত্তর দেন নি কেন ?

ক্ষেমার প্রতি প্রশ্ন ঃ আপনি এমন কাউকে কি জানেন, যিনি গঙ্গার বালুকা ও সমুদ্রের জলবিন্দু গণনা করতে পারেন ?

প্রসেনজিতের উত্তর ঃ না।

এরপর ক্ষেমা বললেন যে, যদি কেউ পঞ্চস্কন্ধের আকর্ষণ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে তবে সে অসীম অতলস্পর্শ সমুদ্রের আকার ধারণ করে। সুতরাং মৃত্যুর পর উক্তরূপ জীবের পুনর্জন্ম ধারণার অতীত বস্তু।

ক্ষেমার উত্তর শ্রবণ করে কোশলরাজ সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরে গেলেন। পরে একদিন যখন প্রসেনজিৎ বুদ্ধদেবকে ঐ একই বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন এবং উত্তরে বুদ্ধদেব যা বললেন তা ক্ষেমার উত্তরেরই অনুরূপ। এই ঘটনায় ক্ষেমার জ্ঞানের গভীরতা উপলব্ধি করে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়েছিলেন। (Samyutta, IV, 374 ff)

পালি সাহিত্যের অন্তর্গত মধ্যম নিকায় (মধ্যম নিকায়) গ্রন্থে ধম্মদিন্না নামে দর্শন শাস্ত্রে সুপণ্ডিতা এক মহিলার উল্লেখ পাওয়া যায়। ধম্মদিন্না বৌদ্ধ-ভিক্ষুণী ছিলেন। তাঁর স্বামী বিশাখও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন। একদিন বিশাখ ধম্মদিন্নার দার্শনিক জ্ঞানের গভীরতা সম্বন্ধে জানতে কৌতূহলী হয়ে ধম্মদিন্নার নিকট উপস্থিত হন এবং বৌদ্ধদর্শনের অন্তর্গত (নিম্নলিখিত) কয়েকটি বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, যথা ঃ

---

60 Paramattha Dipani, Vol, 1, pp,127–128,

61 "বিনয় পিটকে সংঘের নিয়ম-কানুন এবং ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের দৈনন্দিন জীবনের অবশ্য পালনীয় আচার-ব্যবহার লিপিবদ্ধ আছে। • এটি শীল বিষয়ক—শীলই এর প্রধান বিষয়বস্তু।"
বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম, ডঃ শ্রী অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৯৮।

(ক) সক্কায নিরোধ (—দেহের বিনাশ)

(খ) সক্কায দিট্‌ঠি (—দেহকে আত্মা বলে বিশ্বাস)

(গ) অরিয অট্‌ঠঙ্গিক মগ্‌গো (—আর্য[62] অষ্টাঙ্গিক মার্গ[63])

(ঘ) সংখার (— সংস্কার)

(ঙ) নিরোধ সমাপত্তি এবং

(চ) বেদনা।

ধম্মদিন্না বিশাখের প্রত্যেকটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়েছিলেন। ধম্মদিন্নার প্রদত্ত উত্তরগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করা হল ঃ

(ক) পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ (রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান) দ্বারা সক্কায অর্থাৎ দেহ নির্মিত।

(খ) তৃষ্ণা (তণ্‌হা) বা আকাঙ্ক্ষা ধ্বংসের অর্থ সক্কায় নিরোধ।

(গ) শ্রেষ্ঠ আটটি পথ, যথা ঃ

সম্যক্ দৃষ্টি— চতুরার্যসত্য ও প্রতীত্যসমুৎপাদের জ্ঞান।

সম্যক্ সঙ্কল্প— রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও কামগুণ পরিহার করা এবং মৈত্রী ও করুণাভাব উৎপাদন করা।

সম্যক্ বাক্য— মিথ্যাকথা, কটুভাষণ, মর্মচ্ছেদী বাক্য ও নিরর্থক আলাপ হতে বিরত থাকা।

সম্যক্ কর্ম— জীবহত্যা, চৌর্য ও ব্যভিচার থেকে বিরত থাকা।

সম্যক্ জীবিকা— অসদুপায়ে জীবনযাপন না করে সৎ জীবিকার দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করা।

সম্যক্ ব্যায়াম— অনুৎপন্ন পাপ পরিহার ও কুশলের উৎপাদন এবং উৎপন্ন কুশলের স্থিতি ও বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা।

সম্যক্ স্মৃতি— কায় ও মনের ধর্মসমূহ সর্বদা স্মরণ রাখা।

সম্যক্ সমাধি— সপ্তাঙ্গ সমন্বিত চিত্তের একাগ্রতাই সম্যক্ সমাধি।

এই আটটি শ্রেষ্ঠ পথ (অট্‌ঠঙ্গিক মগ্‌গো) অনুশীলনের দ্বারা সক্কায় নিরোধ বা নির্বান লাভ করা যায়।

(ঘ) বেদনা ও সংজ্ঞা ব্যতীত শ্রদ্ধা, প্রীতি, জ্ঞান কিংবা লোভ, দ্বেষ, মোহ প্রভৃতি পঞ্চাশ প্রকার সৎ ও অসৎ মনোবৃত্তিকে সংখার (সংস্কার) বলা হয়।

---

62. অর্য — শ্রেষ্ঠ, চলন্তিকা, রাজশেখর বসু, পৃঃ ৬০।

63. "অঙ্গ—অবয়ব, উপকরণ প্রভৃতি। আটটি অঙ্গ (বা সাধনার উপায়) আছে বলে অষ্টাঙ্গিক বলা হয়।"

বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম, ডঃ শ্রী অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৪২।

(ঙ) নিরোধ সমাপত্তি হল, আধ্যাত্মিক জগতের ধ্যানের এক স্তর। যে স্তরে উন্নীত হলে মানবের মানসিক সুখ-দুঃখ বোধের বিনাশ সাধিত হয়।

(চ) ইন্দ্রিয় ও বিষয় এই দুইয়ের সংযোগজনিত সুখ-দুঃখের অনুভূতিকে বেদনা বলা হয়। এই বেদনা তিন প্রকার, যথা : (১) সুখ, (২) দুঃখ এবং (৩) (সুখ ও দুঃখের মধ্যস্থিত অনুভূতি) অসুখ-অদুঃখ।

পরে বিশাখ একদিন উক্ত প্রসঙ্গ বুদ্ধদেবের নিকট উত্থাপন করলে বুদ্ধদেব বললেন যে, জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য এই দুই বিষয়েই ধর্ম্মদিন্না সমান অভিজ্ঞা। ধর্ম্মদিন্না বিশাখের প্রশ্নের সঠিক উত্তরই দিয়েছেন। বিশাখ যদি বুদ্ধদেবকে ঐ প্রশ্নগুলি করতেন তবে বুদ্ধদেব প্রদত্ত তার উত্তরও ধর্ম্মদিন্নার প্রদত্ত উত্তরের অনুরূপই হত[64]।

পালি সাহিত্যের অন্তর্গত দীপবংস গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে সিংহলের (আধুনিক শ্রীলঙ্কা) অনুরাধাপুরে উচ্চশিক্ষিতা বহু বৌদ্ধভিক্ষুণী বিনয়, অভিধর্ম ও সূত্রপিটকের অন্তর্গত অনেকগুলি গ্রন্থের অধ্যাপনা করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। অনুরাধাপুরের বৌদ্ধভিক্ষুণী শিক্ষিকাগণের মধ্যে বিনয়ে বিশারদা সংঘমিত্রা[65] (সংঘমিত্তা) ত্রিবিদ্যা[66] লাভ করেছিলেন এবং যাদুবিদ্যাতেও পারদর্শিনী ছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ভিক্ষুণী সংঘে অপরাবিদ্যা বা তির্যক বিদ্যা বিষয়ক শিক্ষাদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল, এমনকি উক্ত বিদ্যা সম্বন্ধে কোনো প্রকার পুস্তকাদি পাঠ করাও ভিক্ষুণী সংঘের নিয়মানুসারে অপরাধ বলে গণ্য করা হত[67]। কিন্তু দীপবংস গ্রন্থে থেরী সংঘমিত্রা ও থেরী উৎবা যাদুবিদ্যার পারদর্শিনী ছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে[68]। কিন্তু তাঁরা কি ভাবে উক্ত বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন সে বিষয়ে দীপবংস বা পালিসাহিত্যের অন্তর্গত অন্য কোনো গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায় না। থেরী সংঘমিত্রার মত থেরী অঞ্জলি বিনয়পিটকের পাঁচখানি ও অভিধর্ম পিটকের সাতখানি গ্রন্থের অধ্যাপনা করতেন। থেরী সংঘমিত্রার নিকট রাণী অনুলা তাঁর পাঁচশত সঙ্গিনী সহ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন[69]। দীপবংস গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, থেরী অঞ্জলি ষোলহাজার ভিক্ষুণী সহ

---

64 Paramathadipani, Vol V, pp 101—102 P T S ; মধ্যমনিকায়, চুল্লবেদল্লসুত্ত।

65 Macavamsa (Ed by W Giger), Ch XV, p 89

66 'অর্হত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ তিনটি বিদ্যায় পারদর্শী হন, যথা, পূর্বনিবাসানুস্মৃতি, পরচিত্ত-বিভাজন জ্ঞান ও আস্রব ক্ষয়জ্ঞান।"

মিলিন্দ প্রশ্ন (বঙ্গানুবাদ), ধর্মাধার মহাস্থবির, পৃঃ ৪২০।

67 ভিক্খুনী পাতিমোক্খ, পাচিত্তিয়া ধম্মা, ৪৯ ও ৫০।

68 বৌদ্ধ রমণী, ডঃ শ্রী বিমলাচরণ লাহা, পৃঃ ৮৬।

69 Dipavamsa, Ed by W Giger, Chapter XVIII.

অনুরাধাপুরে গমন করেছিলেন। দীপবংশ গ্রন্থ পাঠে একথাও জানা যায় যে, সীবলা, মহীরুহা, সমুদ্রনাভা, হেমা, অগ্নিমিত্রা, চুলনাগা, সোনা, মহাতিষ্যা, মহাসুমনা, প্রসাদপালা এবং আরও বহু প্রতিভাময়ী নারী বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনে ও পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন এবং তাঁরা সকলেই অনুরাধাপুরে অধ্যাপনা করতেন[70]।

ব্রহ্মদেশের অরিমর্দন নগরের মহিলারা যে রীতিমত শিক্ষিতা ছিলেন, সে বিষয়ের উল্লেখ পালি সাহিত্যের অন্তর্গত শাসনবংশ (সাসনবংশ) নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়। উক্ত নগরের মহিলারা অতি আগ্রহের সঙ্গে সমগ্র ত্রিপিটক অধ্যয়ন করতেন এবং বহু সূত্রান্ত মুখস্থও করতেন। সাংসারিক কারণে অধ্যয়নে বিঘ্ন ঘটলে তাঁরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হতেন। উক্ত নগরের সাধারণ একটি গ্রাম্য বালিকার ব্যাকরণ শাস্ত্রে জ্ঞানের যে পরিচয় শাসনবংশ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে এই প্রসঙ্গে সেই কাহিনীর উল্লেখ করা যায়—'অরিমর্দন নগরের মাতৃজাতিরাও (মাতুগাম) ব্যাকরণ শাস্ত্রে অতি দক্ষা' এই বাক্যের সত্যতা পরীক্ষার্থে রতনপুর নিবাসী এক শ্রমণ যখন অরিমর্দন নগরের অভিমুখে যাচ্ছিলেন তখন পথ পার্শ্বস্থ এক কার্পাসক্ষেত্র প্রহররতা এক বালিকা উক্ত শ্রমণটিকে তিনি কোন স্থান থেকে আগমন করছেন এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় শ্রমণটি 'উত্তমপুরুষ' শব্দ যোগের পরিবর্তে 'প্রথমপুরুষ' শব্দযুক্ত বাক্যে বালিকাটির প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। এতে উত্তরদাতার ব্যাকরণ জ্ঞানের স্বল্পতা বুঝে বালিকাটি মৃদু তিরস্কারসহ শ্রমণটির বাক্যের ব্যাকরণগত ভ্রম সংশোধন করে দিয়েছিল। ফলে, দরিদ্রগৃহের সাধারণ একটি বালিকার ব্যাকরণ শাস্ত্রে জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে লজ্জিত শ্রমণটি অরিমর্দন নগরের মাতৃজাতির ব্যাকরণ শাস্ত্রের জ্ঞান পরীক্ষা করার ইচ্ছা ত্যাগ করে সেই স্থান থেকেই স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন[71]।

শিক্ষাকে যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে যে সত্য-জ্ঞান লাভ হয়, সেই সত্য-জ্ঞানের উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি জগতের যে কোনো অসম্ভব কার্যকে আপন ইচ্ছাশক্তি বলে সম্ভব করতে পারেন। এই প্রসঙ্গে মিলিন্দ প্রশ্ন (মিলিন্দ পঞহ) গ্রন্থে বারবণিতা বিন্দুমতীর উপাখ্যান উপস্থাপন করা হয়েছে। এই উপাখ্যানে বলা হয়েছে—সত্যজ্ঞানের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিতা বিন্দুমতীর ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে গঙ্গার স্রোত বিপরীত মুখে প্রবাহিত হয়েছিল[72]।

---

70. Ibid.

71 শাসন বংশ (বঙ্গানুবাদ), ধর্মাধার মহাস্থবির, পৃঃ ১০৯—১১০।

72 মিলিন্দ প্রশ্ন (বঙ্গানুবাদ), ধর্মাধার মহাস্থবির, পৃঃ ১৩১ ১৩২।

থেরীগাথা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ কয়েকটি গাথার[73] মাধ্যমে জানা যায় যে, শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা থাকলে একজন সামান্য ক্রীতদাসীও তার শিক্ষাদীপ্ত যুক্তির দ্বারা অপরের ভ্রান্ত ধারণার পরিবর্তন করে তাকে স্বমতে আনতে সক্ষম হতে পারে। পূর্ণা (পুণ্ণা বা পুন্নিকা) ছিলেন অনাথপিণ্ডিকের[74] এক ক্রীতদাসীর পুত্রী। একদা বুদ্ধদেবের 'সিংহনাদ' নামে খ্যাত ধর্মোপদেশ শ্রবণ করে পূর্ণা বৌদ্ধধর্মে শ্রদ্ধাবতী[75] হন। জলাশয় থেকে জল আনা পূর্ণাদাসীর ছিল নিত্যকর্ম। শীতকালের একদিন তিনি যখন জল আহরণের জন্য জলাশয়ে যান তখন উদকশুদ্ধিক (স্নানের দ্বারা সর্বপাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায় এই ধারণা পোষণকারী) নামক এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। পূর্ণা উক্ত ব্রাহ্মণের সংস্কার যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করে তাঁকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণে স্বীকৃত করতে সমর্থা হয়েছিলেন। ফলে পূর্ণা এত সুখ্যাতি অর্জন করেন যে, অনাথপিণ্ডিক প্রীত হয়ে তাঁকে ক্রীতদাসীত্ব থেকে মুক্তিদান করেন। ক্রীতদাসীত্ব থেকে মুক্তিলাভ করে ভবচক্র (পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যু) থেকে মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণা-ভিক্ষুণী সংঘে প্রবেশ করেন এবং স্বীয় সাধনবলে প্রতিসম্ভিদা[76] (পটিসম্ভিদা) সহ অর্হত্ব প্রাপ্তা হন[77]।

ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল থেকে সঙ্গীতের (নৃত্য-গীত-বাদ্য) সমাদর আছে। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাগুরুগণের মতে—তপস্যার সঙ্গে সঙ্গীতের কোনো বিরোধ নেই[78]। প্রাক্‌ বৌদ্ধযুগের সমাজ ব্যবস্থাপকগণও নারীদের জন্য দর্শন, পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতি বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে শিল্প-সংস্কৃতি মূলক চৌষট্টি প্রকার কলাবিদ্যা

73 থেরীগাথা, গাথা সংখ্যা ২৩৭—২৫০।

74 অনাথপিণ্ডিক—এঁর প্রকৃত নাম সুদত্ত। সুদত্ত শ্রাবস্তী নগরের এক ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠী ছিলেন। দরিদ্রের পিণ্ড (—অন্ন) দাতা বা পালনকর্তারূপে ইনি অনাথপিণ্ডক বা অনাথপিণ্ডদ নামে খ্যাত। বুদ্ধদেবের গৃহী উপাসকদের মধ্যে অনাথপিণ্ডিক সর্বশ্রেষ্ঠ রূপে সম্মানিত।

75 Paramattha Dipani, Vol V, P T S, pp 199–200

76 প্রতিসম্ভিদা (পালি—পটিসম্ভিদা), প্রতি—প্রম+ভিদ ধাতু নিষ্পন্ন শব্দ অর্থাৎ লোকোত্তর মার্গাদি বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তি। প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান চার প্রকার: অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি এবং প্রতিভান প্রতিসম্ভিদা।

পটিসম্ভিদা মগ্গো (প্রতিসম্ভিদা মার্গ) পৃঃ ৪১৫।

77 থেরীগাথা (বঙ্গানুবাদ), ভিক্ষু শীলভদ্র, পৃঃ ১০।

78 প্রাচীন ভারতে নারী, শ্রী ক্ষিতিমোহন সেন, পৃঃ ২৩।

শিক্ষারও[79] ব্যবস্থা দিয়েছিলেন। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উক্ত চৌষট্টি প্রকার কলা-বিদ্যার অন্তর্গত রূপে উল্লেখ করা হয়েছে, যথা :

নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি সঙ্গীতশাস্ত্র বিষয়ক
অভিনয় প্রভৃতি নাট্যশাস্ত্র বিষয়ক
পুষ্পসজ্জা বিষয়ক
মাল্যগ্রন্থন বিষয়ক
উদ্যান রচনা বিষয়ক
সৌন্দর্য বর্ধক অঙ্গরাগাদি প্রভৃত বিষয়ক
পোষাক-পরিচ্ছদ ও সূক্ষ্ম সূচীশিল্প বিষয়ক

ইন্দ্রজাল বা যাদুবিদ্যা, ভোজবিদ্যা এবং প্রহেলিকাময় বাক্য (ধাঁধা) সৃষ্টির কৌশল বিষয়ক

শস্ত্র (তলোয়ার, সড়কী, বর্শা প্রভৃতি) চালনা ও ধনুর্বিদ্যা বিষয়ক
শরীরচর্চা (ব্যায়াম) ও ভৈষজ শাস্ত্র বিষয়ক
রসায়ন শাস্ত্র বিষয়ক

গৃহসজ্জা (আসবাবাদি), কক্ষতল ও কক্ষপ্রাচীর অলংকরণ, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও মৃৎশিল্প বিষয়ক।

ইতর প্রাণী দিগকে শিক্ষিত করার জন্য (মেষ, তিত্তির পক্ষী ও মোরগকে লড়াইয়ে প্রস্তুত করার জন্য এবং ময়না, তোতা প্রভৃতি পক্ষীদের 'বুলি' শেখানর জন্য দেয় শিক্ষা) নানাবিধ শিক্ষাপ্রণালী বিষয়ক।

সাংকেতিক লিখন প্রণালী ও বিভিন্ন ভাষা বিষয়ে শিক্ষা, চিত্রাংকন (মনুষ্য প্রতিকৃতি, নৈসর্গিক চিত্র, গৃহ প্রাচীর গাত্র চিত্র ইত্যাদি) বিদ্যা বিষয়ক।

পালি সাহিত্যের অন্তর্গত বিমানবত্থুট্ঠকথা[80] গ্রন্থে প্রায় ষাট হাজার প্রকার বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। এতে ধারণা করা যায় যে, তৎকালীন সমাজে সঙ্গীত যথেষ্ট সমাদরের সঙ্গে গৃহীত হত।

নারীদের বিবাহের পূর্বে পিতৃগৃহে এবং বিবাহের পরে পতিগৃহে (অবশ্য পতির অভিরুচি অনুযায়ী) কামসূত্র ও তদঙ্গবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা সমাজশাস্ত্রকারগণ দিয়েছেন। বৌদ্ধযুগেও নারীরা চৌষট্টি কলাবিদ্যার অন্তর্গত সঙ্গীত শাস্ত্রও শিক্ষা করতেন[81]। তবে পালিসাহিত্য পাঠে মনে হয়, সম্ভবতঃ সঙ্গীতাদি শাস্ত্র

79. Education in Ancient India, Dr A S Altekar, p 329
Cf. The wonder that was India, A L Basham p 183.
80. Paramattha Dipani, Vol II, pp 93—94. P. T. S.
81. 'Music and dancing were the two allied subjects in which women held

শিক্ষা গৃহস্থকন্যাগণ অপেক্ষা বারনারী বা বারবণিতা রূপে চিহ্নিতা সমাজের অন্তর্গত নারীগণই অধিক চর্চা করতেন। কারণ উচ্চশ্রেণীর বারাঙ্গনারূপে স্বীকৃতি লাভ করতে হলে শুধু দেহগত রূপ-যৌবনই যথেষ্ট নয়, ঐ সঙ্গে নানাবিধ কলাবিদ্যাতেও পারদর্শিনী হওয়া প্রয়োজন।

থেরী গাথা গ্রন্থে উল্লিখিত থেরীগণের মধ্যে অভয়মাতা[82] (পদ্মাবতী বা পদুমাবতী), বিমলা[83], অর্ধকাশী[84], (অড্ঢকাসি) এবং আম্রপালী[85] (অম্বপালী) এই চারজন তাঁদের লৌকিকজীবনে বারাঙ্গনা ছিলেন। শেষোক্ত তিনজনের (বিমল, অর্ধকাশী, আম্রপালী) রচিত (থেরী গাথা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ) গাথাগুলি পাঠ করলে জানা যায় যে, তাঁরা তিনজনেই অতুল সম্পদের অধিকারিণী, উচ্চশ্রেণীর বারবিলাসিণী নারী ছিলেন। সুতরাং উক্ত তিনজন নারীই যে চৌষট্টি কলাবিদ্যার অন্তর্গত সঙ্গীত, শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ক নানা বিদ্যায় সুনিপুণা ছিলেন একথা বলা যায়।

উক্ত চারজন বারনারী যখন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে পরাবিদ্যা শিক্ষার্থিণী রূপে ভিক্ষুণী-সংঘভুক্তা হলেন তখন ভিক্ষুণী সংঘের নিয়মানুযায়ী তাঁদের লৌকিক জীবনের পরিচয় লুপ্ত হয়ে কেবল মাত্র 'ভিক্ষুণী' নামে তাঁরা চিহ্নিত হলেন। তাঁরা চারজনই নিজ নিজ সাধন বলে পরাবিদ্যা শিক্ষার জগতে সর্বোচ্চস্তরে উন্নীতা হতে সমর্থা হয়েছিলেন।

---

away in those days Whenever a reference is made in praise of woman, she is invariably referred to as skilled in singing and dancing (kusala naccagitesu)".
Pre--Buddhist India, Patilal N. Mehta, p 277

82 Paramattha Dipani, Vol V, p 39, P. T S
83. Ibid pp 76--77 P T S.
84 Ibid pp 30--31 P. T S
85. Ibid p 135 P. T S.

তৃতীয় অধ্যায়

॥ ভিক্ষুণী সংঘ ॥

সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর বুদ্ধদেব বারাণসীর[1] মৃগদাবে[2] তাঁর পূর্বপরিচিত পাঁচজন সন্ন্যাসীর কাছে তাঁর নবলব্ধ তত্ত্বজ্ঞান প্রথম প্রচার করেন[3]। বুদ্ধদেব প্রচারিত এই তত্ত্বজ্ঞানই পালি সাহিত্যে ধম্মচক্ক পবত্তন সুত্ত[4] (ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র) নামে খ্যাত। বুদ্ধদেবের শ্রীমুখ নিঃসৃত এই তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণ করে উক্ত পঞ্চসন্ন্যাসী বুদ্ধদেবের নিকট প্রব্রজ্যা (পব্বজ্জা) গ্রহণ করেন। পরে বারাণসীর জনৈক ধনবান শ্রেষ্ঠীর পুত্র (সেট্‌ঠী পুত্র) যশ বা যশোদা এবং তাঁর চুয়ান্নজন বন্ধু সকলেই গৃহত্যাগ করে বুদ্ধদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। উক্ত পঞ্চসন্ন্যাসী, যশ এবং যশের চুয়ান্নজন বন্ধু—এই ষাটজন শিষ্য নিয়ে বুদ্ধদেব তাঁর ভিক্ষুসংঘ প্রতিষ্ঠা করলেন। বুদ্ধদেব প্রতিষ্ঠিত এই ভিক্ষুসংঘই জগতের ধর্মের ইতিহাসে সর্ব প্রথম বিধিবদ্ধ সংঘরূপে সম্মানিত[5]।

বুদ্ধদেবপ্রচারিত ধর্ম কোনো অন্ধবিশ্বাসের[6] ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তিনি তাঁর ধর্মসংঘে দেহগত শুদ্ধাশুদ্ধ, জন্ম-কর্মগত পদ গৌরব বা অগৌরব, হীনতা ও

---

1 প্রাচীন কাশী রাজ্যের রাজধানী। ষোড়শ মহাজনপদ অর্থাৎ অঙ্গ, মগধ, কাশী, কোশল, বৃজি, মল্ল, চেদি, বৎস, কুরু, পাঞ্চাল, মৎস, শূরসেন, অশ্মক, অবন্তী, গান্ধার ও কম্বোজ— এই ষোলটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যগুলির মধ্যে কাশী সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী রাজ্য ছিল। বুদ্ধদেবের সময়ে কাশী রাজ্য কোশলরাজ্যের অধীনে আসে।

বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম, ডঃ শ্রী অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ২

2 বর্তমান সারনাথ।

3 পালিসাহিত্যে এই পাঁচজন সন্ন্যাসী পঞ্চবগ্গিয় (পঞ্চবর্গীয়) ভিক্খু নামে পরিচিত। এই পাঁচজন সন্ন্যাসী ছিলেন - কোণ্ডঞ্ঞো (কৌণ্ডিন্য), বপ্প (বপ্র), ভদ্দিয় (ভদ্রীয়), অসসজি (অশ্বজিৎ) এবং মহানাম। মহাবগ্গো, ১ ৬, ১৩—১৯, নালন্দা সংস্করণ।

4 ধম্মচক্কপবত্তন সুত্তটি পালি সাহিত্যের মহাবগ্গো (মহাবর্গ) ও সংযুত্ত (সংযুক্ত) নিকায় নামক গ্রন্থদ্বয়ে লিপিবদ্ধ আছে। তবে মহাবগ্গো গ্রন্থে শাক্য রাজকুমার সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি থেকে আরম্ভ করে পঞ্চবগ্গিয় ভিক্খুর নিকট তাঁর ধর্মদেশনা পর্যন্ত ঘটনার বিবরণ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সংযুত্ত নিকায় গ্রন্থে মাত্র উক্ত সূত্রটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

5 বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম, ডঃ শ্রী অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৩০।

6. বুদ্ধের ধর্ম ও শাসন, ধর্মাধার মহাস্থবির, পৃঃ ৮৯।

প্রভেদ সৃষ্টিকারী দৃষ্টিভঙ্গি, যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান প্রভৃতি বিষয় গুলিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেছেন। 'ধর্মচক্র' থেকে আরম্ভ করে তাঁর পরিনির্বান পর্যন্ত সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসর ব্যাপী তিনি যে সকল উপদেশ দিয়েছেন, তার মধ্যে দু একটি বাদে ব্রহ্ম বিষয়ক কোনো উপদেশও নেই এবং তাঁর সংঘের নিয়মাবলীর মধ্যে দেবাচর্নার জন্য কোনো বিধি-ব্যবস্থার উল্লেখও দেখা যায় না[7]। বুদ্ধদেব গণতান্ত্রিক[8] ভিত্তিতে তাঁর ভিক্ষুসংঘ গঠিত করেছিলেন। সংঘভুক্ত ভিক্ষুরা সকলেই সংঘের সদস্য ছিলেন এবং সংঘের অন্তর্গত সর্বপ্রকার কার্যাবলীর আলোচনা কালে তাঁদের প্রত্যেকেরই স্বাধীন মতামত প্রকাশ করবার অধিকারও ছিল, বিভিন্ন বর্ণের শলাকার মাধ্যমে সদস্যগণের মতামত সংগ্রহ করা হত। এই ভাবে সংগৃহীত মতামতের ভিত্তিতে বিতর্কিত বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হত। উক্ত রীতিকে পালি-সাহিত্যে যেভুয্যসিকা[9], বলা হয়েছে।

বুদ্ধদেব প্রথমে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের জন্য সংঘ স্থাপন করেন। পালি সাহিত্য পাঠে বুদ্ধদেবের সমকালীন অন্য ধর্মসম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের অস্তিত্বের কথা জানা যায়, কিন্তু নারীগণের সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ সম্বন্ধে (পক্ষে বা বিপক্ষে) বুদ্ধদেবের ব্যক্তিগত কোনো মন্তব্যের কথা জানা যায় না। তবে তিনি যে বৌদ্ধ ভিক্ষুণী সংঘ স্থাপনে অত্যন্ত অনিচ্ছুক ছিলেন এবং শেষে আনন্দের[10] যুক্তিতর্কের প্রভাবে বৌদ্ধভিক্ষুণী সংঘ স্থাপনে অনুমতি দিয়েছিলেন তাঁর বিস্তৃত বিবরণ পালি চুলবগ্গো (চুল্লবর্গ) গ্রন্থে পাওয়া যায়।

শাক্য রাজকুমার সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্ব লাভের পাঁচ বৎসর পর তাঁর পিতা শুদ্ধোদনের মৃত্যু[11] হয়। এই ঘটনার পরই রোহিনী নদীর জল সেচনের ব্যবস্থা নিয়ে শাক্য ও কোলিয়দের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হলে সেই বিবাদের মীমাংসা করেন স্বয়ং বুদ্ধদেব[12]। এই বিবাদের মীমাংসার পর বুদ্ধদেব যখন কপিলাবস্তুর

7 বৌদ্ধধর্ম, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ২।

8 Early Monastic Buddhism, Vol 1, Dr Nalinaksha Dutt, p 135

9 "যস্মা কিম্মায ধম্মবাদিনো বহুতরা যেভুয্যসিকা নাম" চুল্লবগ্গো (নালন্দা সংস্করণ) ৪. ৯

10 বুদ্ধদেবের খুল্লতাত অমিতোদনের পুত্র আনন্দ ছিলেন একনিষ্ঠ বুদ্ধ সেবক। মহাপরিনিব্বান সুত্তে (৫ ৩৬ ৩৮) লিপিবদ্ধ আনন্দ সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের উক্তি থেকে জানা যায় যে, সেবা, পরিচর্যা, নিষ্ঠা, পাণ্ডিত্য, মেধা, মৈত্রীভাব প্রভৃতি নানা সদ্গুণে গুণান্বিত ছিলেন আনন্দ।

Dictionary of Pali Proper Names, p 244

11 The Life of Buddha, J Thomas, p 107

12 Ibid ; জাতক, ৫ম, পৃঃ ৪১২

(কপিলবথ্যু) নিগ্রোধারামে অবস্থান করছিলেন, সেই সময় একদিন বুদ্ধদেবের বিমাতা মহাপ্রজাবতী গোতমী (মহাপজাপতি গোতমী) সেই স্থানে উপস্থিত হয়ে বুদ্ধদেবকে সসম্মান অভিবাদন জানালেন এবং বিনীতভাবে বললেন যে, নারীরাও যাতে গৃহজীবন ত্যাগ করে গৃহহীন জীবন (সন্ন্যাসজীবন) গ্রহণ করে তথাগতের উপদেশিত ধর্ম-বিনয় অনুশীলন করতে পারেন তার জন্য বুদ্ধদেব যেন তাঁর অনুমতি প্রদান করেন[13]।

মহাপ্রজাবতীর গোতমীর কথার উত্তরে বুদ্ধদেব বললেন যে, নারীগণের সংসার ত্যাগ করে ভিক্ষুণীজীবন (সন্ন্যাসিনী জীবন) গ্রহণ করার জন্য মহাপ্রজাবতী গোতমী যেন বুদ্ধদেবের অনুমতি প্রার্থনা না করেন। কিন্তু বুদ্ধদেবের এই উক্তিতে নিরস্ত না হয়ে মহাপ্রজাবতী গোতমী আরও দুবার ঐ একই প্রার্থনা জানালেন, এবং বুদ্ধদেবও প্রতিবারই ঐ একই উত্তর দিলেন'। বুদ্ধদেব কর্তৃক এইভাবে প্রত্যাখ্যাতা হয়ে ভগ্নমনোরথা মহাপ্রজাবতী গোতমী বুদ্ধদেবকে অভিবাদন জানিয়ে অশ্রুপূর্ণ লোচনে রাজপ্রাসাদে ফিরে গেলেন। এই ঘটনার অনতিবিলম্বে বুদ্ধদেব কপিলাবস্তু ত্যাগ করে বৈশালী (বেসালী) নগরে চলে যান।

বৈশালী[14] নগরের উপকণ্ঠে মহাবন[15] কূটাগার শালায় বুদ্ধদেব তখন অবস্থান করছেন—এই সংবাদ পেয়ে মহাপ্রজাবতী গোতমী মস্তকমুণ্ডন করে (কেসে ছেদাপেত্বা) কাষায়বস্ত্র পরিধান করে (কাসায়ানি বথ্থানি অচ্ছাদেত্বা), বুদ্ধদেবের সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাতের অভিলাষে বহু শাক্যরমণী সহ (সম্বহুলাহি সাকিযানীহি

---

13 'সাধু, ভন্তে, লভেয্য মাতুগামো তথাগতপ্পবেদিতে ধম্ম-বিনযে অগারস্মা অনগারিযং পব্বজ্জংতি।

চুল্লবগ্গো, ১০ ১, ১, নালন্দা সংস্করণ।

14 আটটি জাতির (অট্ঠকুল) মিলিত শক্তিতে গঠিত ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গণরাজ্য লিচ্ছবি গণরাজ্যের রাজধানী ছিল বৈশালী নগর।

বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম, ডঃ শ্রীঅনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১৪৬।

উল্লেখ্য : ভারতবর্ষ বৃটিশশাসনভুক্ত হওয়ার পর বৈশালী নগর বেসার নামে পরিচিত ছিল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের বিহার রাজ্যসরকার মজফফরপুর জেলার অন্তর্গত উক্ত নগরটির বেসার নাম পরিবর্তন করে পুনরায় বৈশালী নামে তাকে চিহ্নিত করেছেন।

15. "গোশৃঙ্গী নামে জনৈক বৌদ্ধ—উপাসক বৈশালীর অবিদূরস্থ এক প্রকাণ্ড শালবনে বিহার নির্মাণ পূর্বক তাহা (বৌদ্ধ সংঘে) দান করিয়াছিলেন। ভগবান (বুদ্ধ) মধ্যে মধ্যে তথায় অবস্থিতি করিতেন"। মহাপরিনিব্বান সুত্তং (মূলসহ বঙ্গানুবাদ) রাজগুরু শ্রীধর্মরত্ন মহাস্থবির, পৃঃ ৬১।

সম্ধিং) কপিলবস্তু থেকে পদব্রজে বৈশালী নগরের অভিমুখে যাত্রা করলেন। যখন তিনি তাঁর গন্তব্যস্থলে পৌঁছলেন তখন তাঁর শারীরিক অবস্থা হয়ে উঠেছে শোচনীয়—পদব্রজে দীর্ঘপথ অতিক্রমণের ফলে তাঁর সর্বাঙ্গ ধূলায় ধূসরিত, ক্ষত-বিক্ষত এবং ধূলাকীর্ণ, চরণযুগল স্ফীত, ক্লান্তিতে দেহ অবসন্ন এবং মানসিক আবেগে চিত্তও হয়ে উঠেছে বিক্ষিপ্ত ও ক্লিষ্ট ; তাঁর সঙ্গিনীদের শারীরিক অবস্থা প্রায় তদনুরূপ। দেহ মনের এই অবস্থায় কুটাগারশালার বহির্দ্বারের সম্মুখে দণ্ডায়মানা মহাপ্রজাবতী গৌতমী রোদন করতে লাগলেন[16]। এমন সময় আনন্দ মহাপ্রজাবতী গৌতমীকে ঐ অবস্থায় দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে মহাপ্রজাবতী গৌতমী আনুপূর্বিক সকল বৃত্তান্ত আনন্দকে জানালেন। সকল সংবাদ অবগত হয়ে করুণায় বিগলিতচিত্ত আনন্দ মহাপ্রজাবতী গৌতমীকে ঐ স্থানেই অপেক্ষা করতে বলে কুটাগারশালার মধ্যে প্রবেশ করে বুদ্ধদেবের সমীপে উপস্থিত হলেন এবং যথাবিধি সম্মান প্রদর্শন করে বিনীতভাবে মহাপ্রজাবতী গৌতমীর প্রার্থনা পূর্ণ করার জন্য বুদ্ধদেবের নিকট আবেদন জানালেন এবং এই সঙ্গে মহাপ্রজাবতী গৌতমীর বর্তমান মানসিক ও শারীরিক অবস্থারও উল্লেখ করলেন। কিন্তু বুদ্ধদেব তাঁর এই আবেদন গ্রাহ্য করতে অসম্মত হলেন। আনন্দ আরও দুবার মহাপ্রজাবতী গৌতমীর প্রার্থনা পূর্ণ করার জন্য বুদ্ধদেবকে অনুরোধ করলেন। কিন্তু বৃথা, বুদ্ধদেব কোনো প্রকারেই নারীজাতিকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে সংঘে প্রবেশের অনুমতি দিলেন না। বুদ্ধিমান আনন্দ তখন অন্য উপায়ে (অঞ্ঞেন পি পরিযায়েন) বুদ্ধদেবের অনুমতি লাভের চেষ্টায় তাঁকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন যে, নারীজাতি যদি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে তথাগতের নির্দেশিত পথে সংযম ও নিষ্ঠা সহকারে অনুশাসনগুলি পালন করে চলেন, তবে তাঁরা স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হত্ত্ব ফল লাভ করতে পারেন কিনা ?

আনন্দের এই প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধদেব জানালেন যে, প্রব্রজিতা নারী তথাগতের উপদেশিত ধর্ম-বিনয় (ধর্ম ও শিক্ষা বা উপদেশ, অনুশাসন) অনুশীলন করলে উক্ত চতুর্বিধ ফলই লাভ করতে পারেন[17]। বুদ্ধদেবের এই স্বীকৃতিতে হৃষ্টচিত্ত আনন্দ

---

16 অথখো মহাপজাপতী গোতমী সূনেহি পাদেহি রজোকিন্নেন গত্তেন দুক্খী দুম্মনা অস্সুমুখী রুদমানা বহিদ্বারে কোট্ঠকে অট্ঠাসি।

চুল্লবগ্গো ১০ ১, নালন্দা সংস্করণ।

17. 'ভব্বো, আনন্দ মাতুগামো তথাগতপ্পবেদিতে ধম্ম-বিনয়ে অগারস্মা অনগারিযং পব্বজিত্বা সোতাপত্তিফলং পি সকদাগামীফলং পি অনাগামি ফলং পি অরহত্তফলং পি সচ্ছিকাতুং তি

চুল্লবগ্গো, ১০ ১, নালন্দা সংস্করণ।

আনন্দ নারীগণের সংঘে প্রবেশের জন্য পুনরায় বুদ্ধদেবের অনুমতি প্রার্থনা করলেন এবং মাতৃহীন শিশু সিদ্ধার্থকে মহাপ্রজাবতী গোতমী স্তন্যদানাদি দ্বারা কিরূপ স্নেহযত্নে তাকে লালনপালন করেছিলেন[18] সে কথাও বুদ্ধদেবকে স্মরণ করাতে ভুললেন না। এবার আর বুদ্ধদেব আনন্দের এই প্রার্থনা অগ্রাহ্য করতে পারলেন না, কিন্তু স্পষ্টভাবে তাঁর অনুমতি না জানিয়ে বললেন যে, যদি মহাপ্রজাবতী গোতমী আটটি কঠোর নিয়ম আজীবন পালনের শর্ত স্বীকার করেন তবেই নারীজাতি-সংঘে প্রবেশের অনুমতি লাভ করতে পারবেন[19]।

আনন্দের মাধ্যমে উক্ত সংবাদ শ্রবণ করে উদ্বেলিত চিত্তে মহাপ্রজাবতী গোতমী সঙ্গিনীগণ সহ বুদ্ধদেবের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁকে অভিবাদন জানালেন এবং উক্ত আটটি কঠোর নিয়ম আজীবন পালনের শর্তে স্বীকৃতা হয়ে বুদ্ধদেবের নিকট থেকে নারীজাতির সংঘে প্রবেশের অনুমতি লাভ করলেন। সকল কষ্ট সার্থক হল ভেবে মহাপ্রজাবতী গোতমীর হৃদয় আনন্দ ও তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। অতঃপর বুদ্ধদেব কর্তৃক উপদিষ্টা মহাপ্রজাবতী গোতমী ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করলেন। তাঁর সঙ্গিনী হয়ে যে সকল শাক্যরমণী সেই দিন সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন,

---

উল্লেখ্য : পালিসাহিত্য পাঠে জানা যায় যে, বৌদ্ধ ধর্মে নির্বান (ভববন্ধন থেকে মুক্তি) লাভের জন্য চারটি মার্গ বা স্তরের কথা বলা হয়েছে, যথা :

(ক) সোতাপন্ন মগ্‌গো (স্রোতাপন্ন মার্গ)—যিনি বুদ্ধ-শাসনরূপ স্রোতে প্রবেশ করেছেন এবং পরিনামে তারই সাহায্যে নির্বানরূপ সমুদ্রে উপনীত হবেন তাঁকে সোতাপন্ন বলা হয়। স্রোতাপন্ন ব্যক্তি সাতবার জন্মগ্রহণের পর কর্মপাপ ছিন্ন করে নির্বাণ লাভ করেন।

(খ) সকদাগামিমগ্‌গো (সকৃদাগামী—মার্গ), এই স্তরে উন্নীত ব্যক্তি সকদাগামি নামে অভিহিত হন, এবং এরূপ ব্যক্তি আর একবার জন্মগ্রহণের পর নির্বাণ প্রাপ্ত হন।

(গ) অনাগামিমগ্‌গো (অনাগামী-মার্গ)—এই স্তরে উন্নীত ব্যক্তি আর ইহলোকে জন্ম গ্রহণ করেন না, ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়ে সেই স্থান থেকেই তিনি নির্বাণ লাভ করেন।

(ঘ) অরহত্তমগ্‌গো (অর্হত্বমার্গ)—এই স্তরে উন্নীত ব্যক্তি ইহজন্মেই সর্বতৃষ্ণা (অর্থাৎ সর্ব আকাঙ্ক্ষা) থেকে মুক্ত হয়ে নির্বাণ প্রাপ্ত হন।

উক্ত চার শ্রেণীর ব্যক্তিই প্রথমে মার্গ ও পরে তার ফল প্রাপ্ত হন। এই হিসাবে মার্গ ও ফলভেদে এগুলি আট শ্রেণীতে বিভক্ত এবং এই আট শ্রেণীর সঙ্গে 'নির্বাণ' যুক্ত করে একত্রে 'নবলোকোত্তর ধর্ম' বলা হয়।

18. "বহূপকারা, ভন্তে, মহাপজাপতী গোতমী ভগবতো মাতুচ্ছা আপাদিকা, পোসিকা, খীরস্স দাযিকা, ভগবন্তং জনেত্তিযা কালঙ্কতায থঞ্ঞং পাযেসি ..."

চুল্লবগ্‌গো, ১০. ১, নালন্দা সংস্করণ।

19. ঐ, ১০ ২, " "

বুদ্ধদেব তাঁদের সকলকেই প্রব্রজ্যা দান করলেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পাঁচ বৎসর পর এই ভাবে ভিক্ষুণী সংঘের ভিত্তি স্থাপিত হল[20]।

নারীজাতির ভিক্ষুণী সংঘে প্রবেশের ছাড়পত্র স্বরূপ প্রাগুক্ত আটটি নিয়ম পালিসাহিত্যে অট্ঠগরুধম্মা (অষ্টগুরুধর্ম) নামে খ্যাত। উক্ত আটটি নিয়ম[21] ছিল ঃ

(ক) একশত বৎসর উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীকেও একদিনের উপসম্পদা প্রাপ্ত ভিক্ষুকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

(খ) যে স্থানে কোনো ভিক্ষু নেই, এমন স্থানে কোনো ভিক্ষুণী বর্ষাবাস করতে পারবেন না।

(গ) পাক্ষিক উপোসথের তারিখ ও উপদেশ দানের সময় ভিক্ষু-সংঘ থেকে ভিক্ষুণীকে জেনে নিতে হবে।

(ঘ) বর্ষাবাসের পর প্রবারণা পালনের বিষয় ভিক্ষুসংঘের নিকট ভিক্ষুণীকে প্রকাশ করতে হবে।

(ঙ) ভিক্ষুণী কোনো অপরাধ করলে উভয় সংঘের নিকট মানত্ব ব্রত নিতে হবে।

(চ) দুই বৎসর যাবৎ ছয়টি বিষয়ে শিক্ষাসমাপনান্তে ভিক্ষুণীকে উভয় সংঘের নিকট উপসম্পদা যাচ্ঞা করতে হবে।

(ছ) কোনো ভিক্ষুণী কখনও কোনও ভিক্ষুর নিন্দা করতে পারবেন না।

---

20. Women under Primitive Buddhism,
I. B. Horner, (Introduction) P XXII

21. (ক) বস্সসতুপসম্পন্নায ভিক্খুনিযা তদহুপসম্পন্নস্স ভিক্খুনো অভিবাদনং পচ্চুট্ঠানং অঞ্জলিকম্মং সামীচিকম্মং কাতব্বং।

(খ) ন ভিক্খুনিযা অভিক্খুকে আবাসে বস্সং বসিতব্বং।

(গ) অন্বদ্ধমাসং ভিক্খুনিযা ভিক্খুসংঘতো দ্বে ধম্মা পচ্চাসিংসিতব্বা উপোসথপুচ্ছকং চ ওবাদুপসংকমনং চ।

(ঘ) বস্সং বুত্থায ভিক্খুনিযা উভতোসংঘে তীহি ঠানেহি পবারেতব্বং দিট্ঠেন বা সুতেন বা পরিসংকায বা।

(ঙ) গরুধম্মং অজ্ঝাপন্নায ভিক্খুনিযা উভতোসংঘে পক্খমানত্তং চরিতব্বং।

(চ) দ্বে বস্সানি ছসু ধম্মেসু সিক্খিতসিক্খায সিক্খমানায উভতোসংঘে উপসম্পদা পরিযেসিতব্বা।

(ছ) ন ভিক্খুনিযা কেনচি পরিযাযেন ভিক্খু অক্কোসিতব্বো পরিভাসিতব্বো।

(জ) ভিক্ষুরা ভিক্ষুণীদের উপদেশ দিতে পারবেন কিন্তু ভিক্ষুণীরা কখনই কোনো ভিক্ষুকে উপদেশ দিতে পারবেন না।

নারীদের সংঘে প্রবেশের অনুমতি দিলে পরিণামে তার ফল কি হতে পারে সর্বজ্ঞ বুদ্ধদেব তা জানতেন, এবং জানতেন বলেই তিনি আনন্দকে বলেছিলেন যে, নারী জাতি যদি সংঘে প্রবেশের অনুমতি না পেতেন তবে তাঁর প্রচারিত এই ধর্ম হাজার বৎসর স্থায়ী হত কিন্তু নারীজাতি গৃহজীবন ত্যাগ করে সংঘজীবন গ্রহণ করায় এই ধর্ম পাঁচশত বৎসর স্থায়ী হবে[22]। তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী ফলবতী হওয়ার পক্ষে সম্ভাব্য কারণগুলি কয়েকটি উদাহরণ সহযোগে আনন্দকে বুঝিয়ে বলে শেষে তিনি বললেন যে, প্রব্রজিতা নারীদের দ্বারা প্রব্রজ্যার মর্যাদা যাতে লংঘিত না হয় সেই উদ্দেশ্যে তিনি ভিক্ষুণীদের পক্ষে আজীবন পালনীয় এই অষ্টগুরুধর্মের বিধান দিলেন[23]।

অষ্টগুরুধর্মের প্রসঙ্গে আধুনিক কালের পণ্ডিতগণের মধ্যে কারো মতে—বুদ্ধদেব তাঁর ভিক্ষুদের নৈতিক চরিত্র স্খলনের আশংকায়[24] ভিক্ষুণীদের জন্য আজীবন অষ্টগুরুধর্ম পালনের নিয়ম প্রবর্তন করেছিলেন। আবার কেউ বা বলেছেন—নারীচরিত্র পর্যালোচনা করে বুদ্ধদেব উত্তমরূপে বুঝেছিলেন যে, স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে দূরত্ব যত বেশী থাকে ততই মঙ্গল। এবং সেই কারণে উক্ত আটটি নিয়ম আজীবন পালনের শর্ত ভিক্ষুণীদের প্রতি আরোপ করে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের মধ্যে বেশ বড় রকম একটা ব্যবধান রাখার প্রয়াস তিনি করেছিলেন[25], অথবা এই

(জ) অজ্জতগ্গে ওবটো ভিক্খুনীনং ভিক্খুসু বচনপথো, অনোবটো ভিক্খূনং ভিক্খুনীসু বচনপথো।

চুল্লবগ্গো, ১০ ১, নালন্দা সংস্করণ।

22. "সচে, আনন্দ, নালভিস্স মাতুগামো তথাগতপ্পবেদিতে ধম্ম-বিনয়ে অগারস্মা অনগারিযং পব্বজ্জং, চিরট্ঠিতিকং, আনন্দ, ব্রহ্মচরিয়ং অভবিস্স, বস্সসহস্সং সদ্ধম্মো তিট্ঠেয্য। যতো চ খো, আনন্দ মাতুগামো তথাগত—প্পবেদিতে ধম্ম-বিনযে অগারস্মা অনাগারিযং পব্বজিতো, ন দানি, আনন্দ ব্রহ্মচরিয়ং চিরট্ঠিতিকং ভবিস্সতি। পঞ্চেব দানি আনন্দ, বস্সসতানি সদ্ধম্মো ঠস্সতি।"

চুল্লবগ্গো, ১০. ২, নালন্দা সংস্করণ।

23. ঐ

24. Early Monastic Buddhism, Vol 1,
Dr. Nalinaksh Dutta, page 294

25. ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষ, শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য, পৃঃ ৫৮।

কঠিন কঠোর নিয়ম পালনের মাধ্যমে বুদ্ধদেব ধর্মার্থিনীদের ধর্মপিপাসার তীব্রতা ও ধর্মের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধার গভীরতা পরিমাপ করতে চেয়েছিলেন[26]।

উপরোক্ত যুক্তিগুলি সমর্থন যোগ্য হলেও কয়েকটি প্রশ্ন করার থাকে; উক্ত যুক্তিগুলি যদি অষ্টগুরুধর্মের ভিত্তি স্বরূপ হয়, তবে বুদ্ধদেব ভিক্ষুণীদের জন্য এমন বিধান কেন দিলেন যে, যে বিধান মান্য করে চলতে হলে ভিক্ষুণীদের পক্ষে ভিক্ষুদের সংস্পর্শে আসতেই হবে? ভিক্ষুণীসংঘ পরিচালনার ব্যাপারে সমস্ত দায়-দায়িত্বের ভার সম্পূর্ণরূপে যোগ্য ভিক্ষুণীদের হস্তে ন্যস্ত না করে উক্ত ক্ষেত্রে ভিক্ষুদের প্রাধান্য রাখা হল কেন? সর্বোপরি বুদ্ধদেবের মত মহামানবের পক্ষে ধর্মার্থিনীদের ধর্মপিপাসা পরিমাপের জন্য অষ্টগুরুধর্মরূপ পরিমাপক ব্যবহার করতে হল কেন?

উপরোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তরে বলা যায়—ভিক্ষুণীদের পক্ষে প্রযোজ্য এই অষ্টগুরু-ধর্ম প্রাচীন কালের সামাজিক অনুশাসনের ক্রমপরিণতির ফল মাত্র। কারণ ভারতের প্রাচীন সমাজনীতির বিধান অনুযায়ী নারীকে তাঁর সর্ববয়সে কোন না কোনও পুরুষের অধীনে থাকতে হত[27]। প্রাচীন ভারতের সম্মানীয় শাস্ত্রকারগণ তাঁদের রচনাবলীতে নারীকে 'গৃহলক্ষ্মী', 'সহধর্মিনী', 'অর্ধাঙ্গিনী', ইত্যাদি নানা সম্মানজনক বিশেষণে উল্লেখ করে নারীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে চেয়েছেন, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় উক্ত শাস্ত্রকারগণের মধ্যে বেশীর ভাগই শাস্ত্রকার তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে নারীর মানবী সত্তাকে অপমান করতে বিন্দুমাত্র লজ্জা বা কুণ্ঠা বোধ করেন নি এবং সম্ভবতঃ এই কারণেই তাঁরা পুরুষের শ্রেষ্ঠতা ও নারীর নিকৃষ্টতা নানা ভাবে প্রমাণ করতে চেয়েছেন[28]।

ভারতের প্রাচীন সমাজনৈতিক অনুশাসনগুলি কালস্রোতে অনুসৃত হয়ে বৌদ্ধযুগের ভারতে সেগুলির অধিকাংশই সামাজিক প্রথা, রীতি, দেশাচার, কুলাচার, লোকাচার প্রভৃতিতে পর্যবসিত হয়েছিল। যদিও বুদ্ধদেব নরনারী নির্বিশেষে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকেই সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন[29]। এবং তিনি উত্তমরূপেই জানতেন যে, কেবলমাত্র বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান পালনের দ্বারা চিত্তবিশুদ্ধি লাভ

26 প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৮—৫৯।

27. "Her father, husband and son protected her childhood, Youth and old age respectively ",

A Comprehensive History of India, Vol. II, Ed by K A. K. Nalikantha Sastri, p 475

28 প্রাচীন ভারতে নারী, শ্রীক্ষিতিমোহন সেন, পৃঃ ৫২।

29. ধম্মপদ, গাথা সংখ্যা ৩৭৯, ৩৮০।

হয় না,[30] তথাপি তিনি ধর্মের নামে প্রচলিত তৎকালীন সামাজিক প্রথা ও রীতি-নীতি গুলিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করতে বা অগ্রাহ্য করতে যে পারেন নি তার বহু নিদর্শন পালিসাহিত্যে (বিশেষ করে বিনয়পিটকে) পাওয়া যায়[31]। সুতরাং একথা বলা যায়—গণতান্ত্রিক ধর্মসংঘের প্রতিষ্ঠাতা সর্বসংস্কারমুক্ত এই মহামানব লোকাচার বা লোকোক্তিকে অপরিবর্তনীয় স্বীকার করে সর্বমানবের কল্যাণার্থে তাঁর আদি-মধ্য[32]-অন্তে কল্যাণযুক্ত ধর্ম (ধম্মং আদিকল্যাণং মজ্ঝেকল্যাণং পরিয়োসান-কল্যাণং) প্রচার করেছেন।

ভিক্ষুণীদের পক্ষে প্রযোজ্য 'অষ্টগুরুধর্ম' নিয়মগুলি প্রবর্তিত হওয়ার ফলে ভিক্ষুণীসংঘের স্থান নিঃসন্দেহে ভিক্ষুসংঘের নিম্নে স্থাপিত হয়েছিল, তথাপি একথা স্বীকার্য যে, ভিক্ষুণী সংঘ স্থাপনের অনুমতি দান করে বুদ্ধদেব নারী সমাজের তথা নারী জগতের সামনে মহৎ জীবনযাপনের এক নতুন আদর্শ তুলে ধরলেন। এই নতুন আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তৎকালীন ভারতীয় সমাজের বহু নারী ক্রমে ক্রমে ভিক্ষুণী-ব্রত অবলম্বন করতে লাগলেন। নানা কারণে তাঁরা সংসারজীবন ত্যাগ করে ভিক্ষুণী সংঘভুক্তা হওয়ার অভিলাষ করেছিলেন। তৎকালীন ভারতীয় সমাজের পুরুষের তুলনায় নারীর অধিকার অত্যন্ত সংকুচিত থাকলেও ধর্মাচরণে নারীর মতামত একেবারে অগ্রাহ্য করা হত না[33]। সুতরাং স্বতস্ফূর্তভাবে (যেমন সুমেধা,[34] সুমনা,[35] মুক্তা,[36] অঞ্জেতরা,[37] থেরী প্রভৃতি) অথবা অন্যকারো প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে (যেমন, বিজয়া,[38] সারিপুত্রের তিনভগিনী[39] (চালা, উপচালা ও সিসূপচালা), সুন্দরী নন্দা,[40] প্রভৃতি) ধর্মপিপাসু বহু নারী বৌদ্ধধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। কোন কোন নারী বুদ্ধদেবের ধর্মোপদেশ শ্রবণে অনুপ্রাণিত

---

30. ধম্মপদ, গাথা সংখ্যা ১৪৯।

31. ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ ও ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষ (মূলসহ বঙ্গানুবাদ), বিধুশেখর ভট্টাচার্য, প্রবেশক, পৃঃ ৪২

32. মহাবগ্গো, ১১০, ৩২, নালন্দা সংস্করণ।

33 থেরীগাথা, (ভিক্ষু শীলভদ্রকৃত বঙ্গানুবাদ), মুখবন্ধ, ডঃ নলিনাক্ষ দত্ত, পৃঃ J

34 Paramattha Dipani, Vol. V, P. T. S pp. 272—273

35 Ibid, pp. 22—23.

36. Ibid, p 8

37. Ibid, pp. 4—5

38. Ibid, p. 159

39. Idid, pp 162—170

40. Ibid, pp. 80—81

হযে (যেমন খেমা,[41] উত্তরা,[42] রোহিনী[43] প্রভৃতি), আবাব কোন কোন নাবী স্বামী সংসাব ত্যাগ কবে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ কবলে পতিব্রতা স্ত্রীব আদর্শে (যেমন, ভদ্দাকাপিলানি,[44] ধম্মদিন্না,[45] চাপা[46] প্রভৃতি), ভিক্ষুণী সংঘভুক্ত হযেছিলেন। কেউ কেউ বা পরিবেশ, পবিস্থিতিব আনুকুল্যে (যেমন—সুভাজীবকম্ববনিকা,[47] সোমা,[48] সিহা,[49] পুণ্ণা[50] প্রভৃতি) আবার কোন কোন নারী পবিবেশ, পবিস্থিতিব প্রতিকূল চাপে পড়ে অনিচ্ছায় (যেমন-অভিরূপানন্দা,[51] উপ্পল-বর্ণা,[52] অনুপমা[53] প্রভৃতি) ভিক্ষুণী সংঘভুক্তা হযেছিলেন। কোন কোন নাবী মৃত্যুশোকে কাতর হযে (যেমন কিসা গোতমী,[54] বাসেট্ঠি,[55] উব্বিবি,[56] পটচারা[57] প্রভৃতি) কেউ কেউ বা ব্যর্থপ্রেমের নৈরাশ্যে (যেমন — কুণ্ডলকেসা[58] বিমলা,[59] ইসিদাসী[60] প্রভৃতি, আবাব কেউ কেউ বা পাবিবারিক জ্বালা-যন্ত্রণাব অস্থিব হযে (যেমন—সোনা,[61] বড্ঢমাতা[62] প্রভৃতি) শান্তি লাভ কবার আশায ভিক্ষুণী সংঘভুক্তা হযেছিলেন। প্রাগুক্ত কাবণগুলি ছাড়াও বৌদ্ধযুগেব নাবী-গণেব গৃহ-সংসাব ত্যাগ কবে ভিক্ষুণী জীবন-যাপনেব প্রতি আগ্রহান্বিত হযে ওঠাব আবও নানা কারণ যে ছিল পালিসাহিত্যের অন্তর্গত থেরী অপদান ও থেরী গাথা

41. Ibid, pp 128
42. Ibid, p 21
43 Ibid, pp 214—220
44. Ibid, p. 68
45 Ibid, pp. 15—16
46. Ibid, pp. 220—222
47. Ibid, pp 245—246
48. Ibid, p. 66
49 Ibid, p. 79
50. Ibid, pp 199—200
51. Ibid, pp 24—25
52 Ibid, p 190
53 Ibid, pp. 138—139
54 Paramattha Dipani, Vol. V P T S p 174—175
55 Ibid, p. 125
56 Ibid, pp 53—54
57 Ibid, pp 108—112
58 Ibid, pp 99—102
59 Ibid, pp 76—77
60. Ibid, pp 260—271
61. Ibid, pp 95
62 Ibid, p 171

গ্রন্থ দুখানি পাঠে তা জানা যায়, যেমন —সামাজিক অত্যাচার, অবিচার, অপমান, হীনতা, ব্যাধি ইত্যাদি এবং বিলাসবহুল অলসজীবন যাপনে বিতৃষ্ণা অথবা ক্ষণস্থায়ী রূপযৌবনভরা উদ্দাম-উচ্ছৃংখল প্রমোদজীবন যাপনের অসারত্ব বোধ ইত্যাদি। ফলে তৎকালীন সমাজের সর্বস্তরের, সর্বশ্রেণীর নারীবৃন্দ প্রাগুক্ত নানা কারণে ভিক্ষুণী সংঘভুক্তা হয়েছিলেন[63]। এই ভাবে ভিক্ষুণীদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে, নগরে, বিস্তৃত জনপদ গুলিতে ভিক্ষুণীসংঘের সংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল[64]। কালক্রমে ভিক্ষুণী সংঘ আপন মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত হল।

বুদ্ধদেবের ধর্ম প্রেমের ধর্ম। যাঁর ইচ্ছা তিনিই এই ধর্ম গ্রহণ করতে পারেন। এই ধর্ম জগতবাসী সকলকে আহ্বান জানিয়েছে, কিন্তু কারুর ওপর যেমন আপন ধর্মমত আরোপ করেনি, তেমনি আবার কাউকে ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তিদানের প্রতিশ্রুতিও দেয় নি। এই ধর্ম অমৃত (অর্থাৎ নির্বাণ) লাভার্থীকে অমৃত লোকের পথের সন্ধান দিয়েছে এবং কিভাবে সেই পথে অগ্রসর হতে হবে তারও নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু নির্দেশ-উপদেশ প্রাপ্ত অমৃত প্রার্থীকে সেই পথ অতিক্রম করতে হবে আপন অধ্যবসায়ে ও আপন শক্তিতে এবং স্বীয় সাধন বলে লাভ করতে হবে সেই পরম কাম্য অমৃত বা নির্বান[65]। নির্বাণ লাভের জন্য কঠোর কৃচ্ছ্রতা ও অসংযত ভোগ-স্পৃহা এই দুই পন্থা পরিত্যাগ করে উক্ত পন্থাদ্বয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অর্থাৎ মধ্যপন্থা (মজ্‌ঝিম পটিপদা, বৌদ্ধধর্মে যা অট্‌ঠংগিকমগ্‌গো নামে খ্যাত) অবলম্বন করতে বুদ্ধদেব উপদেশ দিয়েছেন[66]।

ভিক্ষুসংঘ প্রতিষ্ঠার আদি পর্বে সংঘে প্রবেশের নিয়মটি ছিল সহজ ও সরল। প্রত্যেক ধর্মার্থীকে বুদ্ধদেব স্বয়ং 'এস ভিক্ষু' (এহি ভিক্‌খু) বলে আহ্বান জানিয়ে তাঁকে সংঘে প্রবেশের অনুমতি দিতেন[67]। কিন্তু যখন ধর্মার্থীর সংখ্যা দিনে দিনে বাড়তে লাগল এবং এর জন্য কিছু কিছু অসুবিধারও সৃষ্টি হল, তখন বুদ্ধদেব প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা এবং উপদেশ প্রদানের ব্যাপার সম্পূর্ণ নিজের অধীনে না রেখে

---

63. থেরীগাথা (ভিক্ষু শীলভদ্রকৃত বঙ্গানুবাদ), মুখবন্ধ, ডঃ নলিনাক্ষ দত্ত, পৃঃ ॥/০

64. প্রাগুক্ত, ভূমিকা পৃঃ ।৵০

65. ধম্মপদ, গাথা সংখ্যা ২৭৫ ও ২৭৬

66. "যো চ অয়ং কামেসু কামসুখল্লিকানুযোগো যো চায়ং অত্তকিলমথানুযোগো এতে তে, ভিক্‌খবে উভো অন্তে অনুপগম্ম, মজ্‌ঝিমা পটিপদা তথাগতেন অভিসম্বুদ্ধা, চক্‌খুকরণী, ঞানকরণী উপসমায় অভিঞ্‌ঞায় সম্বোধায় নিব্বানায় সংবত্ততি।"

মহাবগ্‌গো, ১. ৭, ১৩। নালন্দা সংস্করণ।

67. Early Monastic Buddhism, Vol. 1, Dr. N. Dutta, p. 279

সংঘে উপাধ্যায[68] ও আচার্য[69] পদের সৃষ্টি করলেন এবং উক্ত দুই পদস্থিত যোগ্য ভিক্ষুদের ওপর নবপ্রবিষ্টগণের প্রব্রজ্যা, উপসম্পদা ও উপদেশ প্রদানের ভার অর্পণ করলেন[70]। এই ব্যবস্থার একদিকে যেমন সংঘের পরিধি বৃদ্ধি পেতে লাগল অন্যদিকে তেমনি নির্বিচারে সকল শ্রেণীর মানুষ সংঘে প্রবেশ করায় নানা অনাচারে সংঘজীবন কলুষিত হতে লাগল ; ফলে বুদ্ধদেব সংঘে প্রবেশার্থীর যোগ্যতা সম্বন্ধে কয়েকটি নিয়ম বিধিবন্ধ করলেন, যথা-ঃ মাতৃ-পিতৃ হত্যার ন্যায় কোনো গুরুতর অপরাধে অপরাধী, অঙ্গহীন বা বিকলাঙ্গ, কুষ্ঠ প্রভৃতি মহাব্যাধিগ্রস্ত, চোর, ক্রীতদাস, রাজভৃত্য, সৈনিক প্রভৃতি ব্যক্তিদের পক্ষে সংঘের দ্বার রুদ্ধ হল[71]। মাতা-পিতার অনুমতি অপ্রাপ্ত ব্যক্তি সংঘে প্রবেশের অনধিকারী[72] হলেন। কুড়ি বৎসরের কম বয়স্কদের উপসম্পদা দেওয়া নিষিদ্ধ হল[73]।

সংঘে প্রবেশের দুটি সোপান ঃ (ক) প্রব্রজ্যা (পব্বজ্জা), ও (খ) উপসম্পদা। প্রব্রজ্যা অর্থাৎ গৃহহীন জীবন (সন্ন্যাস জীবন) গ্রহণের বিধিকে বৌদ্ধধর্মে[74] ত্রিশরণ (ত্রিশরণ অর্থাৎ বুদ্ধের ধর্মের ও সংঘের শরণ গ্রহণ) বলা হয়। প্রব্রজ্যা গ্রহণের দিন মুণ্ডিত মস্তক কাষায়বস্ত্র পরিহিত প্রব্রজ্যাপ্রার্থী নিজের উপাধ্যায়রূপে মনোনীত কোনো এক অভিজ্ঞ ভিক্ষুর নিকট যুক্ত করে বিনীতভাবে তিনবার প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করেন। উক্ত উপাধ্যায় তখন প্রব্রজ্যা প্রার্থীর নাম, বয়স, তিনি মাতা-পিতার অনুমতিপ্রাপ্ত কি না ইত্যাদি কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, উত্তর সন্তোষজনক হলে তিনি তখন প্রার্থীকে তিনবার ত্রিশরণ ও তিনবার দশশীল[75] মন্ত্র পাঠ করিয়ে তাঁকে প্রব্রজ্যা দান করেন।

---

68. "অনুজানামি, ভিক্খবে, উপজ্ঝায়ং"

মহাবগ্গো, ১ ১৮, ৬৫

69. "অনুজানামি, ভিক্খবে আচরিয়ং"

মহাবগ্গো, ১ ২৩ ৭৭

70. Early Monastic Buddhism, Vol. 1, Dr Nalinaksha Dutta, p 279

71. মহাবগ্গো, ১ ৫২—৬১ নালন্দা সংস্করণ।

72. ঐ , ১ ৪৬ " "

73 ঐ , ১ ৪১ " "

74 সংঘে নবপ্রবেশার্থীদের প্রব্রজ্যাদান প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব ত্রিশরণ গ্রহণ বিধি প্রবর্তিত করেছিলেন। মহাবগ্গো, ১ ৪৬, নালন্দা সংস্করণ।

75 পাণাতিপাতা বেরমণী, অদিন্নাদানা বেরমণী, অব্রহ্মচরিয়া বেরমণী, মুসাবাদা বেরমণী, সুরা-মেরেয়-মজ্জ-পমাদট্ঠানা বেরমণী, বিকালভোজনা বেরমণী, নচ্চগীত-বাদিত-বিসূকদস্সনা বেরমণী মালা-গন্ধ-বিলেপন-ধারণ-মণ্ডন-বিভূসনট্ঠানা বেরমণী, উচ্চাসয়নমহাসয়না বেরমণী,

ভিক্ষুণী সংঘের গঠন (Frame-Work) ভিক্ষুসংঘের মতই গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে স্থাপিত হয়েছিল, এবং ভিক্ষুসংঘে প্রবেশের নিয়মাবলী ভিক্ষুণীসংঘেও সমভাবেই প্রযোজ্য ছিল[76]। সুতরাং প্রাগুক্ত নিয়মানুসারেই প্রব্রজ্যা প্রার্থিনী নারী তাঁর উপাধ্যায়ারূপে মনোনীতা কোনো অভিজ্ঞা ভিক্ষুণী কর্তৃক প্রব্রজিতা হতেন[77]। বিবাহিতা নারীর ক্ষেত্রে মাতা-পিতা অথবা স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে পারতেন[78] না। বিধবা বা সহায়সম্বলহীনা নারী নিজের দায়িত্বে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে পারতেন[79]। প্রব্রজ্যা প্রাপ্তির পর পুরুষ ও নারী যথাক্রমে শ্রমণ (সামণের) ও শ্রমণা (সামণেরী) নামে অভিহিত হতেন। প্রব্রজ্যা প্রাপ্তির পর শ্রমণ-শ্রমণাকে চারটি বিষয়ে মনোযোগী হওয়ার জন্য উপদেশ দেওয়া হত, যথা :—

(ক) চীবর অর্থাৎ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের পরিধেয় কাষায় বস্ত্র। কাসাববথম বা ভিন্নপটং (বিভিন্ন বস্ত্রখণ্ড দ্বারা তালিমারা পরিধেয় বস্ত্র) নামেও চীবরের উল্লেখ পালিসাহিত্যে পাওয়া যায়। শ্মশানে পরিত্যক্ত বস্ত্র স্তূপ থেকে সংগৃহীত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা স্বয়ং সৃত চীবর পরিধানই বিধেয়, তবে কেউ যদি চীবর দান করেন তা গ্রহণ ও ব্যবহার করার পক্ষে বাধাও ছিল না[80]। বুদ্ধদেব ছয় প্রকার বস্ত্র দ্বারা সৃত চীবর ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিলেন[81]—খোম (মসিনা বা তিসি), কপ্‌পাসিকো (সুতী), কোসেয্য (রেশমী), কম্বলো (পশমী), সান (শন) এবং ভঙ্গ (পাট)। বৌদ্ধধর্ম সম্প্রদায়ের তিনটি চীবর (তিচীবর-ত্রিচীবর) ধারণ বিধেয়[82], যথা :—অন্তর্বাস (অন্তরবাসক), বহির্বাস (উত্তরাসঙ্গ) এবং সংঘাটি (পাঁচ হাত লম্বা এবং চার হাত চওড়া দোপাট্টা কাপড়। শীত নিবারণ এবং অন্যান্য কয়েকটি প্রয়োজনে এটি ব্যবহৃত হয়)। ভিক্ষুণীরা ত্রিচীবর ছাড়াও

জাতরূপ-রজত-পটিগহণা বেরমণী। অনুজানামি, ভিক্খবে, সামণেরানং ইমানি দস সিক্খা-পদানি, ইমেসু চ সামণেরেহি সিক্খিতুন্তি, মহাবগ্‌গো, ১. ৪৭, নালন্দা সংস্করণ।

76 Early Monastic Buddhism, Vol 1, Dr Nalinaksha Dutta, p 296

77 Ibid.

78. চুল্লবগ্‌গো, ১০ ১০, ২২, নালন্দা সংস্করণ।

79 Paramattha Dipani, Vol V, P. T. S pp 99—102

80 মহাবগ্‌গো, ৮ ৮, নালন্দা সংস্করণ

81 প্রাগুক্ত, ১. ২২, ৭০ „ „

82 প্রাগুক্ত, ৮. ১৬, „ „

সংকচ্চিকং[৮৪] (বক্ষাচ্ছাদনী) ও ধবনপবাবণা[৮৪] (আলখাল্লা ধরণের বস্ত্র) না আরও দুই প্রস্থ বস্ত্র ব্যবহাব কবতেন।

(খ) পিণ্ডপাত[৮৫] অর্থাৎ ভিক্ষান্ন, বা ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদেব আহার্য।

(গ) শযনাসন অর্থাৎ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদেব বাসস্থান, এবং

(ঘ) ভৈষজ্য (ভেসজ্জ-ঔষধ)। হবিতকী ও গোমূত্র দ্বাবা প্রস্তুত ঔষধই ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদেব পক্ষে সেবনীয। তবে অত্যন্ত প্রযোজনীয ক্ষেত্রে অন্য ঔষধও ব্যবহাবেব বিধি[৮৬] আছে। এ ছাড়া ঘী (সপ্পি), মাখন (নবনীত), তৈল, মধু ও গুড়-এই পাঁচটি দ্রব্য এবং শববত ও ফলেব বস অসুস্থ অবস্থায ঔষধ হিসাবে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীবা ব্যবহাব কবতে[৮৭] পাবেন।

শ্রমণ বা শ্রমণা তাঁর শিক্ষানবিশী জীবনে নিজ আচার্য বা আচার্যার নিকট শিক্ষা সমাপ্ত কবলে এবং উপযুক্ত বযস (অর্থাৎ কুড়ি বৎসব বযস) প্রাপ্ত হলে শ্রমণ বা শ্রমণাব সংঘে পূর্ণ প্রবেশাধিকারেব জন্য যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয তা উপসম্পদা নামে পবিচিত। উপসম্পদা অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কাবণ উপসম্পন্ন ব্যক্তি এবপব আধ্যাত্মিক জীবনেব উন্নত স্তবে প্রবেশ কবেন, এবং সংঘ সংক্রান্ত সর্ববিধ কাজে অংশ গ্রহণেব অধিকাব লাভ করেন। যেদিন কোনো শ্রমণকে উপসম্পদা দান কবা হয সেদিন—জ্ঞানী, শাস্ত্রজ্ঞ ও ন্যাযবান এবং ৫-১০ বৎসর কাল একনিষ্ঠভাবে ভিক্ষুজীবন যাপন কবছেন এমন দশ বা দশাধিক ভিক্ষু একস্থানে সমবেত হন। উপসম্পদাপ্রার্থী স্বীয উপাধ্যাযেব সহিত উক্ত সমবেত ভিক্ষু-মণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত হযে যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন পূর্বক যুক্ত করে বিনীত-ভাবে তিনবাব উপসম্পদা প্রার্থনা কবেন। সঙ্ঘপতি তখন তাঁকে তাঁব নাম, বযস, শ্রমণজীবনেব শিক্ষা, উপসম্পদা প্রাপ্তিব পক্ষে কোনো বাধা আছে কি না ইত্যাদি কযেকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। উত্তব সন্তোষজনক হযেছে বলে মনে করলে এবং উপস্থিত ভিক্ষুমণ্ডলীব সম্মতি লাভ কবলে পব প্রার্থীব উপাধ্যায প্রার্থীকে উপসম্পদা প্রদান কবেন[৮৮]। এবপব সংঘেব নিযমাবলী পাঠ কবা শেষ হলে উপসম্পন্ন ব্যক্তি

---

৮৩ চুল্লবগ্গো, ১০ ১০, ২৩ „ „

৮৪ বিনয পিটক, ৪, (এইচ, ওল্ডেনবার্গ), পৃঃ ২৮৯

৮৫ "সাধাবণতঃ ভিক্ষাপাত্র লইযা ঘরে ঘবে ঘুরিযা ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিতে হয বলিযা 'পিণ্ডপাত' নাম হইযাছে।"

মিলিন্দ প্রশ্ন (বঙ্গানুবাদ), ধর্মাধার মহাস্থবির, পৃঃ ৪১৬

৮৬ মহাবগ্গো, ১ ২২, ৭৩, নালন্দা সংস্করণ।

৮৭ মিলিন্দ প্রশ্ন (বঙ্গানুবাদ), ধর্মাধার মহাস্থবিব, পৃঃ ৪১৬

৮৮ মহাবগ্গো, ১ ৩১, ৩২, নালন্দা সংস্কবণ।

ভিক্ষুসংঘের পূর্ণ অধিকার সহ ভিক্ষু সংঘভুক্ত হন। তখন তাকে আচার্য চারটি আশ্রয় ও চারটি অকরণীয় আজীবন পালন করতে উপদেশ দেন। চারটি আশ্রয় (নিস্সয)[৮৯], যথা: (ক) ভিক্ষান্ন গ্রহণ, (খ) স্বয়ং স্যূত চীবর পরিধান, (গ) অরণ্যে, বৃক্ষমূলে বাস। (ঘ) ঔষধ হিসাবে গোমূত্র সেবন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বৌদ্ধভিক্ষু সংঘ স্থাপনের প্রথম যুগে ভিক্ষুরা অরণ্যে, বৃক্ষমূলে, পর্বতগুহা প্রভৃতি স্থানে বাস করতেন। তৎকালীন রাজগৃহের এক শ্রেষ্ঠী ভিক্ষুদের জন্য বিহার অর্থাৎ বাসস্থান নির্মাণের অভিপ্রায় প্রকাশ করলে বুদ্ধদেব তাঅনুমোদন করেন এবং ভিক্ষুদের বাসের জন্য বিহার, আড্যযোগ, প্রাসাদ, হর্ম ও গুহা এই পঞ্চবিধ বাসস্থানের বিধান দেন। বুদ্ধদেবই প্রথম যিনি সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসীদের জন্য গৃহিজনোচিত আবাস নির্মাণের অনুমতি প্রদান করেন[৯০]।

চারটি অকরণীয়, যথা: (১) অব্রহ্মচর্য, (২) চৌর্য, (৩) জীবহত্যা এবং (৪) নিজের প্রতি কোনো অলৌকিকত্ব আরোপ।

উপসম্পদা প্রাপ্তির পর উপসম্পন্ন ভিক্ষু তাঁর পূর্বনাম পরিত্যাগ করে ধর্মবংশ, ধর্মরক্ষিত, ধর্মপাল ইত্যাদি নামের মধ্যে যে কোনো একটি নাম গ্রহণ করেন[৯২]।

উপসম্পদা প্রার্থিনী শ্রমণা উক্ত নিয়মেই উপসম্পদা প্রাপ্ত হতেন (তবে উপসম্পদা প্রাপ্তির পর উপসম্পন্ন ভিক্ষুদের মত উপসম্পন্ন ভিক্ষুণীরা তাঁদের পূর্বনাম পরিবর্তন করে অন্য কোনো নাম গ্রহণ করতেন কি না সে সম্বন্ধে পালি-সাহিত্যে কোনো

---

৮৯ চত্তারো নিস্সয়, ঃ

(ক) পিণ্ডিয়ালোপ ভোজনং

(খ) পংসুকুল চীবরং

(গ) রুক্খমূল সেনাসনং, অতিরেকো লাভো—বিহার, অড্ঢযোগো, পাসাদ, হম্মিযং, গুহা।

(ঘ) পূতিমুত্ত ভেসজ্জং।

মহাবগ্গো, ১. ৬৯, ১২৮, নালন্দা সংস্করণ।

৯০ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষ, শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য, পৃঃ ৩০

৯১ চত্তারি অকরণীয়াণী, ঃ

(ক) মেথুন ধম্মো,

(খ) থেয্য সংখাতো,

(গ) জীবিত বোরোপনা,

(ঘ) উত্তরি মনুস্সধম্ম

মহাবগ্গো, ১. ৭০, ১২৯, না ... রণ।

৯২. বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম, ডঃ শ্রীমন ... চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৩৩—৩৪

উল্লেখ পাওয়া যায় না), কিন্তু দুটি ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছিল দেখা যায়—(ক) কাশীরাজ্যের অধিবাসিনী অর্ধকাশী (অডট্ঢকাসি) নামে এক বারবণিতা বৌদ্ধধর্মে শ্রদ্ধাশীলা হয়ে উপসম্পদা লাভের আকাঙ্খায় বুদ্ধদেবের নিকট উপস্থিত হওয়ার জন্য উৎসুক হলেন, কিন্তু পথ বিপদসংকুল জেনে নিরস্ত হতে বাধ্য হলেন, তখন উপায়হীনা-অর্ধকাশী সাহস সঞ্চয় করে জনৈক ব্যক্তির মাধ্যমে বুদ্ধদেবের নিকট উপসম্পদা প্রার্থনা করলে পরম করুণাময় ভগবান বুদ্ধ জনৈকা ভিক্ষুণীর মাধ্যমে তাঁকে উপসম্পদা দান করেন[93]। (খ) জনৈকা প্রব্রজিতা নারী সন্তান লাভের পর বুদ্ধদেবের আদেশে উপসম্পদা প্রাপ্তা হন[94]।

প্রব্রজ্যা প্রাপ্ত শ্রমণার (ছয়টি বিষয়ে শিক্ষার নিমিত্ত) শিক্ষাকাল দুই বৎসরের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল[95]। সংঘের নিয়মানুসারে বার বৎসর বয়সে কোনো নারী প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলে দুই বৎসর তিনি শিক্ষানবীশ থাকতেন এবং কুড়ি বৎসর বয়সের পূর্বে তিনি উপসম্পদা লাভ করতে পারতেন না। কিন্তু মধ্যের ছয় বৎসর কাল তিনি কি করতেন বা কি ভাবে সময় কাটাতেন সে সম্বন্ধে পালি-সাহিত্য নিরুত্তর।

ভিক্ষুণীদের পক্ষে প্রাগুক্ত চারটি আশ্রয়ের পরিবর্তে তিনটি আশ্রয় গ্রহণ করার বিধান ছিল। সম্ভবতঃ নারীগণের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করেই বুদ্ধদেব ভিক্ষুণীদের অরণ্যে, বৃক্ষমূলে বাস করার (তৃতীয়) বিধানটি দেন নি[96]। অবশ্য ভিক্ষুণীরা যে ধ্যান অভ্যাস করার জন্য অরণ্যে প্রবেশ করতেন, সে কথা থেরীগাথা গ্রন্থ পাঠে জানা যায়। নগরের বাইরে ভিক্ষুণীদের জন্য বিশেষ ভাবে নির্মিত কুটীরে তাঁরা বাস করতেন[97]। নগরের প্রাচীর সীমার বাইরে ভিক্ষুণীদের বসবাস সম্পূর্ণ নিরাপদ নয় বিবেচনা করার বুদ্ধদেবের অনুরোধে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ (পসেনদি) ভিক্ষুণীদের জন্য নগরের প্রাচীর সীমার মধ্যে বিহার নির্মাণ করান। তদবধি ভিক্ষুণীরা নগরের প্রাচীর সীমার মধ্যে তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট বিহারে বাস করতেন[98]।

---

93 চুল্লবগ্‌গো, ১০ ২২, ১

94 চুল্লবগ্‌গো, ১০ ১৬, ৩১ নালন্দা সংস্করণ।

95 প্রাগুক্ত, ১০ ২, ৬, ,, ,,

96 "নভিক্খবে, ভিক্খুনিযা অরঞ্ঞে বত্থব্বং"

চুল্লবগ্‌গো, ১০ ১৫, ৩০, নালন্দা সংস্করণ।

97 ভিক্ষুণীদের বাসস্থান প্রসঙ্গে, ডঃ নলিনাক্ষ দত্ত তাঁর Early monastic Buddhism Vol 1 গ্রন্থে বলেছেন—"They could live in a Uddesita (out house), Upasaya (hermitage) Nabakamma (cottages specially built for them)," p 296

98 Women Under Primitive Buddhism, I B Horner, p. 156

চুল্লবগ্‌গ গ্রন্থ পাঠে জানা যায়—যে আটটি কঠোর-নিয়ম পালনের শর্তসাপেক্ষে নারীগণ সংঘে প্রবেশের অনুমতি লাভ করেছিলেন, সেগুলি কিন্তু প্রয়োগকালে নানাবিধ অসুবিধা ও বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় উক্ত নিয়মগুলি বুদ্ধদেব কিছু কিছু পরিবর্তন করেছিলেন। অষ্টগুরুধর্মের নিয়মানুসারে ভিক্ষুরাই ভিক্ষুণীদের উপসম্পদা দান করতেন। উপসম্পদা প্রার্থিনীকে উপসম্পদা দানের পূর্বে তাঁর যোগ্যতা সম্বন্ধে যে ছাব্বিশ প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হত, তার মধ্যে এগারটি ছিল স্ত্রীব্যাধি[99] বিষয়ক, পাঁচটি ছিল কুষ্ঠ প্রভৃতি মহাব্যাধি বিষয়ক এবং নিম্নলিখিত দশটি ছিল অন্যান্য জ্ঞাতব্য[100] বিষয়ক, যথা :

উপসম্পদা প্রার্থিনী কি মনুষ্য ?
" " কি স্ত্রীলোক ?
" " কি ঋণহীনা ?
" " কি রাজকর্মচারিণী ?
" " কি মাতা-পিতার অনুমতি প্রাপ্তা ?
" " কি স্বামীর অনুমতি প্রাপ্তা ?
উপসম্পদা প্রার্থিনী কি পূর্ণ বিংশতি বর্ষীয়া ?
" " কি পাত্র চীবর প্রাপ্তা ?
" প্রার্থিনীর নাম কি ?
" " উপাধ্যায়ার নাম কি ?

প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে গিয়ে অধিকাংশ উপসম্পদা-প্রার্থিণীই বিব্রত বোধ করতেন এবং কুণ্ঠা ও সংকোচে ঠিকমত উত্তর দিতে না পেরে অপ্রতিভ হয়ে পড়তেন। ভিক্ষুণীদের পক্ষে এই অসুবিধার কথা অবগত হয়ে বুদ্ধদেব আদেশ দিলেন যে, এরপর থেকে জ্ঞানে-গুণে উপযুক্তা ভিক্ষুণীগণই উপসম্পদা প্রার্থিনীকে উপসম্পদা দান করবেন এবং ভিক্ষুণী সংঘের অনুমতিপ্রাপ্ত হলে উপসম্পদা ভিক্ষুণী পূর্ণ অধিকার সহ সংঘভুক্তা[101] হবেন।

---

৯৯ অনিমিত্তা, নিমিত্তমত্তা, অলোহিতা, ধুবলোহিতা, ধুবচোলা, পগ্‌ঘরন্তী, সিখরিণী ইত্থিপণ্ডিকা, বেপুরিসিকা, সম্ভিন্না, উভতোব্যঞ্জনা,

চুল্লবগ্‌গো, ১০. ১০, ২২, নালন্দা সংস্করণ।

100 মনুস্‌সাসি, ইত্থীসি, ভুজিস্‌সাসি, অনণাসি. নসি রাজভটী, অনুঞ্ঞাতাসি মাতা-পিতূহি সামিকেন, পরিপুণ্ণবীসতিবস্‌সাসি, পরিপুণ্ণনং পত্তচীবরং কিন্নামাসি, কানামা তে পবত্তিনী তি ?

চুল্লবগ্‌গো, ১০ ১০, ২২, নালন্দা সংস্করণ।

101 চুল্লবগ্‌গো, ১০. ১০, নালন্দা সংস্করণ।

সুষ্ঠুভাবে সংঘ পরিচালনার জন্য এবং ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরা যাতে পবিত্রভাবে জীবন-যাপন করতে পারে তার জন্য বুদ্ধদেব যে সকল আদেশ-উপদেশ (আণাদেসনা) দিয়েছেন, একত্রে সেগুলি বিনয় নামে খ্যাত। বিনয়ের অন্তর্গত উপদেশ বা শিক্ষাপদ গুলির মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলি শিক্ষাপদের সমষ্টিই প্রাতিমোক্ষ[102] (পাতিমোক্‌খ) নামে পরিচিত। প্রাতিমোক্ষের অন্তর্গত শিক্ষাপদগুলি প্রত্যেক ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীর পক্ষে অবশ্য পালনীয় ধর্ম। যে কোনও শিক্ষা পদ লংঘন করা অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। অপরাধের গুরুত্ব হিসাবে প্রাতিমোক্ষে শিক্ষাপদ-গুলি সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। যেমন, পারাজিক সর্বাপেক্ষা গুরু অপরাধ হিসাবে সর্ব প্রথমে এবং প্রাতিদেশনীয় সর্বাপেক্ষা লঘু অপরাধ হিসাবে সর্বশেষে স্থান পেয়েছে। সংঘ থেকে বহিষ্করণই হল চূড়ান্ত শাস্তির নিদর্শন। মেত্তিয়া নাম্নী এক ভিক্ষুণীকে এই চরম শাস্তি গ্রহণ করতে হয়েছিল[103]। মেত্তিয়া ভিক্ষুণী ছাড়া অন্য কোনো ভিক্ষুণীকে সংঘ থেকে বহিষ্করণের ঘটনার উল্লেখ পালি-সাহিত্যে পাওয়া যায় না। তবে স্বেচ্ছায় সংঘজীবন পরিত্যাগ করার পক্ষে কোনো বাধা ছিল না। কিন্তু যিনি স্বেচ্ছায় সংঘজীবন পরিত্যাগ করে পুনরায় গৃহজীবনে ফিরে যেতেন অথবা অন্য কোনো ধর্ম সম্প্রদায়ভুক্তা হতেন, সে ক্ষেত্রে তিনি আর বৌদ্ধ ভিক্ষুণী সংঘে পুনঃ প্রবেশের অধিকার পেতেন না[104]। অবশ্য সংঘ পরিত্যাগ-কারিণীর সংখ্যা অতি নগণ্য। পালিসাহিত্যে এ বিষয়ে মাত্র তিনজনের নাম পাওয়া যায়—(ক) স্থূলতিষ্যা (থুল্লতিস্‌সা), ইনি সংঘজীবন ত্যাগ করে গৃহজীবনে ফিরে যান[105]। (খ) অজ্ঞাত নামা জনৈকা ভিক্ষুণী, যিনি প্রথমে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ-গ্রহণ করেন, পরে চীবর পরিত্যাগ করে গৃহিজনোচিত বস্ত্র পরিধান

---

102 স্বতন্ত্র গ্রন্থ হিসাবে প্রাতিমোক্ষের কোনো অস্তিত্ব নেই, এটি বিনয়পিটকের অন্তর্গত সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পালি গ্রন্থ সুত্র বিভঙ্গে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। প্রাতিমোক্ষের দুটি বিভাগ : (ক) ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ—এর অন্তর্গত আটটি অধ্যায়ে ভিক্ষুদের জন্য ২২৭টি শিক্ষাপদ আছে। (খ) ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষ—এর অন্তর্গত সাতটি অধ্যায়ে ভিক্ষুণীদের জন্য ৩১১টি শিক্ষাপদ আছে। সুত্রবিভঙ্গ গ্রন্থে উভয় প্রাতিমোক্ষের অন্তর্গত শিক্ষাপদ বা নিয়মের উৎপত্তির কারণ, স্থান পরিস্থিতি ও পাত্র বা পাত্রীর সম্বন্ধে বিবরণ এবং বিশদ বিশেষ শব্দের অর্থ, টীকা-টিপ্‌পনী সহ ব্যাখ্যা—বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম, ডঃ শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৯৯

103 চুল্লবগ্‌গে, ৪ ২, ৯, নালন্দা সংস্করণ।

104 প্রাগুক্ত, ১০ ১৮, নালন্দা সংস্করণ।

105 সংযুক্ত নিকায়, ১৬ ১০, ১১।

করে সংঘজীবন থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যান[106]। (গ) আর এক ভিক্ষুণীর কথা জানা যায়—যিনি চীবর পরিধৃত অবস্থাতেই বৌদ্ধ ভিক্ষুণী সংঘ ত্যাগ করে অন্য এক সম্প্রদায় ভুক্তা হয়েছিলেন[107]।

বৌদ্ধযুগে আত্মহত্যা করে ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভের প্রবণতা ধর্মীয় ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়[108]। কিন্তু বুদ্ধদেব তাঁর প্রদত্ত উপদেশ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, আত্মহত্যা করা অনুচিত, এবং বিনয়ের নীতি নিয়ম অনুসারে আত্মহত্যাকারী দোষী রূপে বিবেচিত হবেন[109]। কিন্তু বুদ্ধদেবের এই অনুজ্ঞা অমান্য করে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছিল এমন একটি ঘটনার কথা পালিসাহিত্য পাঠে জানা যায়—থেরী সীহা[110] সাত বৎসর যাবৎ ভিক্ষুণী সংঘে থেকে ভিক্ষুণী জীবন যাপন করেও যখন নিজ চিত্তকে বাহ্যবস্তুর কুহক থেকে মুক্ত করতে সমর্থ হলেন না, তখন তিনি সংঘজীবন পরিত্যাগ করতে উৎসুক হলেন, কিন্তু সংঘজীবন পরিত্যাগ করে পুনরায় হীনজীবনে (সংসারজীবনে) ফিরে যেতেও তাঁর প্রবৃত্তি হল না। তখন তিনি উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করা স্থির করলেন, কিন্তু আত্মহত্যা করার পূর্ব-মুহূর্তে তাঁর চিত্ত অকস্মাৎ বাহ্য বস্তুর কুহকমুক্ত হয়, ফলে তিনি আত্মহত্যা করে মুক্তিলাভের চেষ্টা থেকে বিরত হন

মগধরাজ বিম্বিসারের[111] অনুরোধে বেদপন্থীদের অনুকরণে উপোসথ[112] দিবসে অর্থাৎ প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে, বুদ্ধদেব ভিক্ষুসংঘে পাঠের নিয়ম প্রবর্তন করেন, এবং তাতেই উপোসথ কর্ম করা হবে (সো নেসং ভবিস্সতি

---

106 চুল্লবগ্গো, ১০. ১৮, ৩৩, নালন্দা সংস্করণ।

107 প্রাগুক্ত, নালন্দা সংস্করণ।

108 The wonder that was India, A L Basham p. 292

Cf, Women under Primitive Buddhism, I B, Horner, p, 263

109 মিলিন্দ প্রশ্ন (বঙ্গানুবাদ), ৪. ৪, ১২, ধর্মাধার মহাস্থবির, পৃঃ ১৯৭

110 Paramrttha Dipani, Vol. V, P T S, p. 79

111 মহাবগ্গো, ২. ১, ১, নালন্দা সংস্করণ।

112. পালি উপোসথ শব্দের সংস্কৃত শব্দ উপবসথ। বেদের দর্শ (অমাবস্যা) ও পূর্ণমাস (পূর্ণিমা) যোগ সুপ্রসিদ্ধ। যেদিন এই যাগ হয়, তার পূর্বদিনে যজমান ও তাঁর পত্নীকে আহার-বিহারাদি সর্ববিষয়ে সংযত ভাবে থাকার জন্য ব্রত গ্রহণ করতে হয়। যাগের এই পূর্বদিনের বা সংযমের দিনের নাম উপবসথ। এই উপবসথ শব্দ থেকেই পালিতে উপোসথ ও পোসথ এই দুই শব্দই উৎপন্ন হয়েছে।

ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ ও ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষ (মূলসহ বঙ্গানুবাদ),

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য, প্রবেশক, পৃঃ ৬৩—৬৫ দ্রষ্টব্য।

উপোসথ কম্মং) বলে অনুজ্ঞা প্রদান করেন[113]। প্রতিমোক্ষ পাঠের পর উপস্থিত ভিক্ষুদের মধ্যে যদি কেউ শিক্ষাপদলংঘনজনিত অপরাধে অপরাধী থাকেন তবে তাঁকে নিজ অপরাধ স্বীকার করতে হয়, এবং সংঘের নিয়মানুসারে তাঁকে শাস্তিও পেতে হয়। যে স্থানে ভিক্ষুরা উপোসথ দিবসে প্রাতিমোক্ষ পাঠ করেন, সেই স্থানে সেই সময়ে সংঘবহির্ভূত অন্য কোনো শ্রেণীর মানুষের উপস্থিতি তো দূরের কথা, সংঘের অন্তর্ভুক্ত শিক্ষমাণগণ এমন কি ভিক্ষুণীদের পর্যন্ত সে ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকার অধিকার ছিল না[114]।

ভিক্ষুণী সংঘেও প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে প্রাতিমোক্ষ পাঠের নিয়ম ছিল, কিন্তু প্রাগুক্ত অষ্টগুরুধর্ম পালনের শর্তানুযায়ী উপোসথের দিবস কবে এবং ওবাদো অর্থাৎ উপদেশ দানের সময় কখন এই সংবাদ দুটি উপোসথ ব্রত পালনের অন্ততঃ দুই বা তিন দিন পূর্বে ভিক্ষুসংঘে গিয়ে ভিক্ষুণীদের জেনে আসতে হত[115]। উপোসথের দিন ভিক্ষুসংঘের যে কোনো ইচ্ছুক ভিক্ষু ভিক্ষুণী সংঘে উপস্থিত হয়ে প্রাতিমোক্ষ পাঠ করতেন এবং পাঠ শেষ হলে উপস্থিত ভিক্ষুণীদের মধ্যে যদি কেউ অপরাধিনী ভিক্ষুণী থাকতেন তবে তিনি তাঁর অপরাধ স্বীকার করে যথাবিধি শাস্তি গ্রহণ করতেন। এইভাবে ভিক্ষুণীরা তাঁদের উপোসথ ব্রত পালন করতেন। এক্ষেত্রে প্রাতিমোক্ষ-পাঠক ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী শ্রোতৃমণ্ডলী ছাড়া অন্য কোনো ভিক্ষু বা সংঘবহির্ভূত অন্য কোনো ব্যক্তি উপস্থিত থাকার অধিকারী ছিলেন কিনা সে বিষয়ে পালি সাহিত্যে কোনো উল্লেখ না থাকলেও উপরোক্ত ব্যবস্থার নিন্দুক জনগণ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক কল্পনা করে যে নানা গুঞ্জন তুলেছিলেন পালি সাহিত্য পাঠে তা জানা যায় এবং এও জানা যায় যে, যার ফলে বুদ্ধদেব পূর্বোক্ত নিয়ম পরিবর্তন করে অনুজ্ঞা দিলেন যে, এরপর থেকে ভিক্ষুণীরাই ভিক্ষুণী সংঘে প্রাতিমোক্ষ পাঠ করে সংঘের বিধান অনুযায়ী উপোসথ ব্রত পালন করবেন[116]। অবশ্য, ভিক্ষুণীদের উপদেশ (ওবাদো) দানের অধিকার ভিক্ষুদের ওপরেই ন্যস্ত থাকল।

প্রতি অনুদ্ধমাসং (অর্ধমাসে) প্রাগুক্ত নিয়মানুসারে ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুসংঘে উপস্থিত হয়ে আগে থেকেই জেনে নিতেন ধর্মোপদেশ দানের দিন ও সময়। নির্বুদ্ধি, ভ্রাম্যমাণ ও অসুস্থ ছাড়া যে কোনো ইচ্ছুক ভিক্ষু ভিক্ষুণীসংঘে উপস্থিত হয়ে পূর্ব

113 মহাবগ্গো, ২ ২, ২, নালন্দা সংস্করণ।
114 প্রাগুক্ত, ২ ১১, ১৯, " "
115 চুল্লবগ্গো, ১০ ২, ৩, " "
116, প্রাগুক্ত, ১০ ৫, ৬, " "

নির্দিষ্ট দিন ও সময়ে ভিক্ষুণীদের ধর্মোপদেশ দিতে পারতেন[117]। কিন্তু এই নিয়ম উপদেশক ভিক্ষু এবং উপদেশ গ্রহীতা ভিক্ষুণীরা যথাযথ পালন করছেন না জেনে এবং একই সঙ্গে সমগ্র ভিক্ষুণী সংঘকে উপদেশ দান করা অসুবিধা জনক বিবেচনা করে বুদ্ধদেব যে নতুন নিয়ম প্রবর্তন করলেন সেই নিয়মানুসারে ভিক্ষুণীরা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে ও সময়ে উপস্থিত হতেন এবং পূর্ব নির্দিষ্ট কোনো ভিক্ষুর নিকট উপদেশ গ্রহণ করতেন। কিন্তু এ ব্যবস্থাও স্থায়ী হল না, কারণ ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভাবে ভিক্ষুণীদের উপদেশ দানের জন্য এমন সব সময় ধার্য করতে লাগলেন যার ফলে ভিক্ষুণীদের নানা প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হতে হত। এই সব অসুবিধা দূরীকরণের জন্য বুদ্ধদেব কর্তৃক নতুন নিয়ম প্রবর্তিত হল—"সূর্যাস্তের পূর্বে ভিক্ষুণীদের উপদেশ দানের সময় ধার্য করতে হবে[118]।" এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব আরও নিয়ম করলেন যে, ভিক্ষুণী গণের উপদেশক ভিক্ষুকে অষ্টবিধ গুণের অধিকারী হতে হবে (অট্ঠহি খো,···· ধম্মেহি সমন্নাগতো ভিক্খু ভিক্খুনোবাদকে সম্মন্নিতব্বো) যথাঃ উপদেশক ভিক্ষু হবেন, জ্ঞানী, ধার্মিক, আচার-ব্যবহারে ভদ্র. উভয়সংঘের নিয়মাবলী সম্বন্ধে অভিজ্ঞ উপদেশের মাধ্যমে উপদিষ্ট গণের হৃদয়ে ধর্মভাব জাগ্রত করতে দক্ষ, ভিক্ষুণী সংঘ কর্তৃক মনোনীত, ভিক্ষুসংঘ কর্তৃক উপদেশকরূপে নির্বাচিত এবং বিশ বা ততোধিক বর্ষ যাবৎ একনিষ্ঠ ভাবে ভিক্ষুব্রত পালন করছেন এমন একজন[119]।

বর্ষাঋতুর চারমাস অর্থাৎ আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে কার্তিকী পূর্ণিমা পর্যন্ত বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরা তাঁদের বাইরের কাজকর্ম স্থগিত রেখে কোনো এক নির্দিষ্ট স্থানে বা বিহারে বাস করেন। এই রীতিকে বর্ষাবাস (বাসসাবাস) বলা হয়। কিন্তু ভিক্ষু-রহিত এমন কোনো স্থানে ভিক্ষুণীরা বর্ষাবাস করতে পারতেন না[120]। ভিক্ষুণীদের উপোসথ ব্রত পালন, উপদেশ গ্রহণ ও প্রবারণা (পবারণা) করার পক্ষে বাধা সৃষ্টি হতে পারে এই বিবেচনায় বুদ্ধদেব কর্তৃক নিয়ম করা হল-অনিবার্যকাল ছাড়া ভিক্ষুণীরা তাঁদের বর্ষাবাসের স্থান পরিবর্তন করতে পারবেন না, এবং একাকী যাধী

117 প্রাগুক্ত, ১০. ৯, ৪, ৫, " "

118 ভিক্খু পাতিমোক্খ, পাচিত্তিয়ধম্মা, ২১—২৩

119 অংগুত্তর নিকায়, ৮. ৬, ২, নালন্দা সংস্করণ

120. 'ন ভিক্খুনিয়া অভিক্খুকে আবাসে বস্সং বসিতব্বং'

চুল্লবগ্গো, ১০. ২, ২, নালন্দা সংস্করণ।

নভাবে কোনো ভিক্ষুণী বর্ষাবাস করতে পারবেন না[121]। এই নিয়ম অমান্য করলে তা অপরাধ বলে গণ্য করা হত[122]। বর্ষাবাস পূর্ণ হলে এক সপ্তাহের[123] মধ্যে ভিক্ষুণীদের উভয় সংঘের নিকট প্রবারণা করতে হত। প্রবারণা একটি বিনয়কর্ম[124]। বর্ষাবাসের মধ্যে ভিক্ষুণীরা যদি কোনো নীতিবিগর্হিত কাজ করে থাকেন এবং সংঘ যদি তা দেখে থাকেন (দিট্‌ঠ) বা শুনে থাকেন (সুত) অথবা আশংকা করে থাকেন (পরিসংকিত) তবে ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুসংঘের নিকট প্রার্থনা জানালে ভিক্ষুসংঘ তা প্রকাশ করতেন[125]। প্রথম দিকে ভিক্ষুসংঘই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে ভিক্ষুণীদের কৃত অপরাধ সম্বন্ধে সত্যাসত্য জেনে নিতেন, কিন্তু প্রত্যেকটি বিষয়ে বিশদ অনুসন্ধান করার জন্য অযথা সময় ব্যয় হয়, এই বিবেচনায় বুদ্ধদেব নিয়ম করলেন যে, ভিক্ষুসংঘের নিকট প্রবারণা করার পূর্বদিন ভিক্ষুণী সংঘ উক্ত বিষয়ে অনুসন্ধান করে কে অপরাধী এবং কি বিষয়ে অপরাধ তা স্থির করে বা জেনে নিয়ে পরের দিন ভিক্ষুসংঘের নিকট প্রবারণা করবেন[126]।

বর্ষাবাস সময়টি সংঘজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়, কারণ এই সময় ভিক্ষুণী-দের বাইরের কাজকর্ম বন্ধ থাকায় তাঁরা শারীরিক বিশ্রাম লাভ করতে পারেন, নানা প্রকৃতির ভিক্ষুণীদের সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পান, সর্বোপরি তাঁরা আত্মসমীক্ষা করার জন্য সময়ও পান, এবং নিজেদের কোন দোষ-ত্রুটি থাকলে তা স্বীকার করতে পারেন, একে অন্যকে তাঁর ত্রুটি বিচ্যুতির বিষয়ে সচেতন করে ব্যক্তিগত মতামত বা পরামর্শ দিতে পারেন। এইভাবে ভিক্ষুণীরা প্রবারণা করার জন্য প্রস্তুত হতেন এবং পূর্বোক্ত নিয়ম অনুসারে তাঁরা প্রবারণা কার্য সম্পাদন করতেন। কিন্তু এতে ভিক্ষুসংঘের অসুবিধা বা বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে দেখে বুদ্ধদেব পূর্বোক্ত নিয়ম পরিবর্তন করে নতুন যে নিয়ম প্রবর্তন করলেন তাতে বলা হল যে, ভিক্ষুণীসংঘ থেকে সর্বসম্মত ভাবে নির্বাচিতা একজন অভিজ্ঞা ও জ্ঞানবৃদ্ধা ভিক্ষুণী সমগ্র ভিক্ষুণী সংঘের প্রতিনিধি রূপে ভিক্ষুসংঘের নিকট প্রবারণা করবেন[127]। বুদ্ধদেব কর্তৃক নির্দেশিত উক্ত নিয়মেই ভিক্ষুণী সংঘ ভিক্ষুসংঘের নিকট প্রবারণা প্রার্থনা করতেন।

---

121 চুল্লবগ্গো, ১০ ১, ২

122 ভিক্খুনী প্রাতিমোক্খ, পাচিত্তিয়া ৫৬

123 বিনয়পিটক, ৪ (এইচ ওল্ডেন বার্গ), পৃঃ ২৯৭

124 মহাবগ্গো, ৪ ২৬ (পবারণা সংগহো), নালন্দা সংস্করণ পৃঃ ১৯৬-১৯৭।

125 চুল্লবগ্গো, ১০. ২, ৪, নালন্দা সংস্করণ।

126 প্রাগুক্ত, ১০ ১২, ২৫, নালন্দা সংস্করণ।

127. চুল্লবগ্গো, ১০ ১২, ২৬, নালন্দা সংস্করণ।

বৌদ্ধমণ্ডলীর দুটি মহাব্রত : (ক) সংযম ও (খ) দারিদ্র্য। সংঘের নিয়মকানুনের মাধ্যমে ঘোষিত না হলেও সংযম ও দারিদ্রের প্রতি আজীবন আনুগত্য স্বীকারের এক অলিখিত অঙ্গীকারে বিবেকের কাছে তাঁরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকতেন। এই সংযম ও দারিদ্র্যের মর্যাদাহানিকর কোনও কাজ করলে তাঁদের শাস্তি গ্রহণ করতে হত। সংযম পালনের বিধান অনুযায়ী আচার-ব্যবহার, চাল-চলন, অশন-বসন, শয়ন-উপবেশন প্রভৃতি সর্ববিষয়ে ভিক্ষুণীদের সংযত হয়ে চলতে হত। চুল্লবগ্গো গ্রন্থে এবং বিনয়পিটকের অন্তর্গত সূত্রবিভঙ্গ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট ভিক্ষুণীবিভঙ্গে ভিক্ষুণীদের পক্ষে প্রযোজ্য সংযম পালনের নিয়মগুলি লিপিবদ্ধ আছে। নিজ নিজ চীবর, ভিক্ষাপাত্র ও কক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ছাড়া গৃহস্থরমণী সুলভ সুতাকাটা, ধানভানা, তাঁতবোনা প্রভৃতি কাজকর্ম এবং কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সর্বপ্রকার অর্থকরী কর্ম করা ভিক্ষুণীদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। মুণ্ডিত মস্তক, কাষায়-বস্ত্রধারিণী ভিক্ষুণীদিগকে অঙ্গরাগ, (স্নানকালে) সুগন্ধিচূর্ণ, অলংকার, মনোরম বিচিত্রবর্ণের পরিচ্ছদ ইত্যাদি এবং সৌন্দর্যবর্ধক ও চিত্ত উত্তেজক সর্বপ্রকার বিলাস-সামগ্রী ব্যবহার করা থেকে এবং অপরের দ্বারা নিজের গাত্রমার্জনা করা থেকে বিরত থাকার জন্য বিধান দেওয়া হয়েছিল[১২৮]। ছত্র, পাদুকা, ঘৃত, তৈল, গুড় ও নবনীত বিলাসদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত থাকায়, সুস্থ অবস্থায় উক্ত দ্রব্যগুলি ব্যবহার করা সংযম পালনের নিয়ম বহির্ভূত ছিল। সঞ্চয় প্রবৃত্তি, যা মানুষকে নানা ভাবে অসৎ করে তোলে, সেই প্রবৃত্তিকে সংযত রাখার জন্য স্বর্ণ, রৌপ্য, অর্থ বা যে কোনো বস্তু সঞ্চয় করা ভিক্ষুণীদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল।

দারিদ্রকে তাঁরা (ভিক্ষুণীরা) বরণ করে নিয়েছিলেন। অষ্টবিধ বস্তু (অর্থাৎ চীবরত্রয়, একটি ভিক্ষাপাত্র, একটি থাবিকা বা কটিবন্ধ, একটি সূচ, একটি ক্ষুর এবং একটি জল ছাঁকার পাত্র) ছাড়া ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে ভিক্ষুণীদের আর কিছুই ছিল না, কিন্তু এই ব্যক্তিগত সম্পত্তির অন্তর্গত প্রত্যেকটি বস্তুই যথাযথ বিধানে তাঁদের ব্যবহার করতে হত। কোনো ভিক্ষুণীর মৃত্যু হলে সংঘের নিয়মানুসারে মৃতা ভিক্ষুণীর রোগ শয্যায় যাঁরা তাঁর সেবা-পরিচর্যা করেছেন তাঁদের দেওয়ার বিধান ছিল[১২৯]। অবশ্য, কোনো ভিক্ষুণী যদি মৃত্যুর পূর্বে

128. চুল্লবগ্গো, ১০. ৭, ১৬. ১৭, নালন্দা সংস্করণ।

129 But the rule laid down in the Mahavaggo, VIII, 27, the set of robes and the bowl are to be assigned by the Sangha to those that are waited on the sick—at least in the case of Bhikkhus—and the analogy would doubtless hold good of the Bhikkunis also.

S B. E. (Secred Books of the East), Vol. XX p 344

তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি সংঘকে দান করার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন তবে তাঁর মৃত্যুর পর সংঘ কর্তৃক তাঁর সেই শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করা হত[130]।

পালি সাহিত্যের মহাবগ্‌গো (মহাবর্গ) গ্রন্থে ভিক্ষুসংঘের ক্রমিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, কিন্তু ভিক্ষুণী সংঘের তদনুরূপ কোনো ইতিহাস পাওয়া যায় না। সমগ্র পালি সাহিত্যে ভিক্ষুণীদের সংঘজীবন সম্বন্ধে বিক্ষিপ্ত ভাবে যে সামান্য সামান্য বিবরণ পাওয়া যায় সেগুলি থেকে এই ধারণা করা যায় যে, প্রত্যেক ভিক্ষুণী ত্রিচীবর পরিধান করে লৌহ অথবা মৃত্তিকা নির্মিত (পত্তো নাম দের পত্তা অয়ো পত্তো মত্তিকা পত্তো) পাত্র হস্তে (পত্তচীবরং আদায়) প্রতিদিন ভিক্ষার্থে গমন করতেন। কেমনভাবে চীবর পাত্র ধারণ করতে হবে, ভিক্ষার্থে পথে চলতে হবে, ভিক্ষাযাচ্ঞা করতে হবে, ভিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, অন্তর্গৃহে প্রবেশ করতে হবে, উপবেশন করতে হবে ইত্যাদি নানা বিষয়ে ভিক্ষুণীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে[131]। ভিক্ষুণীরা যখন কোনো কার্যবশতঃ বা ভিক্ষার্থে সংঘের বাইরে গমন করতেন তখন তাঁদের ত্রিচীবর পরিধানের সঙ্গে 'সংকচ্ছিকা' ও 'থবনপাবুরণ' ব্যবহার করা অতি আবশ্যক ছিল। এমনভাবে ভিক্ষুণীদের পরিচ্ছদ ধারণ বিধেয় ছিল, যাতে তাঁদের মুখমণ্ডল, হস্ত ও পদ পল্লব যুগল ব্যতীত দেহের সর্ব অংশ উত্তমরূপে আচ্ছাদিত হয়। তবে তাঁরা মস্তক আবৃত করতেন এমন কোনো কথার উল্লেখ পালি সাহিত্যে পাওয়া যায় না। 'ঋতুমতী' অবস্থায় (গৃহস্থগণ প্রদত্ত) 'আবসথ চীবর'[132] নামে যে বস্ত্র ভিক্ষুণীরা ব্যবহার করতেন ব্যবহারান্তে সেই বস্ত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে পুনরায় যাতে অন্য কোনো 'ঋতুমতী-ভিক্ষুণী' ব্যবহার করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে ঐ বস্ত্র সংরক্ষণ করার নিয়ম ছিল[133]। 'থবনপাবুরণ' বস্ত্রটিতে ভিক্ষুণীদের ব্যক্তিগত অধিকার ছিল না। সুতরাং দেখা যায়, ছত্র, পাদুকার মতই আবসথ চীবর ও থবনপাবুরণ বস্ত্রদ্বয়ও সংঘের সম্পত্তিরূপে গণ্য ছিল, এবং প্রত্যেক ভিক্ষুণী প্রয়োজন বোধে উক্ত বস্তুগুলি ব্যবহার করার সমান অধিকারিণী ছিলেন।

নগ্নস্নান ভিক্ষুণীদের পক্ষে নিষিদ্ধ[134] ছিল। স্নানবস্ত্র (উদকসাটিকা) পরিধান করে তাঁরা স্নান করতেন। স্নানবস্ত্র ও সংকচ্ছিকা বস্ত্র দুটি ভিক্ষুণীদের

---

130 চুল্লবগ্‌গো, ১০ ৯, ২১, নালন্দা সংস্করণ।

131 ভিক্খুনী পাতিমোক্খ, ষষ্ঠ অধ্যায়, শৈক্ষধর্ম (সেখিয়া ধম্মা) দ্রষ্টব্য।

132 চুল্লবগ্‌গো ১০, ৯, ২১, নালন্দা সংস্করণ।

133 ভিক্খুনী পাতিমোক্খ, পাচিত্তিয়া ধম্মা, ৪৭

134 বিনয়পিটক, ৪ (এইচ্‌. ওল্ডেনবার্গ) পৃঃ ২৭৮—২৭৯ এবং ভিক্খুনী পাতিমোক্খ, পাচিত্তিয়া ধম্মা ২১ দ্রষ্টব্য।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি রূপে গণ্য করা হত কিনা সে বিষয়ে পালিসাহিত্যে স্পষ্টভাবে কোনো উল্লেখ না থাকলেও সম্ভবতঃ উক্ত দুই প্রকার বস্ত্রে তাঁদের ব্যক্তিগত অধিকার ছিল, কারণ ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষে বলা হয়েছে যে, কোনো ভিক্ষুণীর পক্ষে পাঁচদিন পর্যন্ত পঞ্চবিধ[135] চীবর পরিধান না করা বা পরিষ্কারভাবে না রাখা অপরাধ বলে গণ্য করা হবে।

গৃহস্থগণ সর্বপ্রকার খাদ্য গ্রহণে ভিক্ষুণীদের পক্ষে কোনো বাধা ছিল না, কারণ বুদ্ধদেব বাধ্যতামূলক ভাবে আমিষ বা নিরামিষ খাদ্য গ্রহণের জন্য কোনো নির্দেশ দেন নি[136]। তবে মহাবর্গ গ্রন্থের ভেষজ্য[137] স্কন্ধতে হস্তী, অশ্ব সর্প, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তুর মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে, অপর পক্ষে প্রাতিমোক্ষে মৎস-মাংস উপাদেয় ও পুষ্টিকর খাদ্যরূপে বলা হয়েছে। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে আমিষ ভোজন নিষিদ্ধ নয়[138]। সেই কারণে গৃহস্থগণ ভিক্ষুণীদের ভিক্ষাপাত্রে যে খাদ্যই দান করতেন সে সকল খাদ্য সমস্তই সংগ্রহ করে ভিক্ষুণীরা বিহারে ফিরতেন, এবং একটি কক্ষে সকলে একত্রিত হয়ে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করতেন। আহারে উপবেশনের জন্য আসন গ্রহণের মধ্যেও একটি নিয়ম ছিল—আটজন বিশিষ্ট ভিক্ষুণী তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট আসন গ্রহণের পর অন্যান্য ভিক্ষুণীরা তাঁদের আসন গ্রহণ করতেন[139]। যে কোনো গৃহস্থ ভিক্ষুণীদের তাঁর গৃহে নিমন্ত্রণ করতে পারতেন। নিমন্ত্রিত হয়ে গৃহস্থগৃহে প্রবেশকালীন এবং সেই গৃহ থেকে বিদায়কালীন ব্যবহার বিধি ভিক্ষুণীদের মান্য করে চলতে হত[140]। ভিক্ষুণীদের পক্ষে গৃহস্থগণের নিকট ভিক্ষুণীদের নিন্দা বা ভিক্ষুণীদের নিকট গৃহস্থগণের নিন্দা করা অপরাধ বলে গণ্য করা হত।

নির্বাণপদ লাভই ছিল ভিক্ষুণীগণের চরম লক্ষ্য, পরম উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধন কল্পে, ধ্যানযোগে আধ্যাত্মিক জগতের ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য তাঁরা অরণ্যে প্রবেশ করতেন এবং কোনো এক বৃক্ষমূলে বসে গভীর অভিনিবেশ সহকারে ধ্যান[141] অভ্যাস করতেন। ভিক্ষুণীদের মধ্যে যাঁরা ধর্মপ্রচারে ব্রতী

135 এ স্থলে পঞ্চচীবর শব্দটি ত্রিচীবর, উদকসাটিকা (স্নানবস্ত্র) ও সংকচ্ছিকা অর্থে ব্যবহৃত। ভিক্খুনী প্রাতিমোক্খ, পাচিত্তিয়া ধম্মা, ২৪

136 মজ্‌ঝিম নিকায়, ২. ২, ৬ (পি টি এস)

137 মহাবগ্‌গো, ভেসজ্জ খন্ধকং, ৬ ১০, ২১,

138 Early Buddhist Jurisprudence, Durga Bhagvat, p 147

139 চুল্লবগ্‌গো, ১০, ১২, ২৫, নালন্দা সংস্করণ।

140 ভিক্খুনী প্রাতিমোক্খ, পাচিত্তিয়া ধম্মা—১৫, ১৬

141 Psalms of the Sisters, Mrs Rhys Davids Introduction p XXXVI

হতেন, তাঁদের নানা স্থানে পর্যটন করতে হত[142] কিন্তু অসুস্থ না হলে বা একান্ত প্রয়োজন না ঘটলে ধর্ম প্রচারিকা ভিক্ষুণীদের পক্ষেও ছত্র, পাদুকা ও যান ব্যবহার করা নিষিদ্ধ[143] ছিল।

বৌদ্ধসংঘগুলি কোনো না কোনো রাষ্ট্রসীমার মধ্যে থাকলেও সেই রাষ্ট্রের আইনকানুন বৌদ্ধসংঘগুলির পক্ষে প্রযোজ্য ছিল না[144]। সুতরাং সংঘের অন্তর্গত বিবাদবিরোধ, কলহ, সংঘজীবনের আদর্শচ্যুতিবশতঃ অপরাধ, ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের কৃত সংঘভেদকর উৎপন্ন কোনো পরিস্থিতি ইত্যাদির মীমাংসার জন্য বৌদ্ধধর্মসম্প্রদায়কে রাজদ্বারে যাবার প্রয়োজন হত না, সংঘের নিয়মানুসারে সংঘের সদস্যরাই উক্ত বিষয়গুলির বিচার ও মীমাংসা করতেন[145]। কিন্তু যেহেতু ভিক্ষুণীসংঘ ভিক্ষুসংঘের অধীনস্থ ছিল, সেই হেতু ভিক্ষুণীসংঘে ভিক্ষুণীদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ, কলহ ইত্যাদি উপস্থিত হলে উচ্চ পদাধিকার বলে প্রথমে ভিক্ষুসংঘ তার বিচার করতেন এবং পরে উক্ত বিষয়টিই আবার বিচারের জন্য ভিক্ষুণী-সংঘে প্রেরিত হত[146]।

পালিসাহিত্য পাঠে জানা যায়, ভিক্ষুণীদের পক্ষে প্রযোজ্য নিয়মগুলির উৎপন্নের মূল উৎস ছিল দুটি : (ক) সংঘের অভ্যন্তরগত—মানসিক প্রশান্তি ও স্থৈর্যের আদর্শকে উপলব্ধি করার জন্য, সংশয় ও অবিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে সত্যজ্ঞান লাভ করার জন্য উৎপন্ন নিয়ম (শীল) বা শিক্ষাপদসমূহ, এবং (খ) সংঘের বহির্বর্গগত—জনসাধারণের অভিযোগ প্রসূত নিন্দনীয় বিষয়গুলি থেকে বিরত থাকার জন্য উৎপন্ন নিয়ম (শীল) বা শিক্ষাপদ সমূহ। বৌদ্ধ ধর্ম সম্প্রদায়ের সংগে জন-সাধারণের সংযোগ থাকায় জনসাধারণই ছিলেন গণতান্ত্রিক আদর্শে প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধসংঘগুলির নিয়ম-কানুন ও রীতি-নীতির কঠোর সমালোচক। ভিক্ষুণীব্রত-ধারিণীদের তাঁরা শ্রদ্ধা ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন। ভিক্ষুণীরা ছিলেন তাঁদের কাছে আদর্শস্থানীয়া। সম্ভবতঃ সেই কারণেই ভিক্ষুণীদের সামান্যতম ত্রুটি বিচ্যুতিও তাঁদের কাছে ক্ষমার্হ ছিল না। ভিক্ষুণীদের আচার-আচরণ, গতিবিধি প্রভৃতির মধ্যে যা কিছু বিসদৃশ বলে তাঁদের মনে হত, তাই নিয়ে তাঁরা যে সব আপত্তি তুলতেন, অভিযোগ করতেন অবিলম্বে সেগুলির বুদ্ধদেবের কর্ণগোচর হত। তখন,

---

142 Early Monastic Buddhism, Vol 1 Dr N Dutta, pp 115—116

143 "অগিলানা ছত্তুপাহনং ধারেয্য," "অগিলানা যানেন যায়েয্য",
ভিক্খুনী প্রাতিমোক্খ, পাচিত্তিয়া ধম্মা, ৮৪, ৮৫

144 বিনয়পিটক, ৪ (এইচ, ওল্ডেনবার্গ), পৃঃ ২২৮

145 Early Monastic Buddhism, Dr N Dutta pp 298—304

146 চুল্লবগ্গো, ১০. ৫, ১, নালন্দা সংস্করণ।

ভবিষ্যতে যাতে এরকম পরিস্থিতির উদ্ভব না হয় তার জন্য বুদ্ধদেব হয় একটি নূতন নিয়ম প্রবর্তন করতেন অথবা কোনো প্রচলিত নিয়ম বাতিল করতেন কিংবা প্রয়োজন বোধে উক্ত নিয়মটিকে আরও কঠোর অথবা শিথিল করতেন। এই ভাবে ভাংগা-গড়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণীদের প্রতি প্রযোজ্য নিয়মগুলির সংখ্যা যে ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পেয়েছিল ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষই তার প্রমাণ (সে কথা সূত্রবিভঙ্গ গ্রন্থ পাঠে আরও স্পষ্ট ভাবে জানা যায়)।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, লোকোক্তিকে অল্প-বিস্তর স্বীকার করে বুদ্ধদেব সর্ব মানবের কল্যাণার্থে তাঁর ধর্ম প্রচার করেছিলেন, এক্ষেত্রেও সেই একই যুক্তি উত্থাপন করে বলা যায়—নারীরাও যাতে নির্মল-সুন্দর-পবিত্রজীবন লাভ করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে তিনি জনমতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা না করে ভিক্ষুণীদের জন্য নানা বিধি-নিয়ম প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর সেই উদ্দেশ্য সার্থক করেছিলেন সেই সব ভিক্ষুণীরা যাঁরা ছিলেন যথার্থ ভব-চক্র থেকে মুক্তিপ্রয়াসী, কায়মনোবাক্যে ত্রিশরণে শরণাগতা এবং যাঁরা বুদ্ধভাসিত 'অপ্পমাদ অমতপদং' (অপ্রমাদ অমৃতের পথ স্বরূপ), 'তে ঝাযিনো সাততিকা ' (সতত ধ্যাননিষ্ঠ ব্যক্তিগণ) 'পপ্পোতি বিপুলং সুখং (বিপুল সুখ অর্থাৎ মুক্তি বা নির্বাণ লাভ করেন) প্রভৃতি বাণী স্মরণ রেখে বুদ্ধদেব প্রদত্ত শিক্ষাপদগুলি নিষ্ঠা সহকারে পালন করেছিলেন। অপর পক্ষে বুদ্ধদেবের এই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছিল সেই ক্ষেত্রে, যে ক্ষেত্রের ভিক্ষুণীরা ছিলেন জীবের জন্মগত সংস্কার চতুষ্টয়ে (আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন) দৃঢ়ভাবে আবদ্ধা, এবং এই সংস্কার চতুষ্টয়ের গণ্ডীর বাইরে চিন্তা করার মত না ছিল তাঁদের মননশক্তি, না ছিল উন্নত মানের জীবনদর্শন সম্বন্ধে জানার কোনো আগ্রহ। কাম-ক্রোধাদি ষড়রিপুর তাড়নায় তাড়িতা 'ভিক্ষুণী' নামের কলঙ্কস্বরূপা এই শ্রেণীর ভিক্ষুণীরা সম্ভব প্রবৃত্তি, বিলাসব্যসন ও ভোগ্যবস্তুর প্রতি আসক্তিবশতঃ ছলে বা কৌশলে বুদ্ধদেব প্রদত্ত শিক্ষাপদগুলি লংঘন করে নিজেদের অভীষ্ট পূর্ণ করতেন, ফলে ঐ শ্রেণীর ভিক্ষুণীদের নানা অকার্য-কুকার্য ও দুর্নীতিতে সংঘজীবন কলুষিত হয়ে উঠেছিল। তবে সংঘজীবন কলুষিত হওয়ার মূলে কেবল মাত্র দুর্নীতিপরায়ণা ভিক্ষুণীরাই দায়ী ছিলেন না—দুর্নীতি পরায়ণ বৌদ্ধভিক্ষুগণ ও অসৎচরিত্র জনগণও যে সমানভাবে দায়ী ছিলেন সেকথা প্রাতিমোক্ষদ্বয় ও সূত্রবিভংগ গ্রন্থগুলি পাঠ করলে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। তথাপি একথা স্বীকার্য যে, ভিক্ষুণীসংঘের প্রতিষ্ঠা বুদ্ধদেবের এক বিশিষ্ট অবদান। বৌদ্ধভিক্ষু সংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ ভারতীয় সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক জগতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল। বৌদ্ধধর্মে নর-নারীর সমতা স্বীকৃত হওয়ার ফলে ভারতীয় সমাজজীবনেও যে এর প্রভাব সুদূর বিস্তারী হয়েছিল সে বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই।

চতুর্থ অধ্যায়

॥ কয়েকজন খ্যাতনাম্নী থেরীর জীবনচরিত ॥

ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির যে সমন্বয় তৎকালীন ভারতবর্ষের মানবগোষ্ঠীকে ধর্মীয় আবেগে অভিভূত করেছিল, সেই সমন্বয়ের ধারাটির মধ্যে নারীর অবদান কোনো ক্ষেত্রেই পুরুষের চেয়ে কম ছিল বলে মনে হয় না। ধর্মের ক্ষেত্রে বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর আত্মিক সমতা স্বীকৃতি পরিলক্ষিত হয়। কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেছেন যে, নারীদের সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের অত্যন্ত হীন ধারণা ছিল। কিন্তু থেরীগাথা গ্রন্থের গাথাগুলি পাঠ করলে বোঝা যায়, উক্ত ঐতিহাসিকগণের ঈদৃশ ধারণা কতখানি ভ্রমাত্মক[1]। পালিসাহিত্যের অংগুত্তর নিকায়, সংযুক্ত নিকায় প্রভৃতি গ্রন্থে, বুদ্ধদেব যে নর-নারীকে সমদৃষ্টিতে দেখতেন (বিক্ষিপ্তভাবে হলেও), তার বহুনিদর্শন পাওয়া যায়। পুরুষের মত নারীরাও আধ্যাত্মিক জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হোক, এই ইচ্ছা প্রকাশ করে পরম করুণাময় ভগবান বুদ্ধ বলেছিলেন যে যতদিন পর্যন্ত তাঁর ভিক্ষুণী শ্রাবিকাগণ ও গৃহস্থ উপাসিকাগণ, আর্যমার্গ প্রাপ্ত হবে নিপুণা, বিশারদা, বহুশ্রুতা ধর্মচারিণী, কর্তব্যপরায়ণা, যথার্থ পালনকারিনীরূপে অধর্মধ্বংসকারক ধর্মদেশনা করতে সমর্থা না হবেন ততদিন পর্যন্ত তিনি পরিনির্বাপিত হতে চান না[2]। বুদ্ধদেবের এই বাণী তাঁর পরিনির্বাণের পরেই বহু ধর্মপ্রাণা রমণী পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে এবং ইহ জন্মের একনিষ্ঠ সাধনবলে নিজ নিজ জীবনে সার্থক করে তাঁর কৃপাধন্যা হয়েছিলেন।

উক্ত সাধিকাগণ উপলব্ধি করেছিলেন যে, আধ্যাত্মিক জগতে চরম প্রাপ্তি অর্থাৎ নির্বাণ লাভের প্রধান অন্তরায় অবিদ্যা অর্থাৎ শাশ্বত সত্য সম্বন্ধে অজ্ঞানতা। এই অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্ত হয়ে জ্ঞানের জ্যোতির্ময় আলোকে প্রকৃত সত্যকে প্রত্যক্ষ করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন ক্ষুদ্র গণ্ডীবদ্ধ সংসার-জীবন ত্যাগ করে বন্ধনহীন পবিত্র ভিক্ষুণীজীবন গ্রহণ, কারণ অধ্যাত্ম সাধনার পক্ষে সংসার জীবন সাধারণতঃ অনুকূল হয় না। আত্মোন্নতির পথে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে সাংসারিক

---

1 থেরীগাথা (ভিক্ষু শীলভদ্রকৃত বঙ্গানুবাদ), মুখবন্ধ,
ডঃ নলিনাক্ষ দত্ত, পৃঃ ı/

2 পরিনিব্বান সুত্ত, ৩। ৪৬
রাজগুরু শ্রী ধর্মরত্ন মহাস্থবির, বিনয়বিশারদ কৃত (মূলসহ) বঙ্গানুবাদ,
পৃঃ ৮১—৮২ দ্রষ্টব্য।

নানা দায়-দায়িত্ব কর্তব্য প্রায়শঃ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। অবশ্য ভিক্ষুণীজীবনেও সাধনার পথে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী নানা মানসিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত আসে এবং সেগুলি উৎক্রমণের জন্য প্রয়োজন হয় সদাজাগ্রত উদ্যম ও আত্মনির্ভরতা বা পুরুষকার। ভিক্ষুণীব্রতধারিণীরা মানসিক দ্বন্দ্বসংঘাত জনিত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করার জন্য সেই নীতি শিখেছিলেন যে নীতি অবলম্বন করে মেধাবী উত্থান অপ্রমাদ সংযম ও দমের দ্বারা এমন দ্বীপ তৈরী করবেন যা মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতরূপ প্লাবনেও ধ্বংস হবে না[৩]।

বক্ষ্যমাণ থেরীগণ (=স্থবিরা অর্থাৎ জ্ঞানবৃদ্ধা) জেনেছিলেন যে, পঞ্চস্কন্ধ (রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা,সংস্কার ও বিজ্ঞান) থেকে উৎপন্ন এই সংসার, যা জীবকে আবদ্ধ করে রাখে। তাই তাঁরা সংসারের এই বন্ধনদশা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বুদ্ধদেব প্রদর্শিত অষ্টাংগিক মার্গ (অট্ঠংগিকমগ্‌গো) অবলম্বন করে ক্রমে ক্রমে কায, বাক্ ও চিত্তশুদ্ধি এবং সপ্ত বোধ্যংগ (-সত্ত বোজ্ঝংগ, যথা: প্রীতি, প্রশান্ধি, স্মৃতি, বীর্য, সমাধি, উপেক্ষা ও ধর্মবিচয়) ও ষড়ভিজ্ঞা (যথা: ঋদ্ধিবিধা, দিব্যশ্রোত্র, দিব্যচক্ষু, পরচিত্তবিভাজন, পূর্বনিবাসানুস্মৃতি এবং আস্রবক্ষয় জ্ঞান) লাভ করেছেন এবং স্কন্ধ, আয়তন ও ধাতুর বিশ্লেষণে তাদের অনিত্যতা ও অসারত্ব উপলব্ধি করে সম্যক্ জ্ঞানের (প্রকৃত জ্ঞানের) অধিকারিণী হয়ে অর্হত্ব প্রাপ্তা হয়েছিলেন।

পালিসাহিত্যে উল্লিখিত থেরীগণের জীবনকথা প্রধানতঃ থেরীগাথা ও অপাদান নামক গ্রন্থদ্বয়ে পাওয়া যায়। থেরীগাথা গ্রন্থের ভাষ্য পরমত্থদীপনীতেও থেরীদের জীবনকাহিনীর উল্লেখ করা হয়েছে, তবে সেগুলির অধিকাংশই অপাদান গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়ের অনুরূপ। অংগুত্তর নিকায় গ্রন্থের ভাষ্য মনোরথপূরণীতে বৌদ্ধ গৃহস্থ উপাসিকাদের জীবনচরিত সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ধম্মপদ গ্রন্থের ভাষ্য ধম্মপদট্ঠকথাতে কথা প্রসঙ্গে উল্লিখিত কয়েকজন ভিক্ষুণী ও উপাসিকার জীবনী লিপিবদ্ধ আছে।

পালিসাহিত্যে উপস্থাপিত খ্যাতনাম্নী থেরীগণের মধ্যে কয়েকজন ঋষিকল্পা থেরীর পুণ্যময় জীবনকথা নিম্নে বলা হল:

মহাপ্রজাবতী গোতমী।
(মহাপজাপতি গোতমী)

ভিক্ষুণীসংঘ স্থাপনের ইতিহাসে প্রথম ও প্রধান উদ্যোক্তা খ্যাতনাম্নী মহাপ্রজাবতী গোতমী ছিলেন দেবদহ নগরের সুপ্রবুদ্ধের (সুপ্পবুদ্ধ) কনিষ্ঠা·

---

3 "উট্ঠানেনপ্পমাদেন সঞ্ঞমেন দমেন চ।
দীপং কযিরাথ মেধাবী যং ওঘো নাভিকীরতি॥"
ধম্মপদ, অপ্পমাদবগ্‌গো, ৫

কন্যা। মহাপ্রজাবতী গোতমীর পূর্বে অন্য কোনোও বৌদ্ধ উপাসিকা বা অর্হত্ত্ব প্রাপ্তা নারীর নামের উল্লেখ পালি সাহিত্যে পাওয়া যায় না।

বুদ্ধদেবের পিতা শুদ্ধোদন তৎকালীন গণতন্ত্র মূলক শাক্যরাজ্যের নায়ক বা রাজা ছিলেন। তিনি সুপ্রবুদ্ধের অপর কন্যা মহামায়া বা মায়াদেবী নামে এক কন্যাকে প্রথমে বিবাহ করেন, পরে মায়াদেবীর কনিষ্ঠা ভগিনী মহাপ্রজাবতী গোতমীর সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। শাক্যরাজকুমার সিদ্ধার্থের জন্মের সাত দিন পরে যখন তাঁর মাতা মায়াদেবীর মৃত্যু হয় তখন মহাপ্রজাবতী গোতমী আপন গর্ভজাত পুত্র নন্দকুমার ও কন্যা সুন্দরী নন্দার লালন-পালনের ভার ধাত্রীর হস্তে সমর্পণ করে মাতৃহীন শিশু সিদ্ধার্থের পালনের সকল দায়িত্ব স্বয়ং গ্রহণ করেন[4]।

সিদ্ধার্থজননী মায়াদেবীর মৃত্যুর পর মহাপ্রজাবতী গোতমী শুদ্ধোদনের অগ্রমহিষীরূপে[5] প্রতিষ্ঠিতা হন।

কালক্রমে রাজপুত্র সিদ্ধার্থ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন, এবং বুদ্ধত্ব লাভের পর তিনি যখন প্রথম কপিলবস্তুতে আসেন তখন তিনি মহাধম্মপাল জাতক ধর্মদেশনা করেন। সেই ধর্মদেশনা শ্রবণ করে মহাপ্রজাবতী গোতমী স্রোতাপত্তি ফল লাভ করেন।

কালক্রমে শাক্যরাজ শুদ্ধোদনের মৃত্যু হল। স্বামীর মৃত্যুর পর মহাপ্রজাবতী গোতমী সংসার জীবনে বীতস্পৃহ হয়ে ওঠেন, এবং সংসার ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে মনস্থ করেন। শুদ্ধোদনের মৃত্যুর পর শাক্য ও কোলিয়দের মধ্যে যে সংঘর্ষ হয়, তার ফলে বহু শাক্যযোদ্ধা নিহত হন, ঐ সকল নিহত শাক্য যোদ্ধাদের বিধবাগণও মহাপ্রজাবতী গোতমীর অনুবর্তিনী হয়ে সংসার ত্যাগ করার সংকল্প করেন।

---

4 Manorattha Purani, Vol 1, P T. S, p. 340
Cf, Great Women of India, Ed by Swami Madhavananda and R C Mazumder, p 256

5 Great Women of India, Ed By Swami Madhavananda and R C. Mazumder, p 256.

উল্লেখ্য : মহাপ্রজাবতী গোতমীর প্রকৃত নাম গোতমী। শাক্যরাজকুমার সিদ্ধার্থের জন্মের সাত দিন পরে যখন তাঁর মাতার মৃত্যু হয় তখন গোতমীই ঐ মাতৃহারা শিশুকে আপন গর্ভজাত সন্তানের মত লালন-পালন করেন। এই জন্যই তাঁকে মহাপ্রজাবতী বলা হয়, কারণ বুদ্ধদেব সাধারণ প্রজা বা সন্তান নন, তিনি মহাসন্তান, মহাসন্তান বা মহাপ্রজার মাতা হওয়ায় গোতমী মহাপ্রজাবতী গোতমী (মহাপজাপতি গোতমী) নামে খ্যাত হন।

ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষ শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য, পৃঃ ৫৭

এরপর মহাপ্রজাবতী গৌতমী প্রাগুক্ত শাক্য রমণীগণ-সহ বুদ্ধদেবের নিকট উপস্থিত হয়ে, কিভাবে আনন্দের মধ্যস্থতায় এবং অষ্টগুরুধর্ম পালনের শর্ত সাপেক্ষে ভিক্ষুণী সংঘ স্থাপনের জন্য বুদ্ধদেবের অনুমতি লাভ করে ছিলেন সে বিবরণ বক্ষ্যমাণ অধ্যায়ের পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বলা হয়েছে।

আজীবন যে কঠোর আটটি নিয়ম পালনের অংগীকারে আবদ্ধ হয়ে মহাপ্রজাবতী গৌতমী বুদ্ধদেবের কাছ থেকে ভিক্ষুণীসংঘ স্থাপনের জন্য অনুমতি লাভ করেছিলেন, যে শর্তকে সানন্দে গ্রহণ করে আনন্দকে বলেছিলেন যে, তরুণ বয়সে যখন নব-নারীর দেহের প্রসাধনের প্রতি লক্ষ্য থাকে, তখন স্নানের পর পদ্ম পুষ্পের অথবা মল্লিকা পুষ্পের অথবা মালতী পুষ্পের মালা পেলে যেমন উভয় হস্তে তা গ্রহণ করে সেটি মস্তকে স্থাপন করে, তিনিও অনুরূপ ভাবে আটটি নিয়ম বা অনুশাসন গ্রহণ করলেন, তিনি আরও বললেন যে উক্ত নিয়মগুলি জীবনে তিনি কখনই লংঘন করবেন না[6]।

কিন্তু মনে হয়, ভিক্ষুণী সংঘ স্থাপনের অনুমতি লাভের আনন্দে মহাপ্রজাবতী গৌতমী উক্ত শর্তগুলি পালনের গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা করতে পারেন নি যে, তাঁর মত এমন একজন উচ্চ পর্যায়ের সম্ভ্রান্ত বংশীয়া নারীর পক্ষে প্রাগুক্ত অনুশাসনগুলি যথাযথ পালন করা কতখানি দুরূহ, বিশেষ করে তাঁর মত বর্ষীয়সী মহিলাগণকে কতখানি হীনতা স্বীকার করতে হয় কেবলমাত্র কাষায়বস্ত্রধারী অনভিজ্ঞ, অর্বাচীন ভিক্ষুদের কাছে। তাই একদিন মহাপ্রজাবতী গৌতমী আনন্দ সমীপে উপস্থিত হয়ে, ভিক্ষুণীদের কাছে ভিক্ষুদের প্রাপ্য সম্মান যথোচিত ভাবে প্রদর্শন করে বললেন যে, বুদ্ধদেবের নিকট তাঁর একটি প্রার্থনা আছে, সেটি হল—ভিক্ষুসংঘের নিয়মানুযায়ী ভিক্ষুরা যেমন পরস্পরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার ও যথাকর্তব্য করেন, উভয় সংঘের মধ্যেও যেন অনুরূপ ভাবে নিয়মটি প্রচলিত হয়। আনন্দ বুদ্ধদেবকে মহাপ্রজাবতী গৌতমীর উক্ত প্রার্থনাটি নিবেদন করলেন। কিন্তু আনন্দের মাধ্যমে মহাপ্রজাবতী গৌতমীর উক্ত প্রার্থনা প্রত্যাখান করে বুদ্ধদেব বললেন যে, যে অনুশাসন একবার প্রতিষ্ঠিত করা হয় তার প্রতি চিরকালই আনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে[7]।

---

6 "সেয্যথাপি, ভন্তে আনন্দ, ইত্থী বা পুরিসো বা দহরো, যুবা, মণ্ডনকজাতিকো সীসংনহাতো উপ্পলমালং বা বস্সিকমালং বা অতিমুত্তকমালং বা লভিত্বা উভোহি হত্থেহি পটিগ্গহেত্বা উত্তমঙ্গে সিরস্মিং পতিট্ঠাপেয্য, এবমেব খো অহং, ভন্তে, আনন্দ ইমে অট্ঠগরুধম্মে পটিগ্গণ্হামি যাবজীবং অনতিক্কমনীয়ে" তি। চুল্লবগ্গো, ১০. ২, ২, নালন্দা সংস্করণ।

7. চুল্লবগ্গো, ১০ ১, নালন্দা সংস্করণ।

একসময় যখন মহাপ্রজাবতী গোতমী রীতিসিদ্ধভাবে উপসম্পদা প্রাপ্তা হন নি বলে যে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল, সেই অভিযোগ শ্রবণ করে বুদ্ধদেব বলেছিলেন যে, অষ্টগুরুধর্ম পালনের স্বীকৃতির সময়েই মহাপ্রজাবতী গোতমী বুদ্ধদেব কর্তৃক উপসম্পদা প্রাপ্তা হয়েছেন এবং বুদ্ধদেবই তাঁর গুরু, আচার্য[8]। এই কথা বলার পর তিনি ব্রাহ্মণোচিত গুণসম্পন্না মহাপ্রজাবতী গোতমীর সম্বন্ধে উক্তি করেছিলেন—"যাঁর কায়, মন, বাক্যে পাপ নেই, যিনি এই ত্রিস্থানে সংযমশীল তাঁকে আমি ব্রাহ্মণ[9] বলি।"

পরবর্তী কালে জেতবনে ভিক্ষুসংঘের এক সম্মিলনে বুদ্ধদেব মহাপ্রজাবতী গোতমীকে ভিক্ষুণীগণের মধ্যে অভিজ্ঞতায় শ্রেষ্ঠা বলে অভিহিত করেছিলেন[10]।

ত্রিশরণে অকপট অনুগতা ও ধর্মে পরম নিষ্ঠাবতী মহাপ্রজাবতী গোতমী ভিক্ষুণীসংঘের শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন[11]। ভিক্ষুণীসংঘের সমস্ত ভিক্ষুণীদের পক্ষে তিনি মুখপাত্র স্বরূপা ছিলেন,—ভিক্ষুণীদের কোনো অভিযোগ থাকলে সে অভিযোগ কোনো এক ভিক্ষুর মাধ্যমে বুদ্ধদেবের কাছে জানাতে হত, কিন্তু মহাপ্রজাবতী গোতমীই ছিলেন এই নিয়মের একমাত্র ব্যতিক্রম। বুদ্ধদেবের নিকট স্বয়ং উপস্থিত হয়ে যে কোনো অভিযোগ জানাবার অধিকার মহাপ্রজাবতী গোতমীর ছিল[12]। তাঁরই অনুরোধে বুদ্ধদেব ভিক্ষুণীদের নিয়মিত স্নান করার অনুমতি দিয়েছিলেন, এবং নির্দিষ্ট মাপের (বিদত্থিষা) স্নানবস্ত্র (উদকসাটিকা) পরিধান করে ভিক্ষুণীরা তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট জলাশয়ে স্নান করার জন্য বুদ্ধদেব কর্তৃক অনুমতি প্রাপ্তা হয়েছিলেন।

ভিক্ষুদের চীবর ভিক্ষুণীরা পরিষ্কার করে দিতেন, ফলে অনেক সময় এই নিয়ে নানা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটত, এতে মহাপ্রজাবতী গোতমী অসন্তোষ প্রকাশ করায়

---

8 মনোরথপূরণী, ১, পি টি এস, পৃঃ ৩৪০

9 "যস্স কায়েন বাচায় মনসা নত্থি দুক্কতং।
সংবুতং তীহি ঠানেহি তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥"
ধম্মপদ, ২৬। ৯

দ্রষ্টব্যঃ
Buddhist Legends, Book 3,
E, W Burlingame, p 28

10 Samyutta Nikaya, 1 25

11 Early Buddhist Jurisprudence Durga Bhagvat, p 158

12 বিনয়পিটক, তৃতীয় খণ্ড (এইচ. ওল্ডেনবার্গ) পৃঃ ২০৪, ২০৫ এবং বিনয়পিটক চতুর্থ খণ্ড (এইচ ওল্ডেনবার্গ) পৃঃ ২৬২ দ্রষ্টব্য।

বুদ্ধদেব নিয়ম প্রবর্তন করলেন যে, আত্মীয়-সম্বন্ধ ছাড়া কোনো ভিক্ষুণীর দ্বারা কোনো ভিক্ষু নিজের পুরাতন চীবর পরিষ্কার করাতে বা রঞ্জিত করাতে পারবেন না[13]।

এক সময় মহাপ্রজাবতী গোতমী নিজের হাতে কার্পাসতুলো থেকে সুতো কেটে সেই সুতো দিয়ে বর্ষাকালীন বস্ত্র (বস্সা-সাটিকা) বয়ন করে সেই বস্ত্র বুদ্ধদেবকে স্বহস্তে ভক্তি-উপহারস্বরূপ অর্পণ করেছিলেন[14]।

একদা মহাপ্রজাবতী গোতমী যখন খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, তখন একদিন বুদ্ধদেব তাঁকে দেখতে যান, এবং তিনি কেমন আছেন জানতে চান। তখন মহাপ্রজাবতী গোতমী নিজের শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ না করে অনুযোগ করে বললেন যে, পূর্বে ভিক্ষুরা ভিক্ষুণীসংঘে এসে ভিক্ষুণীদের ধর্মোপদেশ দিতেন, কিন্তু বুদ্ধদেবের অনুজ্ঞায় সে ব্যবস্থা রহিত হওয়ায় এবং অসুস্থতাবশতঃ অন্যত্র ধর্মোপদেশ শ্রবণে যেতে অপারগ হওয়ায় মহাপ্রজাবতী গোতমী ধর্মোপদেশ শ্রবণ থেকে বঞ্চিত হয়ে আছেন। মহাপ্রজাবতী গোতমীর এই অভিযোগ শ্রবণ করে পূর্ব প্রচলিত নিয়মটির সংগে আরও একটি নতুন নিয়ম যোগ করে বুদ্ধদেব আদেশ দিলেন যে, যদি কোনো ভিক্ষুণী অসুস্থতাবশতঃ ধর্মোপদেশ শ্রবণ করতে যেতে অপারগ হন, তবে যে কোনো ইচ্ছুক ভিক্ষু ভিক্ষুণীসংঘে উপস্থিত হয়ে তাঁকে ধর্মোপদেশ দিতে পারবেন[15]।

থেরীগাথা গ্রন্থে দেখা যায়, মহাপ্রজাবতী গোতমী কয়েকটি গাথায়[16] বুদ্ধদেবকে তাঁর হৃদয়ের শ্রদ্ধা-ভক্তি নিবেদন করেছেন, এবং আর একটি গাথায় সেই মহীয়সী নারীর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন যে নারী বুদ্ধদেবের মত এমন একজন মহামানবকে জন্ম দিয়েছেন যিনি মানুষের ব্যাধি—মরণ জনিত দুঃখ নাশ করেছেন[17]।

মহাপ্রজাবতী গোতমী প্রজ্ঞা দ্বারা জেনেছিলেন যে, এই জন্মই তাঁর শেষ জন্ম।

---

13 "যো পন ভিক্খু অঞ্ঞাতিকায় ভিক্খুনিয়া পুরাণচীবরং ধোবাপেয্য বা রজাপেয্য বা আকোটাপেয্য বা নিস্সগ্গিযং পাচিত্তিযং।" ভিক্খুপাতিমোক্খ, নিস্সগ্গিয়া পাচিত্তিয়াধম্মা, ৪

14 মজ্ঝিমনিকায়, তৃতীয় খণ্ড, (পি টি এস) পৃঃ ২৫৩
তুলনীয়ঃ
মিলিন্দ প্রশ্ন (বঙ্গানুবাদ), ধর্মাধার মহাস্থবির, পৃঃ ২৩৪—২৩৬

15 ভিক্খুপাতিমোক্খ, পাচিত্তিয়াধম্মা, ২৩

16 থেরীগাথা, গাথা সংখ্যা ১৫৭—১৫৮

17. প্রাগুক্ত, গাথা সংখ্যা ১৬২

তাঁর আবশ্যকর্ম সকলই সমাপ্ত হয়েছে। তিনি নির্বাণ লাভ করার জন্য অর্থাৎ দেহত্যাগের জন্য বুদ্ধদেবের অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন[18]।

মহাপ্রজাবতী গোতমী যদিও বাগ্মীতায় তেমন দক্ষা ছিলেন না, তথাপি আন্তরিক প্রেরণায় তিনি বহু নারীকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষাদান করে তাঁদের ভবচক্র থেকে মুক্তির পথের সন্ধান দিয়েছিলেন।

পালি গোতমী অপদানে বলা হয়েছে যে, মহাপ্রজাবতী গোতমী একশত কুড়ি বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন[19]।

আম্রপালি (অম্বপালি) ঃ

লিচ্ছবিবংশজাত মহানাম[1] ছিলেন বৈশালীর এক সম্ভ্রান্ত নাগরিক। একদিন যখন তিনি তাঁর প্রমোদউদ্যানে ভ্রমণরত ছিলেন, তখন তাঁর উদ্যানপালক একটি সদ্যোজাত শিশুকন্যা সহ মহানামের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে জানায় যে, সে একটি আম্রবৃক্ষের মূলে শায়িত এই শিশুটিকে দেখে তাকে সেই স্থান থেকে তুলে নিয়ে এসেছে। মহানাম ছিলেন নিঃসন্তান। শিশুকন্যাটিকে দেখে বাৎসল্যরসে তাঁর হৃদয় পূর্ণ হয়ে ওঠায় সাগ্রহে উদ্যানপালকের হস্ত থেকে শিশুটিকে গ্রহণ করলেন এবং স্ত্রীর হস্তে তাকে অর্পণ করলেন। স্ত্রীও সাদরে শিশুকন্যাটিকে বক্ষে ধারণ করলেন। তদবধি শিশুটি এই নিঃসন্তান দম্পতীর স্নেহচ্ছায়ায় তাঁদের আপন কন্যারূপে প্রতিপালিত হতে লাগল[2]। অপাদান গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, আম্রশাখান্তরে ঔপপাতিক (স্বয়ং সম্ভবা) রূপে জন্মগ্রহণ করায় উক্ত শিশুকন্যাটির নাম রাখা হয় আম্রপালী (অম্বপালী)।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আম্রপালী অনিন্দ্যসুন্দরী হয়ে উঠলেন এবং শিক্ষা-সংস্কৃতি মূলক নানা বিদ্যার্জনের সঙ্গে নৃত্য-গীত-বাদ্যেও বিশেষ নিপুণতা লাভ[3]

---

18 অপদান (পি টি এস.), গাথা সংখ্যা ৪৬

19 গোতমী অপদান, গাথা সংখ্যা ১৩

তুলনীয় ঃ

"মহাপ্রজাবতী ধ্যানবলে অর্হত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ১২০ বৎসর বয়সে বুদ্ধের সমক্ষেই নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন।"

জাতক (বঙ্গানুবাদ), ঈশানচন্দ্র ঘোষ, পরিশিষ্ট, পৃঃ ১১৬

1 The Age of Imperial Unity, p. 568, Gilgit Mss. by N Dutt (Vol III Pt2) pp. 16-22

2 The Great Women of India, Ed by Swami Madhavananda and R C. Majumder, p 264

3 Paramattha Dipani, Vol V P T S. p. 135

করলেন। ক্রমে আম্রপালীর রূপ-গুণের খ্যাতি বিস্তৃত হল, ফলে তাঁকে লাভ করার জন্য বহু রাজপুত্র উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন, ক্রমে তাঁরা পরস্পরের মধ্যে কলহে প্রবৃত্ত হচ্ছেন দেখে মহানাম প্রমাদ গণলেন, কারণ কন্যার পাণিপ্রার্থীদের মধ্যে যাঁকেই তিনি বিমুখ করবেন তিনিই হয়ে উঠবেন মহানামের ঘোর শত্রু। উপায়ান্তর না দেখে তখন মহানাম এক সভা আহ্বান করলেন। সেই সভায় আম্রপালীর বিবাহ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে, সভাস্থ ব্যক্তিবর্গ আম্রপালীকে সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য মহানামকে অনুরোধ জানালেন। পিতার আদেশে কন্যা আম্রপালী সভায় উপস্থিত হলে সভাস্থ সকলে একবাক্যে স্বীকার করলেন যে, সর্বাঙ্গসুন্দরী আম্রপালী স্ত্রী রত্ন[4]।

বৈশালীতে তৎকালীন প্রচলিত নিয়মানুসারে সর্বাঙ্গসুন্দরী রমণী বিবাহ করতে পারতেন না—তিনি হতেন গণভোগ্যা[5]। অতএব সর্বাঙ্গসুন্দরী রমণীরূপে স্বীকৃতা আম্রপালীকেও এই প্রচলিত নিয়ম শৃঙ্খলে আবদ্ধা হতে হবে। এই সিদ্ধান্ত উক্ত সভায় গৃহীত হলে মহানাম অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হয়ে পড়লেন, কিন্তু সভায় গৃহীত এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনো রকম প্রতিবাদ করতেও সাহসী হলেন না। স্নেহময় পিতার মানসিক অবস্থা বিবেচনা করে আম্রপালী তখন কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে সভায় এই সিদ্ধান্ত স্বেচ্ছায় শিরোধার্য করে নিলেন। আম্রপালীর উক্ত শর্তগুলি ছিল নিম্নরূপ :

(ক) নগরের সর্বাপেক্ষা মনোরম স্থানে তাঁর গৃহ নির্মিত হবে,

(খ) একবারে একজন মাত্র তাঁর গৃহে প্রবেশাধিকার পাবেন,

(গ) তাঁর দর্শণী হবে প্রতি রাত্রির জন্য পাঁচশত কার্ষাপণ (কহার্পণ),

(ঘ) শত্রু বা কোনো অপরাধীর সন্ধানে সপ্তাহ অন্তে মাত্র একদিন তাঁর গৃহে অনুসন্ধান করা যাবে।

(ঙ) তাঁর গৃহে আগত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে কোনো অনুসন্ধান করা চলবে না।

আম্রপালীর উক্ত পাঁচটি শর্তই উক্ত সভা কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছিল[6]।

এরপর বারবিলাসিনীরূপে আম্রপালীর জীবনের নতুন অধ্যায় আরম্ভ হল। কালক্রমে তিনি প্রচুর অর্থ-সম্পদের অধিকারিণী হলেন। বিনয়পিটকে উল্লিখিত

---

4 The Age of Imperial Unity, pp 568—569

5 বৌদ্ধ রমণী, ডঃ বিমলাচরণ লাহা, পৃঃ ৩৬

তুলনীয় :

The Great Women of India, Ed by
Swami Madhavananda and R C Majumder, p 264

6 Great Women of India, Ed by
Swami Madhavananda and R C Majumder, p. 264

আছে যে আম্রপালী বিভিন্ন স্থান থেকে দক্ষ চিত্রশিল্পীদের আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন এবং তাঁদের দ্বারা বহু রাজা, মন্ত্রী, সম্ভ্রান্ত নাগরিক এবং ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠী গণের প্রতিকৃতি নিজ গৃহের প্রাচীরে অঙ্কিত করিয়েছিলেন। এই সকল প্রতিকৃতির মধ্যে মগধরাজ বিম্বিসারের প্রতিকৃতি দেখে আম্রপালী মোহিত হন এবং মগধরাজের সহিত মিলনের জন্য অধীর হয়ে ওঠেন[7]। অপর পক্ষে মগধরাজ বিম্বিসারও আম্রপালীর অপ্সরীতুল্য রূপের খ্যাতি শ্রবণ করে তাঁকে দেখার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী হন[8]। সেই সময় লিচ্ছবীদের সঙ্গে মগধরাজের সদ্ভাব ছিল না, কিন্তু আম্রপালীকে দেখার আগ্রহে তিনি সকল বাধা অগ্রাহ্য করে শত্রু রাজ্যের রাজধানী বৈশালীতে অবস্থিত আম্রপালীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন এবং সপ্তাহ কাল আম্রপালীর গৃহে নিরাপদে অবস্থানও করেছিলেন[9]।

মগধরাজ বিম্বিসারের ঔরসে আম্রপালীর গর্ভে এক পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। এই পুত্রটি বিম্বিসারের অন্যান্য পুত্রদের সহিত সমান মর্যাদায় রাজপ্রাসাদে লালিত-পালিত হয়। কালক্রমে আম্রপালীর পুত্র বৌদ্ধভিক্ষুসংঘে ভুক্ত হন এবং বিমল কৌণ্ডিণ্য (বিমল কোন্‌ডঞ্‌ঞ) নামে খ্যাত হন[10]। পুত্রের নিকট মাতা আম্রপালী ধর্মোপদেশ শ্রবণ করে বৌদ্ধধর্মে শ্রদ্ধাবতী হন, এবং অন্তর্দৃষ্টি লাভের জন্য তাঁর হৃদয় ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

অশীতিপর বয়সে বুদ্ধদেব যখন বৈশালীর আম্রপালীর আম্রকাননে অবস্থান করছিলেন সেইসময় এই সংবাদ শ্রবণ করে বুদ্ধদেবকে ভক্তিপূর্ণ প্রাণের প্রণতি জানাতে আম্রপালী সেই স্থানে গমন করেন। বুদ্ধদেবের চরণে প্রণতা আম্রপালীকে আশীর্বাদ করে বুদ্ধদেব তাঁকে ধর্মোপদেশ সহ মুক্তির পথ প্রদর্শন করলেন। মুক্তিপথের সন্ধান পেয়ে আম্রপালীর হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হল। যথারীতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক আম্রপালী সসংঘ বুদ্ধদেবকে তাঁর গৃহে পরদিবস আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করে (অধিবাসেতু মে ভন্তে ভগবা স্বাতনায় ভত্তং সদ্ধিং ভিক্খু-সংঘে নাতি) অভিবাদনান্তে স্বগৃহে ফিরে গেলেন[11]।

লিচ্ছবীরা যখন শুনলেন, বুদ্ধদেব ইতিমধ্যে আম্রপালীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন তখন তাঁরা আম্রপালীকে অনুরোধ করলেন—লিচ্ছবীদের কাছ থেকে শত সহস্র

7 The Age of Imperial Unity, p. 528

8 Ibid p 569

9 Vinaya Pitakam, 2, P T S p 171

10 Paramattha Dipani, Vol V P T. S pp 206—207

11. মহাপরিনিব্বান সুত্তং, ২। ১৬

মুদ্রা গ্রহণ করে আম্রপালী যেন এই নিমন্ত্রণ প্রত্যাহার করে নেন (দেহি জে অম্বপালি এত ভত্তং সতসহস্সেনাতি)।

লিচ্ছবীদের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আম্রপালী জানালেন যে, সমগ্র বৈশালী নগরের বিনিময়েও তিনি এই নিমন্ত্রণ প্রত্যাহার করবেন না[12]।

অতিথিসেবক হিসাবে বুদ্ধদেবের নিকট আম্রপালী অপেক্ষা লিচ্ছবীদের প্রাধান্য বেশী হতে পারে এই চিন্তা করে লিচ্ছবীরা বুদ্ধদেবকে অনুরোধ করলেন যে, বুদ্ধদেব যেন আম্রপালীর নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে লিচ্ছবীদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন[13]। কিন্তু বুদ্ধদেব লিচ্ছবীদের এ অনুরোধ রক্ষা করতে অসম্মত হলেন[14]। তখন লিচ্ছবীরা আম্রপালীর নিকট পরাজিত হওয়ার জন্য আক্ষেপ করতে থাকলে বুদ্ধদেব উপদেশদানে তাঁদের সকলকে শান্ত করলেন। অতঃপর বুদ্ধদেবকে যথারীতি অভিবাদন জানিয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে লিচ্ছবীরা ফিরে গেলেন[15]।

বুদ্ধদেব ভিক্ষুসংঘসহ নির্দিষ্ট দিনে বারাঙ্গনা আম্রপালীর গৃহে নানা উপচারে আহার গ্রহণ করেছিলেন[16]।

উপরোক্ত ঘটনা কয়েকটি তথ্যপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছে বলে উল্লেখ করা যায়—প্রথমতঃ বুদ্ধদেব যেন এক সম্ভ্রান্ত নাগরিকের নিমন্ত্রণরূপে বারবণিতা আম্রপালীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন, দ্বিতীয়তঃ গণভোগ্যা এক নারীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করার মধ্যে বুদ্ধদেবের আচরণে দ্বিধা বা বিব্রতভাবের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না, তাছাড়া দেখা যায়, কোনো অনুতপ্ত অপরাধীর কথা অথবা পরিত্যক্তা মানবীর অবস্থান্তরের কাহিনী বা অমঙ্গলকর পতিতাবৃত্তির অপকারিতা সম্বন্ধে নীতি উপদেশ এ ক্ষেত্রে অনুপস্থিত[17]। বরং দেখা যায়, বুদ্ধদেব ধর্মদেশনা দ্বারা আম্রপালীকে ভবচক্র থেকে মুক্তিলাভের জন্য পথ প্রদর্শন করলেন এবং আম্রপালীকে সেই পথ গ্রহণ করালেন[18]।

আম্রপালীর গৃহে বুদ্ধদেবের আহার সমাপ্ত হলে আম্রপালী তাঁর আরাম (আম্রকানন সহ বিহার) বুদ্ধদেব প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে দান করলেন এবং বুদ্ধদেবের

---

12 প্রাগুক্ত, ২। ১৮

13 Indian Women Through the Ages, P Thomas, p 94

14. মহাপরিনিব্বান সুত্তং, ২। ২১

15. প্রাগুক্ত

16. প্রাগুক্ত ২ । ২৩

17 Indian Women Through the Ages, P. Thomas, pp

18. মহাপরিনিব্বান সুত্তং ২। ২৩

অনুমতি ক্রমে ভিক্ষুণী সংঘভুক্তা হলেন[19]। আম্রপালীর দান বুদ্ধদেব গ্রহণ করলেন এবং আম্রপালীকে ধর্মবিষয়ক নানা প্রকার উপদেশ দান করলেন। আম্রপালীর উপবনে সসংঘ বুদ্ধদেব কয়েকদিন অবস্থান করে বেলুব গ্রামের অভিমুখে যাত্রা করলেন[20]।

ভিক্ষুণী ব্রতধারিণী ষড়াভিজ্ঞা (যথা: ঋদ্ধিবিধা, দিব্যচক্ষু, দিব্যকর্ণ এবং পরচিত্তবিভাজ্ঞান, পূর্বনিবাসানুস্মৃতি ও আস্রবক্ষয়জ্ঞান) সম্পন্না আম্রপালী অচিরেই অর্হত্ব লাভ করেন।

আম্রপালীর ভাষিত দার্শনিক ভাবযুক্ত ও কবিত্ব পূর্ণ অনেকগুলি গাথা থেরীগাথা ও অপদান নামক গ্রন্থদ্বয়ে লিপিবদ্ধ আছে।

আম্রপালী বুদ্ধদেবের অনুপ্রেরণায় যে উচ্চতর জীবনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছিলেন এবং দারিদ্র্যবরণের মাধ্যমে যে শান্তি লাভ করেছিলেন—আত্মত্যাগ ও বিশ্বাসের প্রতীকরূপে পালিসাহিত্যে তা ভাস্বর হয়ে আছে।

আম্রপালীর জীবনভাষ্য হল—জীবন ও যৌবন ক্ষণস্থায়ী। একমাত্র কর্তব্য পালনের অর্থাৎ অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলনের মাধ্যমে জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু সমন্বিত ভবচক্রের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। বস্তুতঃ বুদ্ধবাণীই আম্রপালীর জীবনবেদ।

ক্ষেমা (খেমা):

মদ্রদেশের (মধ্য পাঞ্জাব) সাগলের রাজবংশে ক্ষেমা জন্মগ্রহণ করেন[1]। অসাধারণ রূপলাবণ্যবতী ক্ষেমার গাত্রবর্ণ ছিল গলিত স্বর্ণের ন্যায় মনোহর উজ্জ্বল[2]। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে মগধরাজ বিম্বিসারের সহিত ক্ষেমার বিবাহ হয়। নৃপতি বিম্বিসারের তিনি অগ্রমহিষী ছিলেন।

বিম্বিসার ছিলেন বুদ্ধদেবের পরমভক্ত ও বুদ্ধদেবের ধর্মমতের প্রধান সমর্থক[3]। কিন্তু রূপগর্বিতা রাজমহিষী ক্ষেমা বৌদ্ধধর্মে শ্রদ্ধাশীলা ছিলেন না, এমন কি বুদ্ধদেবকে দর্শন করার বিন্দুমাত্র অভিলাষও তাঁর ছিল না, কারণ তিনি শুনেছিলেন যে, দেহগত রূপ-সৌন্দর্যের কোনো মূল্যই বুদ্ধদেব দেন না[4]। বুদ্ধদেব সম্বন্ধে

19 মহাপরিনির্বাণ সুত্ত ২। ২৩

20 তদেব, ২। ২৫

1. Great Women of India, Ed by Swami Madhavananda and R C. Majumder, p 257

2 Paramattha Dipani, Vol V P. T S, p. 197

3 Early Monastic Buddhism, Vol I Dr Nalinaksha Dutta, 111

4 Buddhist Legends, Part III, Burlingame, p 225

ক্ষেমার এই মনোভাব বিম্বিসার জ্ঞাত ছিলেন, তথাপি তিনি চাইতেন যে, ক্ষেমা বুদ্ধদেবের চরণে প্রণতা হোন। এই জন্য ক্ষেমাকে বুদ্ধদেব দর্শনে আগ্রহী করে তুলতে তিনি এক কৌশল অবলম্বন করলেন—রাজপুরীর গায়কদের আদেশ করলেন যে, তারা যেন সঙ্গীতের মাধ্যমে বেণুবন[5] উদ্যানের সৌন্দর্য এমনভাবে কীর্তন করে যাতে ক্ষেমার মনে বেণুবনের সৌন্দর্য দেখার বাসনা জাগ্রত হয় এবং ফলে হয়ত ক্ষেমা বেণুবন দেখতে যেতে পারেন। মগধরাজের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। বেণুবনের সৌন্দর্য কীর্তনকারী সঙ্গীত শ্রবণ করতে করতে ক্রমে ক্ষেমা বেণুবন দেখার জন্য উৎসুক হয়ে উঠলেন। এবং একদিন বিম্বিসারের নিকট ঐ উদ্দেশ্যের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলেন। রাজা তৎক্ষণাৎ মহিষীকে অনুমতি প্রদান করে তাঁকে অনুরোধ করে বললেন যে, ক্ষেমা যেন বেণুবনে গিয়ে বুদ্ধদেবের চরণে শ্রদ্ধা নিবেদন করে আসেন। ক্ষেমা বিম্বিসারের এই কথার কোনো উত্তর না দিয়েই বেণুবন দর্শনার্থে যাত্রা করলেন, এবং সারাদিন উদ্যান সৌন্দর্য দর্শন জনিত আনন্দে যাপন করে প্রাসাদে ফিরে যাবার ইচ্ছায় তাঁর রাজকীয় যানে আরোহণ করলেন। কিন্তু বিম্বিসারের পূর্ব নির্দেশানুসারে রথের সারথি রাজ-প্রাসাদের অভিমুখে রথচালনা না করে বেণুবনের যে স্থানে এক সভায় বুদ্ধদেব ধর্মোপদেশ দান করছিলেন সেই স্থানে রথ নিয়ে উপস্থিত হল।

ক্ষেমা যে বুদ্ধদেবের নিকট উপস্থিত হবেন একথা সর্বজ্ঞ বুদ্ধদেব জানতেন। কিন্তু দেহের রূপ-যৌবন সম্বন্ধে ক্ষেমার যে ভ্রান্তধারণা, তা দূরীকরণের জন্য বুদ্ধদেব তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা বলে এক অপূর্ব সুন্দরী মানবী মূর্তি সৃষ্টি করলেন[6]।

বিম্বিসারের কৌশলে সারথি কর্তৃক এই ভাবে সেইস্থানে নীতা হয়ে ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও ক্ষেমা রথ থেকে অবতরণ করলেন। তিনি যখন বুদ্ধদেবের সমীপ-বর্তিনী হলেন তখন বুদ্ধদেবের পাশে দণ্ডায়মানা তালবৃন্ত দ্বারা বীজনরতা সর্বাংগ সুন্দরী এক রমণীর প্রতি সর্বাগ্রে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হল। উক্ত রমণীটির রূপলাবণ্যের সঙ্গে নিজের রূপ-লাবণ্যের তুলনা করে ক্ষেমা নিজেকে ধিক্কার দিয়ে চিন্তা করলেন যে, সৌন্দর্যের দিক থেকে বিচার করলে ঐ অপূর্ব সুন্দরীর

---

5 মগধরাজ বিম্বিসার কর্তৃক বৌদ্ধসংঘে উপহৃত উদ্যান।
মহাবগ্গো, ১ ১৬, নালন্দা সংস্করণ।
দ্রষ্টব্য: রাজগৃহের কলন্দকনিবাপ নামক স্থানের দক্ষিণদিকে বেণুবন অবস্থিত। বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম, ডঃ শ্রীঅনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১৪৫

6. Theri Apadana, M E. Lilley, p. 548

দাসী হওয়ার যোগ্যতাও তাঁর নেই। বুদ্ধদেবের ধর্মোপদেশ ক্ষেমার কিছুই কর্ণ-গোচর হচ্ছিল না। এক দৃষ্টে তিনি কেবল ঐ ভুবনমোহিনী নারীমূর্তিটিকে বিহ্বল হয়ে দেখছিলেন, এই ভাবে দেখতে দেখতে ক্ষেমা দেখলেন—দৃশ্যমানা সেই সুন্দরী যুবতী-রমণীর দেহ ক্রমে ক্রমে যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্বে, বার্ধক্যে তারপর গলিত দন্ত পলিতকেশ লোলচর্ম বৃদ্ধায় পরিণত হল। অবশেষে তালবৃন্তসহ ঐ রমণীমূর্তিটি ভূমির ওপর লুটিয়ে পড়ল। ঐ সুন্দর দেহের এমন ক্রমপরিণতি দেখে ক্ষেমা তখন উপলব্ধি করলেন যে, পার্থিবরূপ স্থায়ী হয় না। তাঁর নিজের এই সুন্দর দেহেরও যে ঐ অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হবে সে কথাও তিনি স্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে পারলেন।

বুদ্ধদেব ক্ষেমার চিন্তাধারা জ্ঞাত হয়ে বুঝলেন, ক্ষেমার ভ্রান্তধারণার নিরসন হয়েছে, তখন তিনি ক্ষেমাকে বললেন যে, দৈহিক রূপ-যৌবন চিরস্থায়ী হয়—ক্ষেমার এই ধারণা যে ভুল তার চাক্ষুস প্রমাণ ক্ষেমা পেলেন। এরপর বুদ্ধদেব ক্ষেমাকে উপদেশ দিয়ে বললেন—স্বকৃত[7] জালে মাকড়সার নিম্নগতির মত কামাসক্তগণের অধঃপতন হয়। কিন্তু যাঁরা সমস্ত শৃঙ্খল মোচন করে মুক্ত, যাঁদের চিত্ত পরমার্থে সংলগ্ন হয়েছে, তাঁরা সংসার ত্যাগ করে ভোগসুখ পরিহার করেন।

বুদ্ধদেবের উপদেশ শ্রবণে ক্ষেমা স্রোতাপত্তি ফল লাভ করলেন অর্থাৎ নির্বাণ-লাভের প্রথম সোপানে আরোহণ করলেন। ক্রমে ক্ষেমার হৃদয়ে ভিক্ষুণীসংঘে প্রবেশের জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে উঠল, তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণের জন্য স্বামীর অনুমতি প্রার্থনা করলেন। বিম্বিসার অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে ক্ষেমাকে অনুমতি দিলেন এবং স্বর্ণশিবিকায় রাজমহিষী ক্ষেমাকে ভিক্ষুণীসংঘে প্রেরণ করলেন[8]।

ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণের পর জ্ঞানার্জনই ছিল স্থবিরা ক্ষেমার (থেরী খেমা) তপস্যা। পালি সাহিত্যের কয়েক স্থানে ক্ষেমাকে পট্‌ঠা (ধর্মশিক্ষিকা) এবং ভাণিকা (বাগ্মী), সংযুক্ত নিকায় গ্রন্থে চিত্তকথী[9] (বাকাকুশলা) এবং অংগুত্তর নিকায় গ্রন্থে মহাপঞ্‌ঞা (মহাপ্রজ্ঞা)[10] রূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

---

7 "যে রাগরত্তানুপতন্তি সোতং সযং কতং মক্কটকোব জালং।
এতম্পি ছেত্বান বজন্তি ধীরা অনপেক্খিনো সব্বদুক্খং পহায।।"

ধম্মপদ, তণ্হা বগ্গো, ২৪। ১৪

দ্রষ্টব্য : Buddhist Legends, Burlingame, Book 3, p 253

8 Paramattha Dipani, Vol V, P T S pp 127–128

9 Samjukta Nikaya (P. T. S), 44-10, 1

10 Anguttara Nikaya (P T, S), 1 25

প্রকৃত জ্ঞানীরূপে ক্ষেমার প্রতিষ্ঠা লাভের পর, কোশলরাজ প্রসেনজিৎ একদা ক্ষেমার সঙ্গে এক তাত্ত্বিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হন, এবং তাঁর জ্ঞানের গভীরতা অনুধাবন করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় প্রসেনজিতের চিত্ত আপ্লুত হয়ে ওঠে।

পরবর্তীকালে জেতবন বিহারে এক আর্য-সম্মিলনে সসংঘ বুদ্ধদেব কর্তৃক ক্ষেমা থেরীগণের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টিতে[11] সর্বশ্রেষ্ঠারূপে স্বীকৃতা হন।

একসময় বুদ্ধদেব যখন গৃধ্রকূট (গিজ্ঝকূট) পর্বতে অবস্থান করছিলেন, সেই সময় একদিন তিনি যখন দেবরাজ শক্র ও অন্যান্য দেবতাগণকে ধর্মোপদেশ দান করছিলেন, তখন ক্ষেমা বুদ্ধদেবকে প্রণতি জানাবার জন্যে আসছিলেন, কিন্তু দূর থেকে শক্র প্রমুখ অন্যান্য দেবতাগণকে বুদ্ধদেবের সম্মুখে উপবিষ্ট দেখে সেই স্থানেই স্থিত হয়ে বুদ্ধদেবকে প্রণাম জানিয়ে ফিরে গেলেন। শক্র তা লক্ষ্য করে উক্ত মহিলাটি কে জানতে চাওয়ার উত্তরে বুদ্ধদেব বললেন যে উক্ত মহিলাটি তাঁর মেধাবী ও প্রগাঢ় জ্ঞানী কন্যা ক্ষেমা, যে প্রকৃত পথ বিপথের কথা জানে। ক্ষেমার মধ্যে যে ব্রাহ্মণোচিত গুণ বর্তমান সে কথার উল্লেখ করে বুদ্ধদেব বললেন—'যিনি প্রগাঢ় জ্ঞানী, মেধাবী, সত্যাসত্য পক্ষের দূরদর্শী এবং যিনি উত্তমপদ (অর্হত্ব) লাভ করেছেন তাঁকে আমি ব্রাহ্মণ[12] বলি।'

জ্ঞান গরিমা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল ক্ষেমার প্রভাব মদ্রদেশ ও মগধে যথেষ্ট পরিমাণে বিস্তৃত হয়েছিল, এবং তিনি প্রচুর জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছিলেন।[13]

অর্হত্বপ্রাপ্তা ক্ষেমা ভিক্ষুণী একদিন যখন নির্জন অরণ্যের ছায়াস্নিগ্ধ এক ...ুলে বসে দিপ্রাহরিক বিশ্রাম করছিলেন, তখন 'মার' তরুণের বেশে সেখানে উপস্থিত হয়ে ক্ষেমাকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করলে তিনি কটু তিরস্কারসহ তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে মারকে পরাজিত করেন। এই প্রসঙ্গে ক্ষেমার রচিত কয়েকটি গাথা থেরীগাথা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে[14]।

---

11 থেরীগাথা, ভিক্ষু শীলভদ্রকৃত বঙ্গানুবাদ, পৃঃ ৭৭

12 "গম্ভীরপঞ্ঞং মেধাবিং মগ্গামগ্গস্স কোবিদং।
উত্তমত্থং অনুপ্পত্তং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং ॥"
ধম্মপদং ব্রাহ্মণবগ্গো, ২৬। ২১

দ্রষ্টব্য : Buddhist Legends, Burlingame, Book 3, p, 192

13 Women under Primitive Buddhism, I B Horner, p 376
Cf, Psane of the sisters, Mrs Rhys Davids, p 48

14 থেরীগাথা, নালন্দা সংস্করণ, গাথা সংখ্যা ১৩৯—১৪৩,

মারকে পরাজিত করার পর আনন্দ উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে ক্ষেমা গাইলেন—

"আমি সর্বোত্তম পুরুষ বুদ্ধের পূজা করি, বুদ্ধ-শাসন পালন করে সর্ব দুঃখ থেকে মুক্ত হয়েছি[15] ।"

পটাচারা ঃ

পালিসাহিত্যে উল্লিখিত বিনয়ধরী পটাচারা থেরীর পূর্বজীবন অর্থাৎ গার্হস্থ্য-জীবন বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। শ্রাবস্তী[1] (সাবত্থী) নগরের রাজকোষাধ্যক্ষের কন্যারূপে পটাচারা জন্মগ্রহণ[2] করেন। পরমরূপবতী কন্যা পটাচারা যখন যৌবনে পদার্পণ করলেন, তখন তাঁর পিতা কন্যার নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে এক সপ্ততল বিশিষ্ট প্রাসাদের সর্বউচ্চতলে পটাচারার বাস করার জন্য ব্যবস্থা করে দিলেন, এবং সতর্কতার সঙ্গে কন্যার সেবাপরিচর্যা করার জন্য কয়েকজন দাস দাসী নিযুক্ত করলেন। কিন্তু এত সাবধানতা সত্ত্বেও পটাচারা তাঁর পিতার এক তরুণ গৃহভৃত্যের প্রতি প্রণয়াসক্ত[3] হয়ে পড়লেন।

ইতিমধ্যে পটাচারার পিতা কুল-শীল-মান মর্যাদায় তাঁরই সমকক্ষ এক যুবকের সংগে পটাচারার বিবাহের কথাবার্তা বলে এমন কি বিবাহের দিনও ধার্য করে ফেললেন। এই সংবাদ যখন পটাচারার কর্ণগোচর হল তখন তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে গোপনে তাঁর প্রণয়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর সমস্যার কথা প্রণয়ীটিকে জানালেন এবং দুজনে পরামর্শ করে স্থির করলেন কি ভাবে তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত[4] হবেন।

---

15 "অহং চ খো নমস্সন্তী সম্মুখং পুরিসুত্তমং
পমুত্তা সব্বদুক্খেহি সত্থুসাসন কারিকা" তি,
থেরীগাথা, নালন্দা সংস্করণ, গাথা সংখ্যা ১৪৪

1 প্রাচীন অচিরবতী নদীর তীরে অবস্থিত শ্রাবস্তী (বর্তমানে সাহেত-মাহেত নামে খ্যাত) ষোড়শ মহাজন-পদের অন্যতম কোশল জনপদের প্রধান নগর ছিল। বুদ্ধদেবের সময়ে কোশলের রাজা ছিলেন প্রসেনজিৎ।

শ্রাবস্তী নগরে বুদ্ধদেব তাঁর জীবনের পঁচিশটি বর্ষাবাস করেছিলেন। এই স্থানটি বৌদ্ধ-ধর্মসম্প্রদায়ের প্রধান তীর্থস্থানের অন্যতম।

বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম, ডঃ শ্রীঅনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১৪২

2 Great Women of India, Ed by Swami Madhavananda and R C. Mazumder, p 259

Cf, Paramattha Dipani, Vol V P. T. S pp 108—112

3 Buddhist Legends, Book-2, Burlingame p 250

4 Ibid

পরদিন জল আনার ছল করে পটাচারা পিতৃগৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষমান প্রণয়ীর সঙ্গে মিলিত হলেন এবং উভয়ে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এক ক্ষুদ্র পল্লীতে আশ্রয় নিলেন।

উক্ত গৃহ-ভৃত্যটির সঙ্গে পটাচারার বিবাহ হয়েছিল কি না সে সম্বন্ধে পালি-সাহিত্যে কোনো উল্লেখ পাওয়া না গেলেও পটাচারা তাঁর প্রণয়ীকে স্বামী বলে উল্লেখ করে তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন এ কথার উল্লেখ পালি-সাহিত্যের অন্তর্গত থেরীগাথার টীকা পরমত্থদীপনীতে[5] পাওয়া যায়। এই হিসাবে পটাচারাকে ভিক্ষুণীসংঘের বিবাহিতা নারীদের মধ্যে একজন বলে গণ্য করা হয়[6]।

ধনীকন্যা পটাচারা আবাল্য সুখ-স্বাচ্ছন্দের মধ্যে প্রতিপালিত হলেও দরিদ্র পল্লীতে দরিদ্র স্বামীর সঙ্গে সংসারী হয়ে বসবাস করতে লাগলেন। কালক্রমে পটাচারা গর্ভবতী হলেন। প্রসবের সময় নিকটবর্তী হলে তিনি পিতৃগৃহে যাবার জন্য স্বামীর কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন এবং বললেন যে, এক্ষেত্রে সাহায্য করার মত যখন লোকাভাব, তখন পিতৃগৃহে ফিরে যাওয়াই শ্রেয়ঃ, কারণ শত অন্যায় করলেও সন্তানের প্রতি মাতাপিতা সতত‌ই স্নেহপরায়ণ থাকেন। কিন্তু প্রভুকন্যাহরণজনিত অপরাধ বোধে ক্লিষ্টচিত্ত পটাচারার স্বামী দণ্ড পাবার আশংকায় পটাচারার এ প্রস্তাবে সম্মত হতে পারলেন না।। উপায়ন্তর না দেখে পটাচারা তখন স্বামীর অগোচরে একাকী পিতৃগৃহের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

পটাচারার স্বামী প্রতিবেশীদের কাছে এই সংবাদ জেনে অনুতপ্ত চিত্তে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার জন্য পটাচারার অনুসরণ করলেন। কিছু পথ অতিক্রম করার পর তিনি পটাচারাকে দেখতে পেয়ে ত্বরিত গতিতে পটাচারার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁকে নিজ গৃহে ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু পটাচারা স্বামীর কথায় কর্ণপাত না করে এগিয়ে চললেন দেখে নিরুপায় স্বামী তাঁর সঙ্গে পথ চলতে লাগলেন। পথচলাকালীন একসময় পটাচারা প্রসববেদনায় কাতর হয়ে পড়াতে তাঁরা উভয়েই সেই স্থানেই থামলেন। পটাচারা নির্বিঘ্নে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। এখন আর পিতৃগৃহে ফিরে যাবার কোনো প্রয়োজন নেই—এই সিদ্ধান্ত করে পুত্র কোলে পটাচারা স্বামীসহ স্বামীগৃহে ফিরে গেলেন।

পটাচারা দ্বিতীয়বার গর্ভবতী হলেন। এবারেও প্রথম বারের মত‌ই ঘটনা ঘটল। তবে যেন বিপদ চারিদিক থেকে তাঁদের আক্রমণ করল। পথেই তাঁরা এক প্রবল ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে পড়লেন। এই দুর্যোগের মধ্যে পটাচারার প্রসববেদনা শুরু হয়ে গেল। পটাচারার করুণ অবস্থা দেখে তাঁর স্বামী বিচলিত হয়ে চিন্তা করলেন—

---

5 Paramattha Dipani, Vol V, P T S p, 99

6 Women under Primitive Buddhism, I B, Horner, p 195

পথ পার্শ্বের অরণ্য থেকে কিছু শাখা-প্রশাখা সংগ্রহ করে আপাততঃ একটি আশ্রয় রচনা করে সেখানে পটাচারাকে রাখবেন। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি কুঠার হস্তে বন মধ্যে প্রবেশ করলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আর ফিরলেন না, সর্পাঘাতে সেই স্থানেই তাঁর মৃত্যু হল।

এদিকে গভীর উদ্বেগে স্বামীর অপেক্ষায় অপেক্ষামানা পটাচারার দ্বিতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। ভয়ে ভাবনায় বিবর্ণা পটাচারা শিশু দুটিকে বক্ষে চেপে ভূমিতে অবনত দেহে সেই দুর্যোগময় রাত্রি অতিবাহিত করলেন। রাত্রি অবসানে অতি প্রত্যুষে শিশুদুটিকে নিয়ে স্বামীর সন্ধানে পটাচারা অরণ্যে প্রবেশ করলেন এবং মৃত অবস্থায় স্বামীকে দেখতে পেলেন। স্বামীর মৃতদেহ সেই অরণ্যের মধ্যেই পড়ে রইল —পটাচারা বিলাপ করতে করতে দুই পুত্র সহ পিত্রালয়ের অভিমুখে পুনরায় পথ চলতে লাগলেন। ক্রমে তিনি অচিরবতী[7] নদীর তীরে উপস্থিত হলেন। ক্ষীণস্রোতা এই নদী পদব্রজে পার হওয়া যায়। কিন্তু গত রাত্রের প্রবল বর্ষণে অচিরবতীর জল বৃদ্ধি পেয়েছে দেখে পটাচারা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অত্যধিক মানসিক অবসাদ ও শারীরিক দুর্বলতাবশতঃ পটাচারা একই সঙ্গে দুটি শিশু সহ নদী উত্তরণে অসমর্থা হয়ে বড়টিকে নদীর এপারে রেখে ছোটটিকে নিয়ে তিনি নদীর ওপারে পৌঁছলেন এবং একটি বৃক্ষশাখা সংগ্রহ করে সেটি ভূমিতে প্রোথিত করে তার ছায়াতলে শিশুটিকে শুইয়ে রেখে বড়টিকে আনবার জন্য নদীতে নেমে যখন নদীর মাঝবরাবর এসেছেন তখন তিনি দেখতে পেলেন—একটি শ্যেনপক্ষী শায়িত শিশুটিকে আক্রমণ করার চেষ্টা করছে। পটাচারা সেইখানেই দাঁড়িয়ে বাহু আন্দোলন এবং মুখে শব্দ করে শ্যেনপক্ষীটিকে তাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলেন। এপারে বড় ছেলেটি পটাচারাকে ঐভাবে বাহু আন্দোলন করতে দেখে হয়ত মনে ভাবল মা বুঝি তাকে ডাকছেন। উত্তেজনা বশে এগিয়ে আসতে গিয়ে সে নদীর জলে পড়ে গেল এবং নদীর স্রোতের প্রবল টানে ভেসে গেল। ওদিকে পটাচারার বড় ছেলেটির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ার সুযোগে শ্যেনপক্ষীটি শিশুটিকে নখবদ্ধ করে আকাশ পথে উড্ডীন হল। এই ভাবে পটাচারা একই সঙ্গে দুটি শিশুকেই হারালেন। স্বামী-পুত্র হারা পটাচারা অবশেষে শ্রাবস্তী নগরে এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু সেখানেও এক দুঃসংবাদ তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। শ্রাবস্তীতে পদার্পণ

---

7 অচিরবতী নদী বর্তমানে রাপ্তীনদী নামে পরিচিত। এই নদীর দক্ষিণে যে আম্রকানন অবস্থিত ছিল, সেই স্থানে বুদ্ধদেব মধ্যে মধ্যে এসে অবস্থান করতেন। এই স্থানেই বুদ্ধদেব তাঁর তেবিজ্জ সুত্ত দেশনা করেছিলেন।

Dictionary of Pali Proper Names, G P Malalasekhar, p 25

করেই পটাচারা অবগত হলেন যে, পূর্বরাত্রের জাতবর্ষণের ফলে তাঁর পিতৃগৃহ ভূমিস্যাৎ হয় এবং গৃহপতনের ফলে একই সঙ্গে পটাচারার মাতা-পিতা ও ভ্রাতার মৃত্যু ঘটে।

এইভাবে বার বার শোকের অভিঘাতে পটাচারা আর সহ্য করতে পারলেন না— তাঁর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটল। অংগের বসন যে কখন স্খলিত হয়ে গেল তা-ও তিনি জানতে পারলেন না। বিবসনা, বদ্ধ উন্মাদ এই নারীকে দেখে কেউ 'দূর' 'দূর' করে কেউবা ধূলাবালি নিক্ষেপ করে তাঁকে লক্ষ্য করে, আবার কেউবা আবর্জনা ফেলে দেয় উন্মাদিনী পটাচারার নগ্নদেহে। কিন্তু পটাচারার কোনো কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি মৃত মাতা-পিতা-ভ্রাতা-স্বামী-পুত্রের জন্য বিলাপ করেন এবং পথে পথে ঘুরে বেড়ান।

এমনি ভাবে পথে ঘুরতে ঘুরতে পটাচারা একদিন যখন শ্রাবস্তীর জেতবনে[৪] উপস্থিত হলেন তখন সেই সময় শ্রোতৃমণ্ডলী পরিবেষ্টিত বুদ্ধদেব ধর্মদেশনা করছিলেন। পটাচারা বুদ্ধদেবের সম্মুখে উপস্থিত হলে তিনি পটাচারাকে আশীর্বাদ করে বললেন—"ভগিনী, তুমি স্মৃতি পুনঃপ্রাপ্ত হও।" বুদ্ধদেবের অলৌকিক শক্তির প্রভাবে পটাচারা তাঁর হৃত স্মৃতি ফিরে পেলেন এবং নিজের সম্পূর্ণ নগ্নদেহ দেখে লজ্জায় সংকুচিত হয়ে সেই স্থানেই ভূমিতে বসে পড়লেন। সেই স্থানে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একজন নিজের গাত্রবস্ত্র পটাচারাকে দান করলেন; সেই বস্ত্রে পটাচারা দেহ আবৃত করে বুদ্ধদেবের চরণে লুণ্ঠিতা হয়ে নিজের দুর্ভাগ্যের কাহিনী তাঁকে নিবেদন করলেন। বুদ্ধদেব সেই শোকাতুরা রমণীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন যে, পটাচারার হৃতধনের অর্থাৎ তাঁর মৃত মাতা-পিতা-ভ্রাতা-স্বামী-সন্তানের পুনরুদ্ধারের আর কোনো আশা নেই। এই জন্মে যে শোকহেতু পটাচারা অশ্রুবর্ষণ করছেন সেই রকম শোকে গত অগণ্য জন্মে তাঁকে যে অশ্রুপাত করতে হয়েছে তার পরিমাণ চারটি মহাসমুদ্রের একত্রীভূত বারি অপেক্ষাও অধিক। তারপর

---

৪ জেতবন—এটি প্রথমে রাজকুমার জেতের প্রমোদউদ্যান ছিল। বুদ্ধদেবের প্রধান গৃহীউপাসকগণের অন্যতম ধনকুবের সুদত্ত শ্রেষ্ঠী (পরে অনাথপিণ্ডদ নামে খ্যাত) এই উদ্যানটি জেত রাজকুমারের নিকট থেকে পঞ্চান্ন কোটি সুবর্ণ মুদ্রায় ক্রয় করে সেখানে একটি সুরম্য বিহার নির্মাণ করেন, এবং সেটি বুদ্ধদেব প্রমুখ বৌদ্ধসংঘকে দান করেন

মহাপরিনিব্বান সুত্তং, (মূল সহ বংগানুবাদ), রাজগুরু শ্রীধর্মরত্ন মহাস্থবির, পরিশিষ্ট, পৃঃ ২৩৮

তুলনীয়ঃ বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম,... ডঃ শ্রীঅনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১৪২

বুদ্ধদেব পটাচারাকে পুনরায় উপদেশ দিয়ে বললেন —[9] ত্রাণ করতে পুত্রগণ বা পিতা অথবা বন্ধুগণ কেউই নেই। মৃত্যু যাকে গ্রাস করে তার ত্রাণ জ্ঞাতিগণের দ্বারা সম্ভব হয় না, সেই হেতু (চার পারিশুদ্ধি) শীল দ্বারা সংরক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তি উক্ত বাক্যের তাৎপর্য অবধারণ করে নির্বাণ লাভের উপায় স্বরূপ অষ্টাঙ্গিক মার্গকে বিশুদ্ধ করবেন (অর্থাৎ অষ্টাঙ্গিক মার্গ সম্যক্‌রূপে অনুশীলন করবেন)।

বুদ্ধদেবের উপদেশবাণী শ্রবণে পটাচারার শোকসন্তপ্ত হৃদয় শান্ত হল। তিনি স্রোতাপন্ন হলেন এবং সংঘে প্রবেশের জন্য বুদ্ধদেবের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। বুদ্ধদেব পটাচারার প্রার্থনা পূর্ণ করে তাঁকে সংঘে প্রবেশের অনুমতি দান করলেন। নিষ্ঠা সহকারে অষ্টাঙ্গিক মার্গের অনুশীলনে পটাচারা তাঁর পূর্ণশক্তি নিয়োগ করলেন। সম্ভবতঃ বিনয়ের নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন বলে তিনি পটাচারা নামে খ্যাত হন[10]।

একদিন যখন পটাচারা তাঁর হস্তধৃত একটি জলপূর্ণ পাত্র থেকে জল নিয়ে পদ প্রক্ষালন করে অবশিষ্ট জলের কিছুটা মেঝেতে ঢেলে দিলেন, দেখলেন, জলের ধারাটি কিছুটা দূর গড়িয়ে গিয়ে অদৃশ্য হল, তারপর ঐ একই ভাবে আরও দুবার জল ঢেলে দিয়ে লক্ষ্য করলেন, প্রথম ধারাটির অপেক্ষা দ্বিতীয় ধারা এবং দ্বিতীয় ধারা অপেক্ষা তৃতীয় ধারা আরও বেশী দূর অগ্রসর হয়ে অদৃশ্য হল। এই ঘটনাটিকে পটাচারা তাঁর ধ্যানের সংবিভংগরূপে গ্রহণ করে চিন্তা করলেন, ঢেলে দেওয়া, গড়িয়ে যাওয়া তিনটি জলধারার মতই জীব সমূহও কেউবা বাল্যে, কেউবা মধ্যবয়সে

---

9 "ন সন্তি পুত্তা তাণায ন পিতা নাপি বন্ধবা।
অন্তকেনাধিপন্নস্স নত্থি ঞাতীসু তাণতা॥
এতমত্থবসং ঞত্বা পণ্ডিতো সীলসংবুতো
নিব্বানং গমনং মগ্গং খিপ্পমেব বিসোধয়ে"
ধম্মপদ, ২০ ১৬

দ্রষ্টব্য : Buddhist Legends Burlingame Book 2, p 256

10 "Her name Patacara-patu (proficient) in acara (duties) was very likely given for her Strict adherence to the Vinaya rules,"

Great Women of India, Ed by Swami Madhavananda and R C Mazumder, p 261

দ্রষ্টব্য : "কটি সংলগ্ন বস্ত্র চ্যুত হওয়ায় তাঁহার নাম হইয়াছিল পটাচারা।
পট (পট্ট) + আচারা = পটাচারা।"
থেরী গাথা (বঙ্গানুবাদ), ভিক্ষু শীলভদ্র, পৃঃ ৬৬

আবার কেউবা বৃদ্ধবয়সে মরণ প্রাপ্ত হয়[11]। তখন গন্ধকুটিতে উপবিষ্ট বুদ্ধদেব অলৌকিক শক্তি প্রভাবে পটাচারার সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে বললেন যে, জীবমাত্রই মৃত্যুর অধীন[12]। যে আদি ও অন্ত (জন্ম ও মৃত্যু) না দেখে শতবর্ষ জীবিত থাকে তার জীবন অপেক্ষা আদ্যন্তদর্শী ব্যক্তির একদিনের জীবনও শ্রেয়ঃ[13]। বুদ্ধদেবের এই বাণী শ্রবণ করে পটাচারা অর্হত্ব প্রাপ্তা হলেন। তিনি তখন বলছেন—

"অনন্তর সূচী নিয়ে দীপবর্তিকা নিম্নে আকর্ষণ করে তৈলে নিমজ্জিত করলাম—দীপের নির্বাণ হল। আমার চিত্তও দীপের মতই মুক্ত হল[14]।

পটাচারা ছিলেন সংঘের উত্তম বিনয়-বিশারদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। এই জন্য তিনি 'বিনয়ধরা[15]' নামে খ্যাত হন। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন এবং সকল ধর্মপ্রচারিকারূপে খ্যাতিও অর্জন করেছিলেন। তিনি বহু রমণীকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দান করেছিলেন। তাঁর পাঁচশত শিষ্যা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন বিবাহিতা গৃহস্থ রমণী। তাঁরা পটাচারার জন্ম ও মৃত্যু বিষয়ক জ্ঞানগর্ভ দার্শনিক উপদেশে আকৃষ্ট হয়ে সংসারজীবন ত্যাগ করে ভিক্ষুণীজীবন গ্রহণ করেন। থেরীগাথা গ্রন্থে পটাচারার পাঁচশত শিষ্যার উল্লেখ আছে। পটাচারার ধর্মোপদেশ শ্রবণে উদ্বুদ্ধ এই সকল ভিক্ষুণী অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছিলেন এবং একনিষ্ঠ সাধনার দ্বারা জ্ঞানের উচ্চ শিখরে আরোহণ করে সকলেই অর্হত্বপ্রাপ্তা[16] হয়েছিলেন।

---

11. Buddhist Legends, Burlingame, Book 2, p 256

12 থেরী গাথা, (বঙ্গানুবাদ), ভিক্ষু শীলভদ্র, পৃঃ ৬৮

13 "যো চ বস্সসতং জীবে অপস্সং উদযব্যযং,
একাহং জীবিতং সেয্য পস্সতো উদযব্যযং ॥"
ধর্ম্মপদ ৮। ১৪

দ্রষ্টব্য ঃ Buddhist Legends, Burlingame, Book 2, p 250

14 "ততো সূচিং গহেত্বান, বট্টিং ওকস্সয়ামহং
পদীপস্সেব নিব্বানং বিমোক্খ অহু চেত সো"
—থেরীগাথা, গাথা সংখ্যা ১১৬

15 পরমত্থদীপনী ৫ম খণ্ড (পি টি এস), পৃঃ ১২২

16 থেরীগাথা, গাথা সংখ্যা ১১৭—১২১

ভদ্রা কুণ্ডলকেশা (ভদ্দা কুণ্ডলকেসা) ঃ

রাজগৃহের[1] এক ধনীবণিকের কন্যা ভদ্রা বা সুভদ্রা সংসারজীবন ত্যাগ করেন সম্পূর্ণ এক ভিন্ন কারণে। সাধারণ গৃহস্থরমণীর মত ভদ্রারও সাংসারিক প্রীতি বা আসক্তি প্রবল ছিল, কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁর এই সাংসারিক আসক্তি সমূলে ছিন্ন[2] হয় ঘটনাটিও নাটকীয়[3]।

একদিন রাজপথে উত্থিত প্রচণ্ড কোলাহলের কারণ জানবার জন্য কৌতূহলী ষোড়শী সুন্দরী যুবতী কন্যা ভদ্রা প্রাসাদের উচ্চতলে দাঁড়িয়ে দেখলেন, এবং বুঝলেন—উক্ত কোলাহলের কেন্দ্র হল প্রহারজর্জরিত এক যুবক। উক্ত যুবকটি ছিল রাজগৃহের রাজপুরোহিতের পুত্র সম্থুক। ভদ্রা ও সম্থুক একইদিনে জন্ম-গ্রহণ[4] করেন। ভদ্রবংশজাত হলেও বাল্যকাল থেকে সম্থুকের চৌর্যমনোবৃত্তি ছিল। বয়স বাড়ার সংগে সংগে চৌর্যবৃত্তি সম্থুকের পেশা হয়ে উঠল। তাঁর মাতা-পিতা বহু চেষ্টা করেও যখন সম্থুকের এই জঘন্য মনোবৃত্তির সংশোধন করতে পারলেন না তখন তাঁরা সম্থুককে গৃহ থেকে বিতাড়িত করে দিলেন[5]। সম্থুকের অত্যাচার যখন প্রবল হয়ে উঠল তখন দেশের রাজা সম্থুককে ধৃত করার জন্য তাঁর কর্মচারীদের আদেশ করলেন। রাজকর্মচারীদের তৎপরতায় সম্থুক একদিন ধরা পড়লেন।

---

1 রাজগৃহ, এর বর্তমান নাম রাজগীর। বেভার (বৈভার), পাণ্ডব, বিপুল, গিজ্ঝকূট (গৃধ্রকূট) ও ইসিগিলি এই পঞ্চপর্বত দ্বারা পরিবেষ্টিত এই রাজগীরকে প্রাচীনকাল থেকে নানা নামে উল্লেখ করা হয়েছে, যথা ঃ বসুমতী, বার্হদ্রথপুর, গিরিব্রজ, কুশাগ্রপুর এবং রাজগৃহ। মগধরাজ বিম্বিসার তাঁর রাজ্যের রাজধানী রাজগৃহে স্থাপন করেন।

"ভগবান তথাগত হেথাকার গৃধ্রকূট পর্বতে, গৌতম ন্যগ্রোধারামে, চৌরপ্রপাতে, বেভার পর্বত পার্শ্বে সপ্তপর্ণী গুহায়, ঋষিগিলি পর্বত পার্শ্বে কালশিলায়, শীতবনে সপ্পশৌণ্ডিকগুহায়, তপোদারামে, বেণুবনে কলন্দক নিবাপে, জীবকের আম্রবনে, মদ্রকুক্ষি মৃগদাবে অনেক সময় বাস করিয়া ভিক্ষুদিগকে নানা উপদেশ দিয়াছেন। প্রথম বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতিও সপ্তপর্ণী গুহার দ্বারস্থ সুসজ্জিত মণ্ডপে হইয়াছিল।"

মহাপরিনির্বাণ সূত্রং (মূলসহ বংগানুবাদ)
রাজগুরু শ্রীধর্মরত্ন মহাস্থবির, পরিশিষ্ট পৃঃ ২৩৬

2 ধম্মপদট্ঠকথা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৭

3 পরমত্থদীপনী, পঞ্চম খণ্ড (পি, টি, এস,), পৃঃ ৯৯-১০২

4 Great Women of India, Ed by Swami Madhavananda and R C. Majumder, p 261

5 Ibid

রাজাদেশে ধৃত ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত সম্থুককে যখন রাজরক্ষীগণ ঐভাবে উচ্চপর্বতে অবস্থিত এক বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছিল তখন ভদ্রা সম্থুককে দেখতে পান। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়—যুবক সম্থুককে দেখামাত্র ভদ্রা তাঁর প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়লেন, এবং উক্ত যুবকটিকে জীবনসংগীরূপে না পেলে মৃত্যুবরণ করবেন এই সংকল্প নিয়ে ভদ্রা শয্যাগ্রহণ[6] করবেন। ভদ্রার এই সংকল্পের কথা শ্রবণ করে ভদ্রার স্নেহশীল পিতা একমাত্র কন্যার জীবনরক্ষার্থে রাজরক্ষীগণকে প্রচুর উৎকোচ[7] প্রদানে বশীভূত করে গোপনে সম্থুককে মুক্ত করে আনলেন। কিন্তু রাজাকে সন্তুষ্ট করার জন্য রাজরক্ষীগণ অপর এক ব্যক্তিকে ধৃত করে উক্ত বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে তার প্রাণনাশ[8] করল।

ভদ্রার পিতা ভদ্রার সঙ্গে সম্থুকের বিবাহ[9] দিলেন। অনন্যমনা হয়ে ভদ্রা সম্থুকের পরিচর্যায় রত থাকতেন। কিন্তু এই ভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে এবং ভদ্রার মত এমন সুন্দরী পতিগতপ্রাণা স্ত্রী লাভ করেও সম্থুকের চৌর্যমনোবৃত্তির কোনই পরিবর্তন হল না, ভদ্রার চেয়ে ভদ্রার বহুমূল্য অলংকারগুলি হস্তগত করার দিকেই তাঁর লক্ষ্য বেশী, সুতরাং কিভাবে ঐ অলংকারগুলি হস্তগত করবেন তার জন্য সর্বদাই তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, অবশেষে একটা উপায়ও স্থির করে ফেললেন। একদিন তিনি ভদ্রাকে বললেন যে, শৈলশৃংগে অবস্থিত বধ্যভূমিতে যখন তাঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন তিনি উক্ত স্থানের দেবতার নিকট অংগীকার (মানসিক) করেছিলেন—যদি কোনো প্রকারে তাঁর প্রাণরক্ষা হয় তবে প্রদান অর্ঘ্য দ্বারা ঐ দেবতার পূজা করবেন, এবং তিনি ভদ্রাকে সঙ্গে নিয়ে ঐ পর্বত শৃঙ্গে অবস্থিত দেবতাকে অর্ঘ্য নিবেদন করতে চান। স্বামীর আদেশানুসারে বহুমূল্য বসন-ভূষণে সজ্জিতা হয়ে ভদ্রা পতিসহ রথারোহণে সম্থুকের বাঞ্ছিত স্থানের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। তাঁদের সঙ্গে যে কয়জন অনুচর ছিল সম্থুক কৌশল করে তাদের বিদায় দিলেন, এবং মাত্র ভদ্রাকে সংগে নিয়ে গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হলেন। এরপর সম্থুক স্পষ্টভাবে ভদ্রাকে জানিয়ে দিলেন—ভদ্রার অলংকারগুলি হস্তগত করাই তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য, দেবতাকে পূজা দেওয়ার কথাটা ছল মাত্র, অতএব ভদ্রা সমস্ত অলংকার উন্মোচন করে সেগুলি সম্থুককে অর্পণ করুক।

বুদ্ধিমতী ভদ্রা নিমিষে বুঝে নিলেন যে, ঘটনাটি কি ঘটতে যাচ্ছে, কিন্তু

6 Paramattha Dipani, Voe V, P T S p, 100.

7 Great Women of India, Ed. by Swami Madhavananda and R C. Májumder, p 262

8 থেরীগাথা (বংগানুবাদ, ভিক্ষু শীলভদ্র, পৃঃ ৫৩

9 Paramattha Dipani, Vol V, P T S p 100

মনোভাব গোপন করে বললেন—ভদ্রার সব কিছুই যে সত্থুকেরই একথা জেনেও সত্থুক যখন বিশেষভাবে অলংকারগুলি মাত্র চাইছেন তখন ভদ্রারও তা দিতে কোনো আপত্তিই নেই, তবে শেষবারের মত সালংকারা অবস্থায় ভদ্রা স্বামীকে একবার আলিঙ্গন করতে চান। অলংকারগুলি হস্তগত করার লোভে অন্য কোনো চিন্তা না করেই সত্থুক ভদ্রার সেই প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন। তখন ভদ্রা আলিঙ্গনের ছলে প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিয়ে সত্থুককে পর্বতশিখর থেকে ফেলে দিলেন। এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় দেবতা ভদ্রার বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করে বলে উঠলেন—

[10]"সর্বক্ষেত্রেই নর নারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়। তীক্ষ্ন পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা থাকলে নারীও পুরুষের সমকক্ষ হতে পারে। নারীও চতুর, সে চিন্তা করতে মুহূর্তমাত্র সময় নেয়।"

উপস্থিত বুদ্ধিবলে ভদ্রা সে যাত্রায় রক্ষা পেলেন বটে কিন্তু এই মর্মান্তিক ঘটনায় তিনি প্রথমে উদভ্রান্ত হয়ে উঠলেন; পরে চিত্ত একটু স্থির হলে গভীর ভাবে চিন্তা করে বুঝলেন, তাঁর প্রেমের যে ভয়ংকর পরিণতি তিনি স্বহস্তে ঘটালেন এ সবই তাঁর নিজের অপরিণামদর্শী লালসার ফলশ্রুতি। এই তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁকে সংসারবিমুখ করে তুলল, ফলে গৃহে ফিরে না গিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবেন বলে ভদ্রা সিদ্ধান্ত নিলেন।

অনন্তর ভদ্রা জৈনভিক্ষুণী সংঘে উপস্থিত হলেন। জৈন ভিক্ষুণীসংঘের কর্তৃপক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন, ভদ্রা কোন শ্রেণীর ভিক্ষুণী হতে চান। উত্তরে ভদ্রা জানালেন, যে শ্রেণীতে কঠোরতম নিয়ম পালন করতে হয়, তিনি সেই শ্রেণী ভুক্তা হতে চান। জৈন ধর্মের নিয়মানুসারে প্রব্রজ্যা গ্রহণের পূর্বে ক্ষুর দ্বারা মস্তক মুণ্ডন করার পরিবর্তে মস্তকের সমস্ত কেশের মূল উৎপাটন করা হয়[11]। উক্ত নিয়মে তাল-বৃন্তের কঙ্কাতিকা (চিরুণী) দ্বারা ভদ্রার মস্তকের সমস্ত কেশ উৎপাটন করা হল। কিন্তু অচিরে কুণ্ডলাকারে কেশোদ্গম হওয়ায় তিনি "ভদ্রা কুণ্ডলকেশা" (ভদ্দা কুণ্ডলকেসা) নামে অভিহিতা হন[12]।

জৈনভিক্ষুণীরূপে শ্রদ্ধাসহকারে কঠোরতম নিয়ম পালন করে ভদ্রা জৈনভিক্ষুণী সংঘের শিক্ষা সমাপ্ত করলেন। জৈনসংঘ প্রবর্তিত শিক্ষা সম্যক্‌জ্ঞান দিতে অসমর্থ—এই প্রকার চিন্তা করে ভদ্রা উক্ত সংঘ পরিত্যাগ করলেন। এরপর তিনি নানা স্থানের বিদ্বান ও পণ্ডিতগণের নিকট নানা বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে মহা বিদুষী হয়ে উঠলেন। বিশেষ করে তর্কশাস্ত্রে তাঁর সমকক্ষ হতে পারেন এমন কোনো

10 Buddhist Legends, Burlingame, Book 2, p 229

11 The wonder that was India, A L Basham, p 292

12 থেরীগাথা (বংগানুবাদ), ভিক্ষু শীলভদ্র, পৃঃ ৬০

ব্যক্তির সাক্ষাৎ ভদ্রা পেলেন না। তাঁর সমকক্ষ কোন তার্কিক আছেন কি না জানার জন্য তিনি একটি উপায় অবলম্বন করলেন—গ্রামের প্রবেশ পথে বালুকাস্তূপের উপর একটি 'জম্বুশাখা' রোপন করে গ্রামস্থ বালক-বালিকাদের বলে রাখতেন, তাঁর সংগে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে যদি কোনো ব্যক্তি অভিলাষ করেন তবে তিনি যেন উক্ত জম্বুশাখাটি পদদলিত করেন। সপ্তাহ কালের মধ্যে তাঁর প্রোথিত জম্বুশাখাটি পদদলিত না হলে ঐ স্থান পরিত্যাগ করে সমকক্ষ তার্কিকের সন্ধানে ভদ্রা অন্যত্র গমন করতেন। এই ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বী তার্কিকের সন্ধান করতে করতে ভদ্রা এক সময় শ্রাবস্তী নগরে উপস্থিত হলেন।

সেই সময় বুদ্ধদেব জেতবনে অবস্থান করছিলেন। পূর্বোক্ত নিয়মে ভদ্রা জম্বুশাখা রোপণ করে ভিক্ষান্ন সংগ্রহার্থে গমন করলেন। প্রত্যাবর্তন করে দেখলেন —জম্বুশাখা পদদলিত। অনুসন্ধান করে জানলেন জম্বুশাখা পদদলনকারী ব্যক্তিটি হলেন বুদ্ধদেবের অগ্রশ্রাবক (অগ্‌গসাবক) শারী পুত্র (সারিপুত্ত)। ভদ্রা জানতেন অসমর্থিত তর্ক ফলপ্রসূ হয় না। সেই জন্য তিনি শ্রাবস্তী নগরের জনগণকে তাঁদের তর্কসভায় উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট শারীপুত্রের নিকট ভদ্রা উপস্থিত হলেন এবং রীতি অনুযায়ী অভিবাদন করে তাঁকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান জানালেন। শারীপুত্রের ইচ্ছানুসারে ভদ্রা প্রথমে প্রশ্ন করলেন শারীপুত্র তার উত্তর দিলেন। এই ভাবে ভদ্রা যতগুলি প্রশ্ন করলেন শারী পুত্র তার প্রত্যেকটির যুক্তিপূর্ণ উত্তর দিলেন।

ভদ্রার প্রশ্ন করা শেষ হলে শারীপুত্র তাঁকে একটি মাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন; প্রশ্নটি[13] ছিল—"এক কি? (একং নামং কিং)?" ভদ্রা স্বীকার করলেন যে, এই প্রশ্নের উত্তর তাঁর জানা নেই। এই স্বীকারোক্তির পর ভদ্রা বৌদ্ধভিক্ষুণী সংঘে প্রবেশের অভিলাষ ব্যক্ত করায় শারীপুত্ত তাঁকে বুদ্ধদেবের নিকট উপস্থাপিত করেন।

বৌদ্ধ ভিক্ষুণী সংঘে প্রবেশের প্রসঙ্গে ভদ্রা বলেছেন—"নতজানু হয়ে কৃতাঞ্জলী পুটে বুদ্ধের পূজা করলাম। 'ভদ্রে এস,' বলে বুদ্ধ আমাকে অভিষিক্ত করলেন[14]"।

---

13 সোপাক নামে অর্হত্ব প্রাপ্ত এক সপ্তবর্ষীয় বালক বুদ্ধদেবের নিকট উপসম্পদা যাচ্ঞা করলে, তাঁর জ্ঞান পরীক্ষা করার নিমিত্ত বুদ্ধদেব যে দশটি প্রশ্ন করেছিলেন তার মধ্যে প্রথম প্রশ্নটি ছিল— "একং নামং কিং" এবং উত্তরটি ছিল "সব্বে সত্তা আহারট্‌ঠিতিকা" (জীবগণ আহার স্থিতিক অর্থাৎ জীবসমূহ আহারেই জীবনধারণ করে)

খুদ্দক পাঠো, কুমার (সামনের) পঞহা

14. "হীনঞ্চ জানুং বন্দিত্বা, সম্মুখা অঞ্জলিং অকং
এহি ভদ্দে তি মং অবচ,
সা মে আসূপসম্পদা॥" থেরীগাথা, নালন্দা সংস্করণ, গাথা সংখ্যা ১০৯

সংঘভুক্তা হওয়ার পর কঠোর সাধনায় কিছুদিনের মধ্যেই ভদ্রা অলৌকিক শক্তির অধিকারিণী হন এবং অচিরে অর্হত্ব প্রাপ্তা হন। অল্প সময়ের মধ্যে উচ্চতর জ্ঞান লাভ করার পালিসাহিত্যে ভদ্রাকে 'খিপ্পাভিঞ্ঞা' (ত্বরিত প্রজ্ঞাবতী) এবং 'ইদ্ধিমন্তা' (ঋদ্ধিমতী) বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

একদিন সমবেত ভিক্ষুগণ ভদ্রার সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন। তাঁদের আলোচ্য বিষয় ছিল—বুদ্ধদেবের অনুশাসন সম্বন্ধে স্বল্পজ্ঞানী ভদ্রা, যিনি বৌদ্ধভিক্ষুণী সংঘে প্রবেশ করার পূর্বে এক বীভৎস হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন এমন এক জনের পক্ষে সংঘভুক্তা হওয়া কি প্রকারে সম্ভব হল? বুদ্ধদেব ভিক্ষুমণ্ডলীর এই প্রশ্নের উত্তরে বললেন যে, শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিমাণ বুদ্ধ প্রদত্ত অনুশাসনগুলি কেবলমাত্র মুখস্থ করার বিদ্যার ওপর নির্ভরশীল নয়, তা নির্ভর করে শিক্ষার্থীর হৃদয়ংগম করার শক্তির ওপর। মূল্যহীন সহস্র বাক্য অপেক্ষা চিত্তশান্তকারী একমাত্র বাক্য শ্রেষ্ঠ[15]। পুনরায় উদাহরণ সহযোগে বুদ্ধদেব বললেন যে, যদি কেউ যুদ্ধে সহস্র ব্যক্তিকে জয় করেন, অপর পক্ষে কেউ যিনি কেবল নিজেকে জয় করেন তবে জয়শীল উভয় ব্যক্তির মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ[16]। ভদ্রার সম্বন্ধে বুদ্ধদেব উক্তরূপ ধারণা পোষণ করতেন।

বুদ্ধদেবের অনুশাসনে উৎসর্গীকৃতাপ্রাণা ভদ্রা কুণ্ডলকেশা বলেছেন যে, পঞ্চাশ বৎসর ব্যাপী কেবলমাত্র ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করে তিনি অঙ্গ, মগধ, বজ্জী, কাশী, কোশল প্রভৃতি দেশে (ধর্মপ্রচারিকারূপে) পরিভ্রমণ করেছেন। যখন যে রাষ্ট্রে গেছেন তখন সেই রাষ্ট্রের 'রাষ্ট্রপিণ্ড' অর্থাৎ সেই রাষ্ট্রবাসীর দান গ্রহণ করলেও, সেই রাষ্ট্রের কাছে তিনি ঋণী নন, কারণ 'মুক্তচিত্তা' ভদ্রাকে যাঁরা ভিক্ষান্ন ও চীবর দান করেছেন তাঁরা ঐ সঙ্গে বহুপুণ্যও অর্জন করেছেন[17]।

---

15 "যো চ গাথা সতং ভাসে অনত্থপদ সংহিতা
একং ধম্মপদং সেয্যো যং সুত্বা উপসম্মতি।"
ধম্মপদং, ৮।৩

16 "যো সহস্সং সহস্সেন সংগামে মানুসে জিনে
একঞ্চ জেয্যমত্তানং স বে সংগামজুত্তমো।"
ধম্মপদং, ৮।৪

দ্রষ্টব্য: Buddhist Legends, Burlingame Book—2, p 227

17 থেরীগাথা, নালন্দা সংস্করণ, গাথাসংখ্যা, ১১০-১১১

ঋষিদাসী (ইসিদাসী) ঃ

থেরীগাথা গ্রন্থে শাক্যকুলজাতা ঋষিদাসীকে শীলসম্পন্না, ধ্যানানুরক্তা, বহুশ্রুতা, নিষ্কামজীবনযাপনকারিণী এক পুণ্যবতী ভিক্ষুণীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে[1]।

ঋষিদাসীর গৃহজীবন ছিল বৈচিত্র্যময়। ঋষিদাসীর এই বৈচিত্র্যময় জীবন কাহিনী পরমত্থদীপনি[2] গ্রন্থেও লিপিবদ্ধ আছে। উজ্জয়িনী নগরের ধর্মশীল শ্রেষ্ঠীর একমাত্র আদরিণী কন্যারূপে ঋষিদাসীর জন্ম হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে, সাকেত[3] নগরবাসী এক ধনবান শ্রেষ্ঠীর পুত্রের সহিত ঋষিদাসীর বিবাহ হয়[4]। পিতৃগৃহের নীতিশিক্ষায়[5] শিক্ষিতা ঋষিদাসী পতিগৃহে পতির মাতা-পিতাকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করতেন, তাঁদের সেবা-পরিচর্যা করতেন ত্রুটী হীন ভাবে; এবং স্বামীর ভ্রাতা, ভগিনী ও আত্মীয়স্বজনকে যথাসাধ্য আদর আপ্যায়ন করতেন। কায়মনোবাক্যে ঋষিদাসী তাঁর স্বামীর সন্তোষবিধানে সর্বদা যত্নবতী থাকতেন। কিন্তু ঋষিদাসীর মত সুশীলা, ধর্মপরায়ণা পতিব্রতা স্ত্রীর সেবা-পরিচর্যাতেও তাঁর স্বামী সন্তুষ্টতো হলেনই না বরং বার বার বিরক্তি প্রকাশ করে মাতা-পিতাকে বলতেন যে ঋষিদাসীকে গৃহ থেকে বিতাড়িত না করলে তিনি নিজেই গৃহ-ত্যাগী হবেন।

স্বামীপ্রেমবঞ্চিতা হলেও ঋষিদাসী তাঁর স্বামীর মাতা-পিতার স্নেহ-প্রীতি লাভ করেছিলেন। তাঁরা পুত্রবধূর সম্বন্ধে পুত্রের এইরূপ বিরুদ্ধ মনোভাবের পরিচয় পেয়ে ব্যথিত হলেন, এবং ঋষিদাসীর নানা গুণের উল্লেখ করে তার সম্বন্ধে এই প্রকার উক্তি করতে পুত্রকে নিষেধ করলেন[6]। কিন্তু তাতেও কোনো সুফল হল না দেখে তাঁরা ঋষিদাসীকে বললেন যে, ঋষিদাসী তাঁর সেই অপরাধ[7] অকপটে ব্যক্ত করুন, যে অপরাধে তাঁর স্বামী তাঁর প্রতি এমন বিমুখ হয়েছেন। ঋষিদাসী বললেন যে, তিনি কোনো অপরাধে স্বামীর নিকট অপরাধিনী নন, তথাপি স্বামী তাঁর প্রতি কেন এত অসন্তুষ্ট তা তিনি জানেন না, এক্ষেত্রে তিনি উপায়হীনা। ঋষিদাসীর কথায় তাঁরা বুঝলেন ঋষিদাসীর কোনো ত্রুটী নেই, কিন্তু পুত্রকে

1 থেরীগাথা, গাথাসংখ্যা ৪০০-৪০১

2 পরমত্থদীপনী, ৫ম খণ্ড (পি টি এস) পৃষ্ঠা ২৬০-২৭১

3 সাকেত-(নামান্তর অযোধ্যা) সরযূনদীর তীরস্থ সুপ্রসিদ্ধ নগর। বিশাখা মহাউপাসিকার পিতা অঙ্গদেশ থেকে এসে এই স্থানে বসবাস করেছিলেন।

মহাপরিনিব্বান সুত্তং, মূলসহ বঙ্গানুবাদ, বাক্যানুবাদ—
শ্রীধর্মবংশ মহাস্থবির, পরিশিষ্ট পৃঃ ২৪১

4 থেরীগাথা, গাথাসংখ্যা ৪০৬

5 প্রাগুক্ত, গাথাসংখ্যা ৪০৭-৪১৪

গৃহবাসী করে রাখার জন্য অন্য উপায় না পেয়ে নিরপরাধিনী পুত্রবধূ ঋষিদাসীকে তাঁর মাতা পিতার হস্তে প্রত্যার্পণ করে দুঃখবেদনার রুদ্ধকণ্ঠে তাঁরা বললেন —"আমরা লক্ষ্মীহীন হইলাম[8]।"

এইভাবে ঋষিদাসীর প্রথমবারের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল। অতঃপর ধর্মশীল শ্রেষ্ঠী সাকেত নগরের শ্রেষ্ঠীর নিকট থেকে কন্যাপণ হিসাবে গৃহীত অর্থের অর্ধপরিমাণ অর্থ উক্ত শ্রেষ্ঠীকে প্রত্যার্পণ করলেন, এবং প্রিয়তমা কন্যা ঋষিদাসীকে দ্বিতীয়[9] বার পাত্রস্থ করলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়—এবারেও স্বামীর মনোরঞ্জনে অসমর্থা ঋষিদাসীকে বিবাহের একমাস পরে পতিগৃহ ত্যাগ করে পুনরায় পিতৃগৃহে ফিরে আসতে হল। অনন্তর ঋষিদাসীর পিতা ঋষিদাসীর জন্য পুনরায় পাত্র অন্বেষণ করতে লাগলেন। অবশেষে কাষায়বস্ত্রধারী শান্তচিত্ত এক পরিব্রাজক যুবককে দেখে তাঁর প্রতি ঋষিদাসীর পিতার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। তিনি তখন ঋষিদাসীকে বিবাহ করার জন্য উক্ত যুবকটিকে অনুরোধ করলেন। যুবকটি ঋষিদাসীর পিতার এই অনুরোধ রক্ষা করতে সম্মত হওয়ায় তাঁর সঙ্গে ঋষিদাসীর পুনরায় বিবাহ[10] হল।

ঋষিদাসীর তৃতীয় বিবাহের পর পক্ষকাল গত হতে না হতেই দেখা গেল ঋষিদাসীর তৃতীয় স্বামীটি পুনরায় গৃহজীবন ত্যাগ করতে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছেন। তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্য ঋষিদাসীর মাতা-পিতা ও আত্মীয়স্বজন বহু চেষ্টা করলেন, কিন্তু ঋষিদাসীর তৃতীয় স্বামী সকলের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে ঋষিদাসীকে পরিত্যাগ করে আপন পাত্র চীবর সহ গৃহজীবন থেকে পুনরায় নিষ্ক্রান্ত[11] হয়ে গেলেন।

পর পর তিন স্বামী কর্তৃক এইভাবে অপমানিতা হয়ে ঋষিদাসী এই তথ্য উপলব্ধি করলেন—যে গুণে অধিকারিণী হলে স্ত্রীর প্রতি স্বামী আসক্ত হয় তাঁর নারীত্বে রয়েছে সেই গুণের একান্ত অভাব। তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হলেন।

---

6 "সা এবং পুত্ত অবচ, ইসিদাসী পণ্ডিতা পরিব্বতা "
থেরীগাথা, গাথা সংখ্যা ৪১৫

7 প্রাগুক্ত, " ", ৪১৭-৪১৮

8 "তে মং পিতুঘরং পটিনয়িংসু, বিমনা, দুক্খেন অধিভূতা পুত্তমনুরক্খমানা, জিতাম্হসে রূপিনিং লক্খিং"

থেরীগাথা, গাথা সংখ্যা, ৪১৯

9 প্রাগুক্ত, গাথা সংখ্যা ৪২০

10. প্রাগুক্ত, গাথা সংখ্যা ৪২২

11 প্রাগুক্ত, " " ৪২৫

অবশেষে হয় নিজ দেহ না হয় নিজগৃহ ত্যাগ করার সংকল্প করে সে কথা মাতা-পিতাকে জানালেন এবং উক্ত যে কোনো একটির জন্য তাঁদের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। কিন্তু কন্যার প্রতি মমত্ববশতঃ কন্যার কঠোর ব্রহ্মচর্যসহ ভিক্ষুণীব্রত অবলম্বন করার প্রস্তাবে ঋষিদাসীর পিতা সম্মত হতে পারলেন না, কন্যাকে গৃহে বাস করে শ্রমণ ব্রাহ্মণদের সেবা-পরিচর্যা করে ধর্মাচরণ করতে বললেন। ঘটনাক্রমে সেই সময় বিনয়ধরী জিনদত্তা ভিক্ষুণী ভিক্ষার্থে ঋষিদাসীর পিতৃগৃহে উপস্থিত হলে তাঁর কাছে ঋষিদাসী প্রব্রজ্যা গ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। পিতা কন্যার প্রব্রজ্যা গ্রহণের ইচ্ছাতে পূর্বে বাধা দিয়েছিলেন কিন্তু এখন এ বিষয়ে ঋষিদাসীর অত্যুগ্র আগ্রহ দেখে তাঁকে আর বাধা না দিয়ে বোধি প্রাপ্ত হও বলে আশীর্বাদ করলেন[12]।

অতঃপর মাতা-পিতার অনুমতি প্রাপ্তা ঋষিদাসীকে থেরী জিনদত্তা প্রব্রজ্যা দান করলেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর ভিক্ষুণী সংঘভুক্তা ঋষিদাসী সপ্তদিবসের মধ্যে ত্রিবিদ্যায়[13] সিদ্ধি লাভ করলেন অর্থাৎ অর্হত্ব প্রাপ্তা হলেন।

একদিন বিশ্রামকালে সহচরী থেরী বোধির নিকট থেরী ঋষিদাসী কথা প্রসঙ্গে তাঁর ইহজন্মের গৃহজীবনের দুঃখময় কাহিনী বর্ণনা করে বললেন যে, পূর্বজন্মানুস্মৃতি বিদ্যা বলে তিনি জেনেছেন—সাতজন্ম পূর্বে কোনো একটি বিশেষ অকুশল কর্ম করার ফলে জন্মে জন্মে তাঁকে নানা দুঃখ পেতে হয়েছে[14]। তাঁর দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগের জন্য ঋষিদাসী অন্য কাউকেই দায়ী করেন নি, সর্বশেষে তিনি বলেছেন— " ..... এ সকলই আমার কর্মফল, এখন আমি তারও (অর্থাৎ সেই কর্মকালেরও) নাশ করেছি[15]।

কৃশা গৌতমী (কিসা গোতমী) ঃ

পালিসাহিত্যে কৃশা গৌতমী[1] মর্মস্পর্শী জীবন-চরিতের প্রতীকরূপে অঙ্কিত হয়েছেন।

---

12 প্রাগুক্ত, গাথা সংখ্যা ৪৩২

13 অর্হত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ত্রিবিদ্যায় পারদর্শী হন, যথা ঃ পূর্বনিবাসানুস্মৃতি, পরচিত্তবিভাজন এবং আস্রবক্ষয়জ্ঞান।

মিলিন্দ (অনুবাদ), ধর্মাধার মহাস্থবির, পৃঃ ৪২০

14 থেরীগাথা, গাথাসংখ্যা ৪৩৫-৪৪৭

15 "তস্স তং কম্মফলং, তস্মিপি অন্তকতো ময়া" তি

থেরীগাথা, গাথা সংখ্যা ৪৪৭

1. Paramattha Dipani, Vol V, P T S PP, 174—175

শ্রাবস্তী নগরের এক দরিদ্র পরিবারে কৃশা গৌতমীর জন্ম[2] হয়। তাঁর প্রকৃত নাম, গৌতমী কিন্তু তাঁর দেহ ছিল অত্যন্ত কৃশ (কিস), সে কারণে লোকে তাঁকে কৃশা গৌতমী বলে উল্লেখ করত। দারিদ্রের গৃহে জন্ম হলেও শ্রাবস্তী নগরেরই এক ধনী বণিকপুত্রের সহিত তাঁর বিবাহ হয়। কৃশা গৌতমী বুদ্ধদেবের দূরসম্পর্কীয়া ভগ্নী[3] ছিলেন। এই প্রসঙ্গে একটি স্মরণীয় ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। ঘটনাটি হল শাক্যরাজকুমার সিদ্ধার্থের মহাভিনিষ্ক্রমণের পূর্ব রাত্রের ঘটনা। উদ্যানে উপবিষ্ট রাজকুমার সিদ্ধার্থ যখন তাঁর পুত্রের জন্মসংবাদ শ্রবণ করে রাজপ্রাসাদাভিমুখে গমন করছিলেন তখন পূর্ণ সৌভাগ্যবান ও কীর্তিমান রাজকুমারকে দেখে ভাবাবেগে কৃশা-গৌতমী উচ্চারণ করলেন—

"যে মাতার এরূপ সন্তান,
যে পিতার এরূপ পুত্র,
যে নারীর এরূপ স্বামী,
তাহারা নিশ্চয়ই সুখী (নিব্বুত)[4]...

কিন্তু রাজকুমার সিদ্ধার্থ 'নিব্বুত' শব্দটি নিব্বান (নির্বাণ) অর্থে গ্রহণ করেছিলেন এবং এই রকম একটি শুভ ও পবিত্র শব্দ কৃশা গৌতমী তাঁকে শোনালেন বলে তিনি তাঁকে এক গাছি মূল্যবান মুক্তার মালা দান করেছিলেন[5]।

স্বামীগৃহে কৃশা গৌতমী বিবাহিতা জীবনের প্রথম দিকে অনাদৃতা ছিলেন, কিন্তু একটি পুত্রের জননী হওয়ার পর পতির সংসারে তিনি সম্মান[6] লাভ করেছিলেন। কিন্তু কৃশা গৌতমীর দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর পুত্রটি নিতান্ত শিশুবয়সে সর্পাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। একমাত্র সন্তানের অকাল মৃত্যুতে উন্মাদিনী প্রায় মাতা সন্তানের মৃতদেহটি বক্ষে ধারণ করে নগরবাসীর দ্বারে দ্বারে তাঁর সন্তানের

---

2 Buddhist Legends, Burlingame, Part 2, PP 257—258

3 'বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম', ডঃ শ্রী অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১৭

4 "নিব্বুতো নূন সা মাতা
নিব্বুতো নূন সো পিতা
নিব্বুতো নূন সা নারী
যস্সায়ং ঈদি-সো পতি"
ধম্মপদট্‌ঠকথা, (পি টি এস), প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৮৫
তুলনীয়ঃ অত্থসালিনী (পি টি এস), পৃঃ ৩৪

5 'বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম', ডঃ শ্রী অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

6 'পুত্তলাভেন চ' সুসা সম্মানং অলত্থ'
পরমত্থদীপনী, ৫ম খণ্ড (পি টি এস.), পৃঃ ১৭৪

জন্য ঔষধ প্রার্থনা করতে লাগলেন। তাঁর এই আচরণ দেখে অনেকেই বলতে লাগলেন—শোকে কৃশা গোতমীর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে। কৃশা গোতমীর করুণ অবস্থা দেখে এক দয়ালু ব্যক্তি তাঁকে বুদ্ধদেবের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর সন্তানের জন্য ঔষধ প্রার্থনা করতে পরামর্শ দিলেন।

কৃশা গোতমী মৃতপুত্রসহ বুদ্ধদেবের নিকট উপস্থিত হয়ে সন্তানের জন্য ঔষধ প্রার্থনা করলেন। সর্বজ্ঞ বুদ্ধদেব কৃশা গোতমীর উচ্চতর জীবনের যোগ্যতা সম্বন্ধে উপলব্ধি করে কৃশা গোতমীকে বললেন যে, কৃশাগোতমীকে এমন একটি গৃহ থেকে একটি সর্ষপবীজ আনতে হবে যে গৃহে কোনো দিন কোনো মৃত্যু ঘটে নি। কৃশা গোতমী যদি তাদৃশ সর্ষপবীজ সংগ্রহ করে আনতে পারেন তবে তিনি তাঁকে তাঁর পুত্রের জন্য ঔষধ দেবেন।

বুদ্ধদেবের বাক্য শ্রবণে আশান্বিত হৃদয়ে মৃতপুত্র বক্ষে ধারণ করে কৃশা গোতমী সর্ষপবীজ সংগ্রহের উদ্দেশে নগরের দিকে যাত্রা করলেন। কিন্তু গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করে এমন একটিও গৃহের সন্ধান পেলেন না যে গৃহে কোনো দিন কোন মৃত্যু ঘটেনি। এইভাবে ব্যর্থ মনোরথা কৃশা গোতমী বুঝতে পারলেন যে, কোনো মানুষই মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে না।

নবলব্ধ এই তত্ত্বজ্ঞানে কৃশা গোতমীর জীবনের গতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে গেল। তখন তিনি নগর ত্যাগ করে শ্মশানে গেলেন, এবং পুত্রের মৃতদেহটি শ্মশানভূমিতে স্থাপন করে বললেন,—মৃত্যু কোনো পল্লী বিশেষের বা নগরবিশেষের অথবা কোনো বংশবিশেষের ধর্ম নয়। স্বর্গ, মর্ত্য তথা সর্বজগতের জন্য এই ধর্ম সর্ব, মৃত্যুই হল ধ্রুব সত্য, সুতরাং সর্ববস্তু অনিত্য[7]।

অনন্তর তিনি পুনরায় বুদ্ধদেব সমীপে উপস্থিত হলে বুদ্ধদেব তাঁকে প্রশ্ন করে জানতে চাইলেন কৃশা গোতমী উক্তরূপ সর্ষপবীজ সংগ্রহ করতে পেরেছেন কি না। উত্তরে কৃশা গোতমী জানালেন যে, সর্ষপবীজে তাঁর আর প্রয়োজন নেই, তিনি বুদ্ধদেবের নিকট প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করছেন।

বুদ্ধদেব তখন বললেন—"নিদ্রামগ্ন পল্লী যেমন মহাপ্লাবনে ধ্বংস হয়ে যায়, ভোগ-রূপ বৃক্ষের সুখরূপপুষ্পচয়নরত মানুষও তেমনি মৃত্যু কর্তৃক বিনষ্ট হয়ে যায়[8]।

---

7 থেরীগাথা (বংগানুবাদ), ভিক্ষু শীলভদ্র-পৃঃ ১০১

8 "তং পুত্তপসুসম্মত্তং ব্যাসত্তমনসং নরং
সুত্তং গামং মহোঘোব মচ্চু আদায় গচ্ছতি ॥"
ধম্মপদং, মগ্‌গ বগ্‌গো, ১৫

দ্রষ্টব্য ঃ
Buddhist Legends, Burlingame ; Book 2, P 259

বুদ্ধদেবের বাণী শ্রবণ করে কৃশা গৌতমী স্রোতাপন্ন হলেন, এবং সংঘজীবনে প্রবেশের জন্য বুদ্ধদেব কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্তা হলেন। বুদ্ধদেব পুনরায় তাঁকে উপদেশ দিলেন—

"যে অমৃতপদ (অর্থাৎ নির্বাণপদ) না দেখে শতবর্ষ জীবিত থাকে তার চেয়ে নির্বাণপদ দর্শনকারী মানবের একদিনের জীবনও শ্রেয়ঃ[9]। এইভাবে বুদ্ধদেবের উপদেশে অনুপ্রাণিতা কৃশা গৌতমী অল্প সময়ের মধ্যে অর্ন্তদৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠিতা হয়ে অর্হত্ব লাভ করেছিলেন।

গৃহজীবনের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কৃশা গৌতমী ভাষিত যে কয়েকটি গাথা থেরীগাথা গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তার মধ্যে একটি গাথায়[10] তিনি বলেছেন—

'স্ত্রী জন্ম দুঃখ সপত্নীর সংগে বাস দুঃখ, সন্তান প্রসব দুঃখ। আর একটি গাথায় বলেছেন—

"শ্মশানে পরিত্যক্ত পুত্রের মৃতদেহ বন্য পশুর খাদ্য হল, তা-ও প্রত্যক্ষ করেছি তথাপি মুক্তচিত্তা কৃশা গৌতমী এখন মৃত্যুর অতীত[11]।"

একদা জেতবনে অনুষ্ঠিত ভিক্ষুসংঘ সম্মিলনে ভিক্ষুণীদের শ্রেণী বিভাগ কালে অমসৃণ বস্ত্র পরিধানকারিণী (পংসুকুলধরং) ভিক্ষুণীদের মধ্যে কৃশা গৌতমীকে বুদ্ধদেব শ্রেষ্ঠ আসন দান করেছিলেন[12]।

---

9 "যো চ বস্সসতং জীবে অপস্সং অমতপদং।
একাহং জীবিতং সেয়্যো পস্সতো অমতপদং॥"
—ধম্মপদং, সহস্সবগ্গো, ১৫

দ্রষ্টব্য:
Buddhist Legends, Burlingame, Book 2, P, 257

10 থেরীগাথা, গাথা সংখ্যা ২২১

11 "ব সতা সুসান মজ্ঝে, অথো পি খাদিতানি
পুত্তমংসানি—অমতমধিগচ্ছিং"
থেরীগাথা গাথা সংখ্যা ২২৩

12 অংগুত্তর নিকায় (পি টি, এস), প্রথম খন্ড, পৃঃ ২৫

পঞ্চম অধ্যায়

॥ কয়েকজন খ্যাতনাম্নী উপাসিকার জীবনী ॥

বুদ্ধদেব প্রবর্তিত ধর্মের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায়, তাঁর ধর্মের আহ্বান শ্রবণ করে আকুল প্রাণে যাঁরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে তাঁর চরণে শরণ নিয়েছিলেন, তিনি সেই সকল শরণার্থীকে বলিষ্ঠ চরিত্রের ভিত্তিতে স্থাপন করে তাঁদের অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বের উন্মেষ করতে চেয়েছিলেন কারণ তিনি মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছিলেন[1]; মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিরই মহিমা প্রচার করেছিলেন[2]। দয়া ও কল্যাণের জন্য কোনো দেবতার কাছে প্রার্থী না হয়ে তিনি মানব হৃদয় থেকে তাদের আত্মপ্রকাশ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। ব্যক্তিগত স্বার্থের গণ্ডীবদ্ধ সীমায় আবদ্ধ সংসারী মানুষের পক্ষে তাঁর প্রার্থিত দয়া, কল্যাণ বা মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ সম্ভব নয়—তাই তিনি এই কাজের জন্য গৃহত্যাগী মানুষ নিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন বৌদ্ধভিক্ষু সংঘ ও বৌদ্ধভিক্ষুণী সংঘ।

কিন্তু বুদ্ধদেবের ধর্মের আহ্বান শ্রবণ করে যাঁরা সাংসারিক কর্তব্য অবহেলা করে গৃহবন্ধন ছিন্ন করতে পারলেন না, অথচ বুদ্ধবাণীর অমৃতধারা সিঞ্চনে দুঃখের অনল নির্বাপিত করতে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন, তাঁরা কি সেই সর্বমানবের কল্যাণকামী, পরমকারুণিক বুদ্ধদেবের করুণাধারা থেকে বঞ্চিত হয়ে রইলেন?

পালিসাহিত্য পাঠে এই প্রশ্নের উত্তর জানা যায়—বহু গৃহস্থ নর-নারীও সেই পরম পুরুষ বুদ্ধদেবের কৃপা লাভ করে দুঃখে-শোকে তাপিত হৃদয়ে পরম শান্তি লাভ করেছিলেন।

পালিসাহিত্যে উক্ত শ্রেণীর বুদ্ধভক্ত গৃহস্থ নর-নারীকে উপাসক ও উপাসিকা নামে অভিহিত করা হয়েছে[3]। গৃহস্থ মানুষকে উপাসক-উপাসিকা হওয়ার জন্য

---

1 ধম্মপদ, অত্তবগ্‌গো, ৪

উল্লেখ্য: বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের বহুশতাব্দী পরে চৈতন্য পূর্ব বৈষ্ণব চণ্ডীদাস বলেছেন—"সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।" বৈষ্ণব কবির অন্তর্নিহিত এই ব্যঞ্জনাময় ভাব প্রকাশের মধ্যে বুদ্ধবাণীই যেন প্রতিধ্বনিত হয়েছে বলে মনে হয়।

2 মহাপরিনিব্বান সুত্তং, ২।৩১

3 "বুদ্ধং ধম্মং সংঘং উপাসতী তি উপাসকো
বুদ্ধং ধম্মং সংঘং উপাসতী তি উপাসিকা"
সদ্ধম্মপ্পকাসিনী (পি টি এস) পৃঃ ২৩৪-২৩৫

কোনো বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠান করতে হত না। ত্রিশরণ অর্থাৎ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ গ্রহণ করলেই তিনি বৌদ্ধ-গৃহস্থরূপে অভিহিত হতেন[4]।

বৌদ্ধধর্ম প্রচারের প্রথম দিকে বৌদ্ধ-গৃহস্থগণের মধ্যে কোনো রকম ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান করার রীতি প্রচলিত ছিল না। ক্রমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি গৃহস্থ বৌদ্ধসম্প্রদায়ের পক্ষে ধর্মাচরণের অঙ্গ হয়ে উঠল[5]। যথা:

(ক) ত্রিশরণ ও পঞ্চশীল-

(পঞ্চশীল যথা : প্রাণী হত্যা হইতে বিরতি
অদত্তাদান " "
অব্রহ্মচর্য " "
মিথ্যা অর্থাৎ কুৎসারটনাকারি, পরুষ
এবং সম্প্রলাপ অসংযত বাক্য
এই চতুর্বিধ বাক্য কথন হইতে বিরতি এবং
সুরাদি মাদক দ্রব্য সেবন " ") গ্রহণ।

(খ) উপোসথ দিবসে পঞ্চ বা অষ্টশীল[6] গ্রহণ এবং ধর্মোপদেশ শ্রবণ,

(গ) ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের বর্ষাবাসের পর উভয় সংঘে অর্থাৎ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সংঘে চীবর ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দান।

(ঘ) চার পুণ্যস্থান অর্থাৎ
বুদ্ধদেবের জন্মস্থান লুম্বিনী,
" সম্বোধিলাভ স্থান বুদ্ধগয়া,
" ধর্মচক্র প্রবর্তন স্থান সারনাথ এবং
" মহাপরিনির্বাণ স্থান কুশী নারা দর্শন।

তুলনীয় :
অংগুত্তর নিকায়, ৮ ৫ ৮ নালন্দা সংস্করণ পৃঃ ৩৬৩

4 বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম, ডঃ শ্রী মনুকুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৮৮

5 প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৭

6 "পাণং ন হানে, নচাদিন্নমাদিয়ে
মুসা ন ভাসে, ন চ মজ্জপো সিয়া,
অব্রহ্মচরিয়া বিরমেয্য মেথুনা,
রত্তিং ন ভুঞ্জেয্য বিকালভোজনং
মালং ন ধারেয্য ন চ গন্ধমাচরে,
মঞ্চে ছমায বসয়েথ সন্থতে,
এতং হি অট্ঠঙ্গিকমাহুপোসথং, বুদ্ধেন দুক্খন্তগুনা পকাসিতং ॥"

(ঙ) স্তূপ ও চৈত্যের পূজা।

মানবশিক্ষক বুদ্ধদেব কেবল প্রব্রজিত নারী-পুরুষকেই শিক্ষাদান করেন নি, যে কল্যাণ পথ অনুসরণে সকল শ্রেণীর গৃহস্থ মানুষ আদর্শজীবন যাপন করতে পারেন, সেই পথের নির্দেশও তিনি তাঁদের দিয়েছেন। গৃহিগণের উদ্দেশে তিনি যে সকল উপদেশ দিয়েছেন সেগুলি পালিসাহিত্যের অন্তর্গত অঙ্গুত্তর নিকায়, দীর্ঘনিকায়, মজ্ঝিমনিকায় প্রভৃতি প্রতিটি গ্রন্থে গৃহপতি বর্গ (গৃহপতি বগ্গো) নামক একটি পরিচ্ছেদে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। দীর্ঘনিকায় গ্রন্থে সন্নিবেশিত সিংগালোবাদ সূত্রে সমাজস্থ মানুষের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক অনুযায়ী কর্তব্য ও অকর্তব্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

যেমন— মাতা-পিতার প্রতি পুত্রের এবং
পুত্রের প্রতি মাতা-পিতার কর্তব্য
স্ত্রীর প্রতি স্বামীর এবং
স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য,
প্রভুর প্রতি ভৃত্যের এবং
ভৃত্যের প্রতি প্রভুর কর্তব্য,
বন্ধুর প্রতি বন্ধুর কর্তব্য ইত্যাদি।

এই জন্য 'সিংগালোবাদ সুত্ত'কে গৃহী-বিনয় বলা হয়'।

বুদ্ধদেব জানতেন তাঁর গৃহত্যাগী সন্তানদের গ্রাসাচ্ছাদনের প্রয়োজন আছে কিন্তু তাঁদের জীবিকার সংস্থান বা ধনাগমের পথ নেই। তিনি একথাও জানতেন '‍ গৃহত্যাগী সন্তানদের উক্ত প্রয়োজন সাধিত হবে তাঁরই গৃহস্থসন্তানগণের মাধ্যমে, কারণ ভারতীয় মানুষ ধর্মকে কেন্দ্র করেই তাঁর জীবন আবর্তিত করেন। তাই দেখা যায় ভারতের প্রায় সকল গৃহস্থ নর-নারী সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর সাধু-সন্ন্যাসীকে সম্মান প্রদর্শন করেন এবং সাধু-সন্ন্যাসীকে দান করা পুণ্যকর্ম বলে আন্তরিক শ্রদ্ধার সঙ্গে বিশ্বাস করেন। এই বিশ্বাসের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ (বৌদ্ধ উপাসক-উপাসিকা ছাড়াও) বহু গৃহস্থ নর-নারী ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের জন্য আহার, বিহার, ভৈষজ্য ও তাঁদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দান করতেন। এই ভাবে

অংগুত্তর নিকায়, ৩ ৭০, ৯-২৪

7. বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম, ডঃ শ্রী সুনন্দকুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৯০

দ্রষ্টব্য ঃ "পালি বিনয়পিটকে গৃহীর শীলপালনের ফলের কথা বর্ণিত আছে। উল্লেখ আছে শীলপালনের দ্বারা গৃহী ধনসম্পত্তি, যশ, সজ্ঞানে মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর দিব্যজীবন লাভ করে।" বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম, ডঃ শ্রী-অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৯১

ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থার মধ্যেও কিন্তু একটি অন্তর্নিহিত মহান উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হয়—বুদ্ধদেব প্রবর্তিত ধর্ম লৌকিক জগতকে অশুচি জ্ঞানে তার সংস্পর্শ থেকে নিজেকে রক্ষা করার মানসে নিজের চারিধারে বেষ্টিত একটি গণ্ডী রচনা করে হ্রদ সদৃশ হতে চায়নি। সমুদ্রের মতই অনন্ত এই ধর্মের ধর্ম-চেতনা। বৌদ্ধধর্ম চেয়েছিল, সাংসারিক অসংখ্য বন্ধনে আবদ্ধ সংসারী মানুষও নিজের সংযম ও দম প্রভাবে মহানন্দময় আত্মমুক্তির স্বাদ গ্রহণ করার মত শক্তি অর্জন করুক[৬]। বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণ কেবলমাত্র আপন আপন মুক্তি লাভে সন্তুষ্ট না থেকে মোহান্ধ জগৎবাসীকেও ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভের জন্য আহ্বান জানাক[৭]। তাই বুদ্ধদেব সংসারত্যাগী ও সংসারী মানুষের মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপনের জন্য নিয়ম করলেন—ভিক্ষা করে যা পাওয়া যাবে সেই ভিক্ষান্নেই ভিক্ষু-ভিক্ষুণীকে জীবনধারণ করতে হবে এবং এই ভিক্ষা গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করে সংগ্রহ করতে হবে। এই নিয়ম প্রবর্তনের ফলে পুণ্যলোভী গৃহীগণ তাঁদের যথাসাধ্য ভিক্ষা দিতেন ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের ভিক্ষা-পাত্রে, এবং বুদ্ধদেবের নির্দেশে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরা গৃহস্থদের শোনাতেন শীলকথা, দানকথা, পুণ্যকথা। এই ভাবে আদান-প্রদানের ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে গড়ে উঠতো মৈত্রী ও প্রীতির সম্পর্ক[10]।

বুদ্ধদেব তাঁর প্রবর্তিত ধর্মের গুরুত্ব সম্বন্ধে প্রথমেই গৃহস্থদের শিক্ষা দিতেন না। দানকথা, শীলকথা, কামের অপকারিতা ইত্যাদি বিষয়ে উপদেশ শ্রবণে উপদিষ্ট মানবের হৃদয়ে প্রকৃত ধর্মপিপাসা জাগ্রত হলে তখন তিনি তাঁদের সংসার জীবনের অসারত্ব, সংযজীবনের সুফল এবং চারি আর্যসত্য সম্বন্ধে ধর্মদেশনা করতেন। তাঁর শিষ্য-শিষ্যারাও উক্ত নীতিতেই জনসমাজে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতেন। এই ভাবে ধর্মপ্রচারের ফলে দেখা যায়, ধীশক্তি সম্পন্ন ধর্মপিপাসুগণের চিত্তে এক আসক্তিহীন মমত্ববোধ জাগ্রত করে. যে বোধ মনের মালিন্য দূর করে মানুষকে মহৎ, মহীয়ান করে এবং মানুষের অনুভূতির বৃত্তকে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর রূপে বিস্তৃত করতে থাকে। এই বিস্তৃতি যত ঘটে সংস্কারের বন্ধন তত শিথিল থেকে শিথিলতর হয়, এবং ক্রমে এমন এক অবস্থায় আসে যেখানে গৃহস্থ সাধিকা বা সাধকের অনুভূতি বা উপলব্ধিকে সংস্কার আর তার বন্ধনে বেঁধে রাখতে পারে না—বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। এই ভাবে গৃহবাসী হলেও সাধিকা বা সাধক এক বন্ধনহীন আনন্দ ও শান্তিময় মুক্তজীবন লাভ করেন। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বৌদ্ধ গৃহস্থ নারী-পুরুষ আধ্যাত্মিক জগতে উন্নতি সাধনে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। তাই দেখা যায়, বৌদ্ধসংঘের

---

৬ মহাপরিনির্বান সুত্ত, ৩৭

৭. মহাবগ্গো, ১০ ১০ ৩২, নালন্দা সংস্করণ।

10 বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম, ডঃ শ্রী অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ৮৬-৮৭

উত্তরোত্তর বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় প্রসারিত হয়ে উঠল এক বৌদ্ধ গৃহস্থসম্প্রদায়। এই বৌদ্ধ-গৃহস্থ সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সকল উপাসিকা পালি-সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন সেই উপাসিকাবৃন্দের মধ্যে কয়েকজন প্রখ্যাতা ধার্মিকা নারীর ধর্মমহিমায় উজ্জ্বল জীবনচরিত নিম্নে বলা হল।

মহাউপাসিকা বিশাখা (বিসাখা):

অঙ্গ রাজ্যের[1] ভদ্রীয় (ভদ্দিয়) নগরের ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর কন্যারূপে বিশাখা[2] জন্মগ্রহণ করেন। বিশাখার মাতার নাম ছিল সুমনা দেবী[3]। নৃপতি বিম্বিসারের রাজ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী যে পাঁচজন শ্রেষ্ঠী ছিলেন তাঁদের মধ্যে ধনঞ্জয়ের পিতা মেণ্ডক শ্রেষ্ঠী ছিলেন অন্যতম। ব্যক্তি হিসাবে মেণ্ডক শ্রেষ্ঠী ছিলেন অত্যন্ত সাধু প্রকৃতির। তিনি বুদ্ধদেবের পরমভক্ত ছিলেন। তাঁর পরিবারের সকলেই বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

বিশাখা যখন বয়সে বালিকা মাত্র, সেই সময় একবার সসংঘ বুদ্ধদেব ভদ্রীয় নগরে আগমন করেন। মেণ্ডক শ্রেষ্ঠী যথাবিধি শ্রদ্ধা ও সম্মান সহকারে বুদ্ধদেবকে সম্বর্ধনা জানান। পিতামহ মেণ্ডকের নির্দেশে বহু সহচরী পরিবৃতা বিশাখা বুদ্ধদেবের চরণে ভক্তিপূর্ণ প্রাণের প্রণাম জানাতে তাঁর সমীপে গমন করেন। প্রণাম নিবেদন কালে বিশাখার শ্রদ্ধাবনত চিত্তের যে পরিচয় বুদ্ধদেব পেয়েছিলেন তাতে সন্তুষ্ট হয়ে তিনি বিশাখাকে আশীর্বাদ করেন এবং কিছু ধর্মোপদেশ দান করেন। বুদ্ধদেব প্রদত্ত সেই ধর্মোপদেশ শ্রবণে বিশাখা স্রোতাপত্তি ফল লাভ করেন[4]।

একদা কোশলরাজ প্রসেনজিতের অনুরোধে মগধরাজ বিম্বিসার ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীকে কোশলদেশে প্রেরণ করার জন্য মেণ্ডক শ্রেষ্ঠীকে আদেশ করেন[5]। এই আদেশ

---

1 বর্তমান ভাগলপুর, মুঙ্গের ও পূর্ণিয়া জেলার দক্ষিণাংশ নিয়ে অঙ্গরাজ্য গঠিত ছিল। চম্পানগরী ছিল ঐ রাজ্যের রাজধানী। বিম্বিসারের রাজত্বকালে অঙ্গরাজ্য মগধ রাজ্যের অধীনে আসে।

বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম, ডঃ শ্রী অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১

2 ধম্মপদ অট্ঠকথা, ১ম খণ্ড (পি. টি. এস.), পৃঃ ৪০৪-৪১৮।

3 "রাজা যাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া কার্য করিতেন, সুমনাদেবী তাঁহাদেরই একজন ছিলেন।"

বৌদ্ধ রমণী, ডঃ বিমলাচরণ লাহা, পৃঃ ১২৪

4 বৌদ্ধ রমণী, ডঃ বিমলাচরণ লাহা, পৃঃ ১২৪

5. Great Women of India, Ed by swami Madhavananda and R C. Majumder p-270

প্রতিপালিত হলে প্রসেনজিতের নির্দেশ ক্রমে ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী সাকেত[6] নগরে সপরিবারে বাস করতে থাকেন।

শ্রাবস্তীনগরে মিগার নামে এক মহাধনবান শ্রেষ্ঠী বাস করতেন। পূর্ণবর্ধন (পুষ্যবর্ধন) নামে তাঁর একটি পুত্র ছিল। পূর্ণবর্ধন যখন বিবাহযোগ্য বয়স প্রাপ্ত হলেন তখন তাঁর মাতা পুত্রকে প্রশ্ন করে জ্ঞাত হলেন যে, তাঁর পুত্র পঞ্চগুণালংকৃতা (অর্থাৎ সুন্দর বর্ণ, সুন্দর শ্রী, সুন্দর তনু, সুন্দর দন্তরাজি এবং সুন্দর কেশ-সমন্বিতা)[7] বধূ লাভের অভিলাষী। তখন তিনি পাঁচজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে আহ্বান করে তাঁদের ওপর পূর্ণবর্ধনের অভিলষিত পাত্রী অন্বেষণের ভার অর্পণ করলেন। উক্ত ব্রাহ্মণগণ পাত্রী অন্বেষণে নানা জনপদে ভ্রমণ করতে করতে অবশেষে সাকেত নগরে এক উৎসব মুখরিত দিবসে অনিন্দ্যসুন্দরী বিশাখার প্রতি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষিত হল। বিশাখার সঙ্গে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বাক্যালাপ করে তাঁরা বুঝলেন, কন্যাটি কেবল রূপবতীই নয় যথেষ্ট বুদ্ধিমতীও বটে। তাঁরা বিশাখাকেই পূর্ণ-বর্ধনের ভাবী পত্নীরূপে মনোনয়ন করে বিশাখার পিতার নিকট পূর্ণবর্ধনের সহিত বিশাখার বিবাহের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। ধনঞ্জয় কর্তৃক এই বিবাহ প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হল। তিনি রাজা প্রসেনজিতের নিকট এই বিবাহের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলেন। উক্ত বিবাহে অনুমতি দান করে প্রসেনজিৎ জানালেন, তিনি স্বয়ং এই বিবাহে উপস্থিত থেকে বিবাহ সভার মর্যাদা ও গৌরব বৃদ্ধি করবেন[8]।

পূর্বোক্ত পঞ্চব্রাহ্মণের মুখে সকল সংবাদ অবগত হয়ে সস্ত্রীক মিগার শ্রেষ্ঠী অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। মিগার ও ধনঞ্জয় পরস্পরের মধ্যে পত্র বিনিময় করে বিবাহের জন্য শুভদিন স্থির করলেন। মহা সমারোহে বিশাখার সঙ্গে পূর্ণবর্ধনের শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হল। কথিত আছে, এই বিবাহ উপলক্ষে আনন্দোৎসব দীর্ঘ তিনমাস যাবৎ একাদিক্রমে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কন্যাকে বিবাহে ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী যৌতুক স্বরূপ দিলেন—শত শত যান পূর্ণ (ক) অর্থ, (খ) স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র-নির্মিত বিবিধ তৈজস, (গ) বিচিত্র বর্ণের নানাবিধ রেশমী বস্ত্র, (ঘ) ঘৃতপূর্ণ কুম্ভ, (ঙ) সুগন্ধি তণ্ডুল, (চ) লাঙ্গল প্রভৃতি কৃষিকার্যের প্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং শত শত গাভী ও বলদ এবং শত শত ক্রীতদাসী। অন্যান্য নানাবিধ অলংকারের

---

6 বুদ্ধদেবের সমকালে ভারতে যে ছয়টি প্রধান নগর ছিল তাদের মধ্যে সাকেত একটি। অপর পাঁচটির নাম—চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, কৌশাম্বী ও কাশী।

Dictionary of pali proper name, Vol —II, p-1084.

7 Buddhism in Translation, H warren, P T S , p-454

8 Great Women of India, Ed. by Swami Madhavananda and R C. Majumder. p-271

সহিত 'মহলতা পসাদন'[9] নামে যে বহুমূল্য রত্ন খচিত অলংকারটি বিশাখার বিবাহে ধনঞ্জয় কন্যাকে উপহার দিয়েছিলেন সেই বিশেষ অলংকারটি নির্মাণ করতে কয়েকজন দক্ষ স্বর্ণকারকে চারমাস সময় ব্যয় করতে হয়েছিল।

কন্যার শ্বশুরালয়ে যাত্রার প্রাক্কালে ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী কন্যাকে প্রহেলিকার ভাষায় যে কয়েকটি বিশেষ উপদেশ দিয়েছিলেন, সেগুলি পার্শ্বস্থিত কক্ষে উপবিষ্ট মিগার শ্রেষ্ঠীর শ্রুতিগোচর হয়, কিন্তু তিনি তখন সেগুলির অর্থ অনুধাবন করতে পারেন নি। কন্যাকে উপদেশ দানের পর, শ্বশুরালয়ে বাসকালীন বিশাখার ন্যায়-অন্যায় আচরণের বিচারের জন্য শ্রাবস্তী নগরের আটজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী মনোনীত করে কন্যাকে শ্বশুর গৃহে প্রেরণ করলেন[10]। বিশাখা পিতৃদত্ত মহালতা পসাদনে অলংকৃতা হয়ে (যে অলংকার তাঁর মস্তক থেকে পাদদেশ পর্যন্ত পুষ্পলতার মত বিস্তৃত হয়ে তাঁর অপরূপ সৌন্দর্যকে আরও মহিমান্বিত করে তুলেছিল) যানে দণ্ডায়মান অবস্থায় শ্রাবস্তী নগরে প্রবেশ করলেন। বিশাখাকে দর্শন করে শ্রাবস্তীর নাগরিকগণ বিপুল আনন্দে তাঁকে যে সকল উপহার দিয়েছিলেন অত্যন্ত বিনয় ও সৌজন্যের সহিত সে সমস্তই বিশাখা তাঁদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন। বিশাখার মত পুত্রবধূ লাভ করে মিগার দম্পতি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

মিগার শ্রেষ্ঠী ছিলেন জৈন ধর্মের দিগম্বর সম্প্রদায় ভুক্ত। পুত্রের বিবাহ উৎসবে তিনি উক্ত ধর্মসম্প্রদায়ের কয়েকজন সন্ন্যাসীকে নিজগৃহে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করেন, এবং বধূ বিশাখাকে ভক্তিসহকারে তাঁদের আপ্যায়ন করার জন্য আদেশ দেন, কিন্তু নগ্ন সন্ন্যাসীদের দর্শন করেই লজ্জিতা বিশাখা তৎক্ষণাৎ সেস্থান পরিত্যাগ করলেন। এই ঘটনায় মিগার শ্রেষ্ঠী অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে বিশাখাকে পিত্রালয়ে প্রস্থান করার জন্য আদেশ দিলেন। কিন্তু বুদ্ধিমতী বিশাখা বুঝতে পারলেন যে, ভ্রমবশতঃ মিগার শ্রেষ্ঠী তাঁকে এই প্রকার আদেশ দিয়েছেন। সেজন্য তিনি দৃপ্তভঙ্গীতে শ্বশুরের আদেশ পালনে অস্বীকার জানিয়ে পিতার নির্বাচিত শ্রাবস্তী নগরের পূর্বোক্ত আটজন নাগরিককে আহ্বান জানালেন। তাঁরা উপস্থিত হলে মিগার শ্রেষ্ঠী অনুযোগ জানিয়ে বললেন যে, বিশাখার এইরূপ অন্যায় আচরণের জন্য তাঁর পিতৃদত্ত পূর্বোক্ত উপদেশগুলিই দায়ী। উক্ত অষ্টনাগরিক বিশাখার প্রতি ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর উপদেশের প্রকৃত অর্থ সহ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে যখন মিগার শ্রেষ্ঠীকে বোঝালেন তখন নিজের ভ্রান্তধারণার জন্য লজ্জিত হয়ে বিশাখার নিকট মিগার শ্রেষ্ঠী ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

---

9 The Commentary on Dhammapada, H C Norman, Vol-I, Part-2, p 394

10 ধম্মপদট্ঠকথা (পি. টি এস) ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪০

বিশাখার প্রেরণায় মিগার শ্রেষ্ঠী ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্মে আস্থাশীল হয়ে উঠলেন। সেই সময় যখন বুদ্ধদেব শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করছিলেন, তখন একদিন মিগার শ্রেষ্ঠী সংঘ বুদ্ধদেবকে নিজগৃহে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করলেন, এবং বিশাখার উপর তাঁদের সেবা-পরিচর্যার ভার অর্পণ করলেন। সেই দিনই বুদ্ধদেবের ধর্মোপদেশ শ্রবণ করে মিগার শ্রেষ্ঠী স্রোতাপন্ন হলেন এবং বুদ্ধদেবের নিকট ত্রিশরণ গ্রহণ করলেন[11]। অতঃপর আনন্দাপ্লুত কণ্ঠে বিশাখাকে মাতৃসম্বোধন করে বললেন যে, বিশাখার জন্যই তাঁর এই নবজন্ম লাভ হল; সুতরাং বিশাখা তাঁর জননী। এই কারণেই পালি সাহিত্যের বহুস্থানে বিশাখা 'মিগার মাতা' বলে উল্লিখিত হয়েছেন। মিগার শ্রেষ্ঠীর বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের পর তাঁর স্ত্রী, পুত্র এবং পরিবারস্থ সকলেই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেন।

প্রত্যহ ব্যবহার করার জন্য 'ঘনমট্ঠক' নামে একখানি বহুমূল্য অলংকার যেদিন বিশাখাকে মিগার শ্রেষ্ঠী উপহার দেন, সেদিন বিশাখা সুগন্ধি জলে স্নান করে মহার্ঘ বসন-ভূষণে সজ্জিতা হয়ে এক আড়ম্বর ও আনন্দপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্যে শ্বশুর প্রদত্ত অলংকারটি গ্রহণ করেছিলেন[12]।

দিব্যকান্তি বিশাখা অত্যন্ত বলশালিনী ছিলেন। কথিত আছে তাঁর দেহে পঞ্চহস্তীর বল ছিল। বৃদ্ধবয়সেও শিশুসুলভ লাবণ্যে ও যৌবনদীপ্তিতে বিশাখা উজ্জ্বল ছিলেন[13]।

নানাগুণের অধিকারিণী বিশাখার স্নেহ প্রীতি সেবা পরিচর্যা কেবল মাত্র মানবের জন্য সীমাবদ্ধ ছিল না। ইতর প্রাণীদের ওপরও তাঁর অসীম মমত্ববোধ ছিল। একবার এক ঘোটকীর প্রসবের সময় সমস্ত রাত্রি তার পরিচর্যা করেছিলেন বিশাখা[14]।

বাল্যকাল থেকেই অন্যের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের প্রতি যে আকাঙ্ক্ষা বিশাখার ছিল, পরবর্তীকালে তা-ই তাঁকে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের নানাবিধ অসুবিধা দূর করার জন্য আগ্রহী করে তোলে, ফলে তিনি বুদ্ধদেবের নিকট বৌদ্ধসংঘে 'অষ্টবিধ' বস্তু আজীবন দান করার জন্য বর প্রার্থনা করলেন, এই অষ্টবিধ বর হল—বুদ্ধদেবের নিকট উপস্থিত যে কোনো ভিক্ষুকে বিশাখা কর্তৃক ভক্ত দ্রব্য দান, বিশাখা আজীবন পঞ্চশত ভিক্ষুর আহার জোগাবেন, পীড়িত ভিক্ষুকে ঔষধ-পথ্য দেবেন

---

11 প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮৪

12 প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০৯

13 প্রাগুক্ত

14 Great Women of India, Ed by Swami Madhavananda and R C Mazumdar p 273,

ও পীড়িতের শুশ্রূষাকারীদের ভরণ পোষণ করবেন বিশাখা, প্রত্যহ পঞ্চশত ভিক্ষুকে যে খাদ্য দ্রব্য দেবেন বিশাখা, বুদ্ধদেব সেই খাদ্যের অংশ গ্রহণ করবেন, বিহারের ভিক্ষুদের জন্য যত ঔষধ প্রয়োজন হবে সে সমস্তই জোগাবেন বিশাখা, প্রতি বৎসর পঞ্চশত ভিক্ষুকে বর্ষাকালীন বস্ত্র এবং সমস্ত ভিক্ষুকে 'কণ্ডুপ্রতিচ্ছাদন' নামক বস্ত্র দান করবেন বিশাখা। বুদ্ধদেব বিশাখার এইরূপ প্রার্থনার কারণ জিজ্ঞাসা করলে করজোড়ে বিনম্রবচনে বিশাখা প্রতিটি বিষয়ের ব্যাখ্যা করে বললেন যে, যদি বিশাখা প্রদত্ত বস্ত্র, ঔষধ, পথ্য ইত্যাদি নির্বাণ প্রয়াসীদের কিছুমাত্র সহায়ক হয় তবে বিশাখা নিজেকে ধন্য মনে করবেন। বুদ্ধদেব তখন বিশাখার প্রার্থিত 'অষ্টবিধ' বস্তু দানের বর বিশাখাকে প্রদান করলেন[15]। বিশাখা তাঁর মহালতা পসাদন সহ সমস্ত অলংকার সংঘে দান করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের পক্ষে স্বর্ণরৌপ্য প্রভৃতি দান বিধেয় নয় জেনে উক্ত অলংকারগুলির বিক্রয়লব্ধ অর্থে (নয়কোটি কার্ষাপণ) শ্রাবস্তী নগরের পূর্ব কোণে পূর্বারাম নামে সহস্রকক্ষ বিশিষ্ট এক সুরম্য ও বিশাল বিহার নির্মাণ করিয়ে সেটি তিনি বৌদ্ধ-সংঘে দান করলেন। বিশাখা প্রতিষ্ঠিত এই বিহার পালি সাহিত্যে মিগারমাতু পাসাদ (মিগারমাতার প্রাসাদ) নামে পরিচিত। কথিত আছে যে, উক্ত বিহার প্রতিষ্ঠা দিবসে পুত্র-কন্যা, পৌত্র-পৌত্রী ইত্যাদি আত্মীয়স্বজন সহ উপস্থিত বিশাখার হৃদয়ানন্দ সংগীতরূপে তাঁর কন্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল[16]। রাহুল সাংকৃত্যায়ন উল্লেখ করেছেন যে, বিশাখা সাতাশ কোটি মুদ্রা সংঘের জন্য ব্যয় করেছিলেন[17]।

বিশাখা প্রতিদিন বুদ্ধদর্শন ও তাঁর ধর্মোপদেশ শ্রবণ এবং ভিক্ষু-ভিক্ষুণী সংঘ .[illegible] করতেন। উভয় সংঘের নিকট বিশাখা মাতৃস্বরূপা ছিলেন এবং মাতার ন্যায় সস্নেহে, সযত্নে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের তত্ত্বাবধান করতেন। বিশাখা ইচ্ছাবশতই ভিক্ষুণীসংঘভুক্তা হন নি, বৌদ্ধ উপাসিকা হিসাবেই তিনি নিজের জীবন সার্থক করতে চেয়েছিলেন[18]।

পরমত্থদীপনী, ধম্মপদট্ঠকথা, জাতক প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, সংঘসংক্রান্ত কোনো কোনো সমস্যার সমাধানে বুদ্ধদেব বিশাখার পরামর্শ গ্রহণ করতেন। বিনয়পিটকেও উক্ত বিষয় সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ আছে[19]। মুচলিন্দ বগ্গে উল্লিখিত

---

15. Mahavaggo, 8 17
16 Dhammapadatthakatha, Vol 1 P T S, p-416
17 "Jetavana", Megari pracharini patrika, p 304
18 Buddhist Legenda, Burlingame, Book-2, p 82.
19. বিনয়পিটক (এইচ্, ওল্ডেনবার্গ), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৭ এবং ১৯১

আছে যে, সংঘ সংক্রান্ত কোনো বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য বিশাখা একবার কোশলরাজ প্রসেনজিতের সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলেন[20]। বিশাখা দশপুত্র ও দশকন্যার জননী ছিলেন। তাঁর বহু পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী ছিল। বিশাখার স্বামী পুণ্যবর্ধন বিশাখার বৌদ্ধধর্ম প্রাপ্তিতে কোনো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেননি— এই তথ্য টুকু ছাড়া পালিসাহিত্য পাঠে পুণ্যবর্ধনের সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না।

বিশাখা যে অত্যন্ত স্নেহশীলা ছিলেন সেকথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এক পৌত্রের মৃত্যুতে বিশাখা যখন অত্যন্ত শোকাতুরা হয়ে পড়েন তখন বুদ্ধদেব তাঁকে শান্ত করার উদ্দেশে বলেন যে, আসক্তিযুক্ত প্রেম বা ভালবাসা থেকে শোক উৎপন্ন হয়, কিন্তু যিনি আসক্তি শূন্য হন তাঁর ভালবাসা বা প্রেমে শোক উৎপন্ন হতে পারে না, সুতরাং সে ক্ষেত্রে ভয়ও আসতে পারে না[21]। এই হেতু বুদ্ধদেব মানবজাতিকে আসক্তিহীন প্রেমিক হতে বার বার উপদেশ দিয়েছেন।

বিশাখার গৃহে প্রতিদিন দু হাজার ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর ভোজন ও সেবার ব্যবস্থা ছিল। এই কর্মে সাহায্য করার জন্য বিশাখা তাঁর এক পৌত্রীকে নিযুক্ত করেছিলেন। দানশীলা বৌদ্ধ উপাসিকাগণের মধ্যে বিশাখা সর্বশ্রেষ্ঠারূপে বুদ্ধদেব কর্তৃক সম্মানিতা হয়েছিলেন[22]।

মহাউপাসিকা বিশাখা ইহলোকে যশ-খ্যাতি-প্রতিপত্তি ও পরলোকে সুখস্থিতির জন্য প্রত্যাশী ছিলেন না। নিস্বার্থভাবে অকুণ্ঠ অর্থ, সামর্থ ও সময় ব্যয় করে তিনি আজীবন ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের সেবা ও পরিচর্যা করেছেন এবং ধর্মপথে তাঁদের চলার জন্য তিনি তাঁর যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন।

একশ কুড়ি বৎসর বয়সে এই পূতচরিত্রা তেজস্বিনী ও অসামান্যা বুদ্ধিমতী মহীয়সী মহিলার জীবনদীপ নির্বাপিত হয়।

সুমনা (সুমনদেবী):

সুমনা[1] ছিলেন মহাউপাসক অনাথ পিণ্ডিকের সর্বকনিষ্ঠা কন্যা। সুমনার

---

20 উদানবু, পি টি এস, পৃঃ ১৮

21 ধম্মপদ, পিয়বগ্গো, ৫

দ্রষ্টব্য ঃ

Buddhist Legends, Burlingame, Book—2, p, 84.

22 "দায়িকানং যদিদং বিসাখা মিগারমাতা।"

অঙ্গুত্তর নিকায়, ১। ২৬, নালন্দা সংস্করণ।

1 : Paramattha Dipani, Vol, V, P T S , p-22

সর্বাগ্রজার নাম ছিল মহা সুভদ্রা (মহাসুভদ্দা), এবং তার পরবর্তী ভগ্নীর নাম ছিল ছোট সুভদ্রা (চুল সুভদ্দা)।

অনাথ পিণ্ডিকের গৃহে প্রতিদিন দুই হাজার ভিক্ষুর ভোজনের ব্যবস্থা ছিল[2]। ভিক্ষুগণের ভোজনকালে তত্ত্বাবধানের জন্যে অনাথ পিণ্ডিক তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা মহাসুভদ্রার ওপর দায়িত্ব দিয়েছিলেন। মহাসুভদ্রার বিবাহের পর তিনি যখন তাঁর পতিগৃহে চলে গেলেন তখন উক্ত কর্মের দায়িত্বভার ছোট সুভদ্রার ওপর ন্যস্ত হল এবং তাঁরও যখন বিবাহ হল এবং পতিগৃহে চলে গেলেন তখন ভিক্ষুগণের ভোজনকালে তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ভার অনাথ পিণ্ডিক তাঁর সর্বকনিষ্ঠা কন্যা সুমনার হস্তে অর্পণ করলেন[3]।

সুমনা অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা ছিলেন। বিবাহিত জীবনের প্রতি তাঁর কোনো আকর্ষণ ছিল না। তাঁর তত্ত্বাবধানে ভিক্ষুগণ পরিতোষ পূর্বক ভোজন সমাধা করলে তিনি পরম তৃপ্তি লাভ করতেন। সুমনা আজীবন কৌমার্যব্রত পালন করেছিলেন। ব্রহ্মচারিনী সুমনা গৃহবাসিনী হয়েও আধ্যাত্মিক জগতের সাধনমার্গে সকৃদাগামী স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন। পিতা কর্তৃক কুশলকর্মে নিযুক্ত হয়ে তিনি পিতৃভবনে আনন্দে দিন যাপন করতেন।

এক সময় সুমনা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। প্রজ্ঞাবতী সুমনা নিজের জ্ঞানপ্রভাবে, বুঝতে পারলেন যে, তাঁর মৃত্যু আসন্ন। মৃত্যুর পূর্বে পিতার সহিত সাক্ষাতের অভিলাষে জনৈক ব্যক্তির মাধ্যমে পিতাকে আহ্বান জানালেন।

অনাথ পিণ্ডিক সেই সময় নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে এক ব্যক্তির গৃহে গমন করেছিলেন। সুমনা তাঁকে আহ্বান করেছেন এই সংবাদ শোনা মাত্রই অনাথ পিণ্ডিক শশব্যস্তে মৃত্যুপথ-যাত্রিণী কন্যার শয্যা পার্শ্বে উপস্থিত হলেন এবং কি কারণে সুমনা তাঁকে আহ্বান করেছেন সে কথা জানতে চাইলেন। কন্যা সুমনা কিন্তু পিতা অনাথপিণ্ডককে ভ্রাতা সম্বোধন করে প্রতিপ্রশ্ন করলেন—"কি বলিতেছ কনিষ্ঠ ভ্রাতা?" (কিং তাত কনিট্ঠভাতিকা'তি) কন্যার মুখে ভ্রাতৃ সম্বোধন শ্রবণ করে অনাথপিণ্ডক চিন্তা করলেন সম্ভবতঃ রোগের প্রাবল্যবশতঃ সুমনা প্রলাপবাক্য বলছেন। কিন্তু সুমনা জানালেন, তিনি প্রলাপ বাক্য বলছেন না। অনাথপিণ্ডিক তখন আবার জানতে চাইলেন সুমনা ভয় পাচ্ছেন কি? উত্তরে সুমনা জানালেন— "না, আমি ভয় পাইতেছি না কনিষ্ঠ ভ্রাতা" ("ন ভাযামি কণিট্ঠ ভাতিকা" তি)। এই উত্তর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুমনার প্রাণবায়ু দেহ পিঞ্জর থেকে নির্গত হয়ে গেল[4]।

---

2 ধম্মপদট্ঠ কথা, ১৩ ১

3 প্রাগুক্ত,

4. প্রাগুক্ত, ১৩.৩

কন্যাশোকে অনাথপিণ্ডিক কাতর হয়ে পড়লেন। কন্যার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করে শোকাবেগে ক্রন্দনরত অবস্থায় তিনি বুদ্ধদেবের সকাশে উপস্থিত হলেন এবং মৃত্যুর পূর্বে সুমনার সঙ্গে তাঁর যে কথোপকথন হয়েছিল সে সমস্ত কথা বুদ্ধদেবকে জানিয়ে বেদনার্ত হৃদয়ে সুমনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন।

বুদ্ধদেব তখন তাঁকে বুঝিয়ে বললেন যে, অনাথপিণ্ডিক স্রোতাপন্ন, কিন্তু তাঁর কন্যা সুমনা সকৃদাগামী, সুতরাং আধ্যাত্মিক জগতে অনাথপিণ্ডিক অপেক্ষা সুমনা উন্নততর লাভ করেছেন, এবং সেই হিসাবে সুমনা জ্যেষ্ঠত্বের অধিকারী এবং এই কারণেই সুমনা অনাথপিণ্ডিককে কনিষ্ঠ ভ্রাতা রূপে সম্বোধন করেছেন। অনন্তর বুদ্ধদেব অনাথপিণ্ডিককে বললেন, গৃহীই হোন অথবা প্রব্রাজিতই হোন, যাঁরা অপ্রমত্ত হয়ে বাস করেন তাঁরা ইহলোকে আনন্দে থাকেন এবং পরলোকেও আনন্দময় জীবন লাভের অধিকারী হন। সুতরাং ইহজীবনে অপ্রমত্তা হয়ে বাসকারিণী সকৃদাগামী ফলপ্রাপ্তা সুমনা পরলোকেও আনন্দময় জীবন প্রাপ্ত হওয়ার অধিকারিণী[৮]।

রাণী মল্লিকা :

মল্লিকা কোশলরাজ্যের এক মালাকারের কন্যা হলেও আপন সুকৃতির ফলে তিনি কোশল রাজ প্রসেনজিতের অগ্রমহিষীর পদে প্রতিষ্ঠিতা হয়েছিলেন[1]।

মল্লিকার পিতা কোশলরাজ্যের সর্বাপেক্ষা অধিক খ্যাতিমান মালাকার ছিলেন। বাল্যকালে মল্লিকা চন্দ্রা (চন্দা) নামে পরিচিতা ছিলেন। একদিন চন্দ্রা মল্লিকা-পুষ্প দ্বারা অতি মনোরম এক গাছি পুষ্পমাল্য গ্রন্থন করেন। সেই অপূর্ব সুন্দর পুষ্পমালা দর্শন করে চন্দ্রার পিতা এত আনন্দিত হন যে, কন্যার চন্দ্রা নাম পরিবর্তন করে মল্লিকা নামে তাঁকে অভিহিত করেন। তদবধি চন্দ্রা মল্লিকা নামেই পরিচিত হন। মল্লিকা স্বভাবেও যেমন সুশীলা, রূপেও তেমনি প্রিয়দর্শনী ছিলেন।

বালিকা মল্লিকা ক্রমে যৌবনবতী হলেন। একদিন মল্লিকা যখন কয়েকজন সংগিনীসহ তাঁর পিতার জন্য খাদ্য বহন করে পিতার পুষ্পোদ্যানের অভিমুখে গমন করছিলেন তখন তিনি বুদ্ধদেবের দর্শন লাভ করেন। বুদ্ধদেবকে যথারীতি সম্মান প্রদর্শন করে মল্লিকা বিনীতভাবে খাদ্য গ্রহণ করতে বুদ্ধদেবকে অনুরোধ

৮ ধম্মপদট্ঠ কথা, প্রথম খণ্ড, ১৩ ১-৫

1 Jataka Book, E B Cowell, Vol III p-244

করেন। বুদ্ধদেব মল্লিকাকে আশীর্বাদ করে মল্লিকা প্রদত্ত যাগু[2] গ্রহণ করলেন। সেই সময়ে একদিন অজাতশত্রুর হস্তে বিপর্যস্ত হয়ে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ (পসেনদি) যখন মল্লিকার পিতার পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করেন তখন উদ্যানস্থিতা মল্লিকাকে দর্শন করে তাঁর প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। মল্লিকাও রাজাকে ক্লান্ত দেখে তাঁর অশ্বের বল্গা হস্তে ধারণ করেন এবং রাজাকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে অনুরোধ করেন। রাজা লক্ষ্য করে বুঝলেন,—যে কন্যাটি তাঁর অশ্বের বল্গা ধারণ করে আছেন, তিনি অবিবাহিতা, কুমারী কন্যা। তখন তিনি অশ্ব পৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করলেন এবং মল্লিকার অনুরোধে ভূমিতে উপবিষ্টা মল্লিকার ক্রোড়ে মস্তক স্থাপন করে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। অতঃপর তিনি মল্লিকাসহ মল্লিকার পিতার নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট মল্লিকার পাণি প্রার্থনা করলেন। মল্লিকার পিতা সানন্দে তাঁর আদরিনী কন্যাকে কোশল-রাজের হস্তে সমর্পণ করলেন। বিবাহান্তে মল্লিকাসহ রাজা প্রসেনজিৎ প্রাসাদে প্রত্যাগমন করলেন এবং মল্লিকাকে তাঁর প্রধানা মহিষীরূপে সম্মানিতা করলেন।

ক্রমে ক্রমে মল্লিকার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার পরিচয় পেয়ে কোশল-রাজ অনেক সময় গুরুত্ব পূর্ণ রাজকার্য সম্বন্ধেও মল্লিকার পরামর্শ গ্রহণ করতেন। বিশেষ কোনো রাজকার্যে পরামর্শ দেওয়া ছাড়াও রাণী মল্লিকা তাঁর স্বামীকে তাঁর নানা কাজে তাঁকে সাহায্য করতেন, প্রেরণা যোগাতেন, উৎসাহ দান করতেন[3]।

এক সময়ে এমন এক ঘটনা ঘটেছিল—প্রতিরাত্রে রাত্রি দ্বিপ্রহরে প্রসেনজিৎ চারটি ভয়ংকর শব্দ শুনতে পেতেন। এই শব্দ শ্রবণের কুফল প্রতিরোধের উদ্দেশে রাজার মঙ্গলাকাঙ্খী রাজ্যের ব্রাহ্মণগণ পশুবলি দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যবস্থা দিয়েছেন এই সংবাদ শ্রবণ করে মল্লিকা স্বামীকে বুদ্ধদেবের নিকট প্রেরণ করেন। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব প্রসেনজিতকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তার ফলে বলিদানের জন্য যে সকল পশু আনীত হয়েছিল সেই সব নিরীহ পশুদের প্রাণ রক্ষা হয়[4]।

মহাসুপিন জাতক কাহিনীতে উল্লেখ আছে যে, একদিন রাত্রির শেষ প্রহরে প্রসেনজিৎ ষোলটি দারুণ দুঃস্বপ্ন দেখে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও বিচলিত হয়ে পড়েন এবং পরদিন রাজ্যের কয়েকজন মহাপণ্ডিত ব্রাহ্মণকে আহ্বান করে তাঁদের কাছে দুষ্ট স্বপ্নবৃত্তান্ত জানান এবং স্বপ্নগুলির ব্যাখ্যা করতে তাঁদের অনুরোধ করেন।

---

2. চারভাগ চাউল ও চৌষট্টিভাগ জল মিশিয়ে জ্বাল দিলে যে মণ্ড প্রস্তুত হয়, পালিসাহিত্যে সেই মণ্ডকে যাগু নামে অভিহিত করা হয়েছে।

3 ধম্মপদট্ঠকথা দ্বিতীয় খণ্ড, বুদ্ধবগ্গো, পৃঃ ২৪

4. ধম্মপদট্ঠকথা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১২১

ব্রাহ্মণগণ নিজ নিজ বিদ্যা-বুদ্ধি অনুযায়ী স্বপ্নগুলির ব্যাখ্যা করলেন এবং তাদের কুফলের প্রতিকারের জন্য নানারকম উপায়ও নির্দেশ করলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণগণের কৃত উক্ত স্বপ্ন ব্যাখ্যা এবং কুফল প্রতিকারের উপায় শ্রবণ করে কোশলরাজ অন্তরে শান্তি বা ভরসা পেলেন না। তাঁকে এইরকম উদ্বিগ্নচিত্ত দেখে রাণী মল্লিকা কারণ জিজ্ঞাসা করায় রাজা তাঁর দুঃস্বপ্ন দর্শন ও ব্রাহ্মণগণের স্বপ্ন ব্যাখ্যা ইত্যাদি সকল কথা জানান। সকল কথা শ্রবণ করে তখন মল্লিকা স্বামীকে অনুরোধ করলেন, তিনি যেন অর্হত্বাদি নবগুণ সম্পন্ন (ভগবান, অর্হন, বুদ্ধ, সম্যকসম্বুদ্ধ বিদ্যা-চরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দম্যসারথি ও দেব-নরগণের শাস্তা) বুদ্ধদেবের নিকট প্রসেনজিতের দৃষ্ট স্বপ্নের ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন। মল্লিকার পরামর্শ গ্রহণ করে প্রসেনজিৎ বুদ্ধদেব সকাশে উপস্থিত হন এবং ষোলটি স্বপ্ন বৃত্তান্ত ও ব্রাহ্মণগণের স্বপ্ন ব্যাখ্যা ইত্যাদি সকল বিবরণ তাঁকে জানান।

আদ্যন্ত সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করে বুদ্ধদেব প্রসেনজিৎ দৃষ্ট প্রত্যেকটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে জানালেন যে, উক্ত স্বপ্নগুলি দর্শনের ফলে প্রসেনজিতের কোনো অমঙ্গলের আশংকা নেই কারণ স্বপ্নগুলির ফল প্রসেনজিতের জীবদ্দশায় ফলবে না, স্বপ্নগুলি সবই সুদূর ভবিষ্যতের ফলদ্যোতক। এই সব স্বপ্ন দর্শনের ফলে প্রসেনজিতের বহু বিপত্তি ঘটবে বলে ব্রাহ্মণগণ যে ভয় প্রদর্শন করেছেন তা শাস্ত্র সঙ্গতও নয়, রাজার প্রতি স্নেহ-প্রীতি-বশতও নয়, এর মূলে আছে ব্রাহ্মণদের অন্তর্নিহিত অর্থলালসা।

উপরোক্ত জাতক কাহিনীটির মূল কথা ধম্মপদট্‌ঠকথাতেও লিপিবদ্ধ আছে[১]।

মল্লিকার প্রেরণায় প্রসেনজিৎ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু বৌদ্ধদর্শনে প্রসেনজিৎ অপেক্ষা মল্লিকার জ্ঞান আরও গভীর ছিল। একদিন মল্লিকার সঙ্গে প্রেমালাপে রত প্রসেনজিৎ আবেগকম্পিত গদগদ কণ্ঠে মল্লিকাকে প্রশ্ন করলেন— মল্লিকার নিকট আপন আত্মা অপেক্ষাও প্রিয়তর ব্যক্তি আছেন কি? উত্তরে মল্লিকা জানান যে, তাঁর আপন আত্মা অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় বস্তু তাঁর আর কিছুই নেই। মল্লিকার উত্তর শুনে প্রসেনজিৎ অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হন, কারণ তিনি আশা করেছিলেন— মল্লিকা বলবেন, প্রসেনজিৎই মল্লিকার সর্বাপেক্ষা প্রিয়ব্যক্তি। ক্ষুব্ধ প্রসেনজিৎ একদিন প্রসঙ্গক্রমে উক্ত ঘটনাটি বুদ্ধদেবের নিকট নিবেদন করেন। বুদ্ধদেব প্রসেনজিতের মুখে বিবরণটি জ্ঞাত হয়ে মল্লিকার সত্যনিষ্ঠা ও জ্ঞানের গভীরতার প্রশংসা করে বললেন যে, মল্লিকা মহাসত্যকে যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন,

---

১ প্রাগুক্ত পৃঃ।

বলেই তিনি উক্ত প্রকার বাক্য প্রয়োগ করেছেন, কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট নিজের আত্মার অপেক্ষা অন্য কোনো বস্তুই অধিকতর প্রিয় নয়[6]।

রাণী মল্লিকা এবং বাসবক্ষত্রিয়া (বাসবক্‌খত্তিয়া) নামে প্রসেনজিতের অপর এক মহিষী ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করতে ইচ্ছুক হওয়ায় প্রসেনজিৎ বুদ্ধদেবের নিকট মহিষীদের অভিলাষটি নিবেদন করলেন। বুদ্ধদেব মল্লিকা ও বাসবক্ষত্রিয়াকে ধর্মশিক্ষা দানের জন্য আনন্দকে নিযুক্ত করলেন। উভয়কে ধর্মশিক্ষা দান করতে গিয়ে আনন্দ বুঝলেন, বাসবক্ষত্রিয়া অপেক্ষা মল্লিকার শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা এবং অধ্যবসায় অনেক বেশী[7]।

দোষী রূপে সনাক্ত হয়ে বিচারার্থে কারাগারে বন্দী হয়ে আছে এমন বহু ব্যক্তি ধর্মশীলা রাণী মল্লিকার সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও বিচক্ষণ মধ্যস্থতায় নির্দোষী প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত বন্দীগণ নানাবিধ দণ্ড ভোগ থেকে মুক্তি লাভ করেছিল, ফলে কোশলরাজ্যের নাগরিকগণের শুভাশীর্বাদ রাণী মল্লিকার মস্তকে দেবতার স্নেহাশীর্বাদের মত ঝরে পড়েছিল।

এক সময় বুদ্ধদেব যখন জেতবনে আগমন করেন তখন কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ও রাণী মল্লিকা কর্তৃক বৌদ্ধসংঘের উদ্দেশে এক বিরাট দানোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠান যাতে সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন হয় তার জন্য মল্লিকা পূর্বাহ্নেই ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। উৎসব অনুষ্ঠানটি মহিমোজ্জ্বল করে তোলার জন্য মল্লিকা অন্যান্য ব্যবস্থার সঙ্গে নিম্নলিখিত রূপ আরও কয়েকটি ব্যবস্থা করেছিলেন ঃ

(ক) শালকাষ্ঠ নির্মিত এমন একটি বৃহৎ মণ্ডপ নির্মিত হয়েছিল যার ভিতরে পাঁচশত ও বাহিরে পাঁচশত ভিক্ষু সুখে উপবেশন করতে পারেন।

(খ) পাঁচশত হস্তী পাঁচশত ভিক্ষুর পশ্চাতে দণ্ডায়মান অবস্থায় পাঁচশত শ্বেতছত্র উত্তোলন করেছিলেন।

(গ) মণ্ডপের মধ্যস্থলে নানা গন্ধদ্রব্য পরিপূর্ণ সুবর্ণময় তরী সমূহ স্থাপন করা হয়েছিল।

(ঘ) প্রতি দুইজন ভিক্ষুর মধ্যে দণ্ডায়মানা এক একটি ক্ষত্রিয়কন্যা গন্ধদ্রব্য সমূহ নিক্ষেপ করেছিলেন[8]।

এইভাবে যথার্থ অর্ধাঙ্গিনী রূপে স্বামীর সম্পদে-বিপদে পতিব্রতা মল্লিকা

---

6. উদান, ৫ ১. পৃঃ ৪৭
 তুলনীয় ঃ সংযুক্ত নিকায় (পি টি এস) ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৫
7 ধম্মপদট্ঠকথা, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৮২।
8. মজ্‌ঝিম নিকায়, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২

স্বামীকে সাহায্য করতেন। মল্লিকার কোনো পুত্রসন্তান হয় নি। একটি মাত্র কন্যা সন্তানের জননী ছিলেন রাণী মল্লিকা। তাঁর কন্যাটিরও নাম ছিল মল্লিকা।

কালক্রমে কোশল রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠা রত্নরূপিনী পুণ্যবতী রাণী মল্লিকা স্বামী প্রসেনজিৎ ও কন্যার নিকট বিদায় গ্রহণ করে চিরকালের মত কোশলরাজ্য তথা ইহলোক ত্যাগ করেন।

ক্ষুদ্রোত্তরা (খুজ্জুত্তরা) ঃ

পালি সাহিত্যে ক্ষুদ্র উত্তরাকে[1] গৃহস্থ বৌদ্ধ উপাসিকাগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা 'শ্রুতিধরী' রূপে উল্লেখ করা হয়েছে[2]। অংগুত্তর নিকায় গ্রন্থের ভাষ্য মনোরথ পূরণীতে বলা হয়েছে—ক্ষুদ্রউত্তরা ছিলেন কৌশাম্বী নগরের ঘোষিত শ্রেষ্ঠীর এক ধাত্রীর কন্যা, পরে তিনি কৌশাম্বীরাজ উদয়নের অগ্রমহিষী শ্যামাবতীর ক্রীতদাসী হন।

রাণী শ্যামাবতী পুষ্পমাল্য ক্রয় করার জন্য ক্ষুদ্রউত্তরাকে প্রত্যহ 'আট কার্ষাপণ' (মুদ্রা) দিতেন। কিন্তু ক্ষুদ্রউত্তরা চার কার্ষাপণ মূল্যের পুষ্পমাল্য ক্রয় করে বাকী চার কার্ষাপণ নিজের জন্য সঞ্চয় করে রাখতেন। সুমন নামে এক প্রসিদ্ধ মালাকারের নিকট ক্ষুদ্রউত্তরা প্রতিদিন পুষ্পমাল্য ক্রয় করতেন।

এক সময় বুদ্ধদেব যখন কৌশাম্বী নগরে অবস্থান করছিলেন তখন একদিন তিনি সুমন মালাকারের গৃহে আগমন করেন। সেই দিনও ক্ষুদ্রউত্তরা যথারীতি পুষ্পমাল্য ক্রয় করতে এসে সুমন মালাকারের গৃহে ধর্মোপদেশরত বুদ্ধদেবকে দর্শন করেন এবং বুদ্ধদেব প্রদত্ত ধর্মদেশনা শ্রবণ করে তিনি স্রোতাপন্ন হন। তিনি বুঝলেন, অদত্ত বস্তু গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা উচিত (অদিন্নদানা বে রমনী), অর্থাৎ চুরি করা মহা পাপ।

আধ্যাত্মিক জগতের স্রোতাপন্ন স্তরে উন্নীতা ক্ষুদ্রউত্তরা শ্যামাবতী প্রদত্ত আট কার্ষাপণ মূল্যের পুষ্পমাল্য ক্রয় করে শ্যামাবতীর নিকট উপস্থিত হলেন। দ্বিগুণ পুষ্পমাল্য দেখে শ্যামাবতী এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে ক্ষুদ্রউত্তরা অকপটে সকল বৃত্তান্ত জানালেন এবং বুদ্ধদেব প্রদত্ত ধর্মোপদেশটিও অবিকল ভাবে আবৃত্তি করে শোনালেন। এই ঘটনায় শ্যামাবতী এতই প্রীত হলেন যে, ক্ষুদ্রউত্তরাকে ক্রীতদাসীত্ব থেকে মুক্তিদান করলেন এবং তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করে তাঁর কাছ থেকে ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে উৎসুক হয়ে উঠলেন।

---

1 "As she was hunchbacked at her very birth, she was named Khujjuttara from Kubja Uttara"

Great Women of India, Ed by Swami Madhavananda and R C Majumder, p 269,

2. Buddhist Legends, Burlingame, part-3, pp,, 81-84,

অতঃপর শ্যামাবতীর অনুরোধে ক্ষুদ্রউত্তরা নিয়মিত বুদ্ধদেব প্রদত্ত ধর্মোপদেশ শ্রবণ করে এসে শ্যামাবতীর নিকট তা হুবহু আবৃত্তি করতেন। ক্রমে ক্ষুদ্রউত্তরা শ্যামাবতীর নিকট মাতৃস্বরূপা হয়ে উঠলেন। ধর্মোপদেশ শ্রবণ কালে শ্যামাবতী ক্ষুদ্রউত্তরাকে উচ্চাসনে বসাতেন এবং স্বয়ং নিম্নাসনে উপবিষ্ট হতেন। শ্যামাবতীর সকল সহচরী সেই স্থানে উপস্থিত থেকে ক্ষুদ্রউত্তরার মুখে ধর্মোপদেশ শ্রবণ করতেন। এই ভাবে শ্রবণ করে ক্ষুদ্রউত্তরা সমগ্র ত্রিপিটক সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। শ্রবণ করার পর ক্ষুদ্রউত্তরা যে সমস্ত ধর্মোপদেশ আবৃত্তি করেছিলেন, কালক্রমে সেগুলি সংকলন করা হয়। পালিসাহিত্যে উক্ত সংকলনটি 'ইতিবৃত্তক'[3] নামে সন্নিবিষ্ট আছে।

দাসীত্ব থেকে মুক্তিলাভ করলেও ক্ষুদ্রউত্তরা ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করেন নি। গৃহবাসিনী এই সাধিকা আপন সাধন বলে ত্রিবিদ্যার অন্যতম বিদ্যা জাতিস্মরতা অর্জন করেছিলেন[4], এবং প্রতিসম্ভিদা[5] প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

কালক্রমে ক্ষুদ্রউত্তরা মহাবিদুষী হয়ে ওঠেন। বুদ্ধদেব গৃহস্থ উপাসিকাদের মধ্যে ক্ষুদ্রউত্তরাকে সর্বশ্রেষ্ঠা বিদুষী নারী রূপে প্রশংসা করেছেন[6]।

উত্তরা নন্দমাতা ঃ

পালিসাহিত্যে রাজগৃহনগরের বৌদ্ধ উপাসক পূর্ণসিংহের (পুন্নসীহ) কন্যা উত্তরাকে 'উত্তরানন্দমাতা' নামে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়—উত্তরা-পুত্র নন্দের কোনো উল্লেখ পালিসাহিত্যে পাওয়া যায় না। পিতা পূর্ণসিংহের ন্যায় কন্যা উত্তরাও ছিলেন বৌদ্ধধর্মে পরম শ্রদ্ধাবতী[1]। বালিকা বয়সেই তিনি বুদ্ধদেবের ধর্মোপদেশ শ্রবণ করে স্রোতাপন্ন হন। প্রতিদিন তিনি কিছু না কিছু দান করতেন এবং নিষ্ঠাসহকারে উপোসথব্রত পালন করতেন[2]।

---

3 বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম, ডঃ শ্রী অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১০৭

4 ধম্মপদট্ঠকথা, (পি টি এস) ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৮

5 প্রতিসম্ভিদা (পালি পটিসম্ভিদা) – প্রতি-সম্ + ভিদ্ ধাতু নিষ্পন্ন শব্দ অর্থাৎ লোকোত্তর মার্গাদি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি।

প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান চার প্রকার যথা ঃ—

অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি ও প্রতিজ্ঞান প্রতিসম্ভিদা।

মিলিন্দ প্রশ্ন (বংগানুবাদ), ধর্মাধার মহাস্থবির, পৃঃ ৪১৫

6 " বহুস্সুতানং যদিদং খুজ্জুত্তরা।"

অংগুত্তর নিকায় (পি টি এস), ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬

1 অংগুত্তর নিকায়ের ভাষ্য মনোরথপূরণী (এস এই বি), ২, পৃঃ ৭১১।

2 বুদ্ধবংশ (পি টি. এস), ২৬, পৃঃ ২০।

উত্তরা যৌবনে পদার্পণ করলে তাঁর বিবাহের জন্য পূর্ণসিংহ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন এবং উত্তরার উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করতে লাগলেন। এই সময়ে রাজগৃহের সুমন শ্রেষ্ঠী তাঁর পুত্রের সহিত উত্তরার বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন জনৈক ব্যক্তির মাধ্যমে। কিন্তু যেহেতু সুমন শ্রেষ্ঠী বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন না সেই হেতু পূর্ণসিংহ উক্ত বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলে পাঠালেন যে, তাঁর কন্যা উত্তরা প্রতিদিন বুদ্ধদেবের উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। পূর্ণসিংহ পরোক্ষভাবে বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেও উত্তরাকে পুত্রবধূরূপে পাবার জন্য অভিলাষী সুমন শ্রেষ্ঠী এতেও কিন্তু নিবৃত্ত হলেন না, পুনরায় বলে পাঠালেন যে, উত্তরার প্রতিদিনের বুদ্ধপূজার ব্যবস্থা উত্তরার বিবাহোত্তর জীবনেও কার্যকরী থাকবে। সুমন শ্রেষ্ঠী কর্তৃক এই আশ্বাস দেওয়ার ফলে সুমন শ্রেষ্ঠীর পুত্রের সঙ্গে উত্তরার বিবাহ সম্পন্ন হল।

কিন্তু বিবাহের পর উত্তরা লক্ষ্য করলেন, তাঁর উপোসথ ব্রত পালনের প্রতি তাঁর স্বামী কোনো আগ্রহই প্রকাশ করেন না। স্বামীর এ বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য কয়েকবার চেষ্টা করেও যখন উত্তরা ব্যর্থ মনোরথা হলেন তখন সুষ্ঠুভাবে উপোসথ ব্রত পালনের জন্য এমন এক অভিনব উপায় অবলম্বন করলেন যে উপায় একমাত্র তাঁর মত অসক্তিহীনা প্রেমিকা নারীর পক্ষেই গ্রহণ করা সম্ভব। সেই উপায়টি হল—উত্তরার বিবাহের সময় পূর্ণসিংহ যৌতুকস্বরূপ পনের হাজার কার্ষাপণ উত্তরাকে দিয়েছিলেন। উত্তরা সেই অর্থের বিনিময়ে পনের দিনের জন্য সিরিমা নামে একটি বারবনিতাকে স্বামীর নর্মসঙ্গিনী রূপে নিযুক্ত করেন এবং স্বামীর অনুমতি নিয়ে স্বয়ং উপোসথ ব্রত পালনের জন্য ব্রতী হন। এই পক্ষকাল উত্তরা ব্রহ্মচর্য সহকারে উপোসথ ব্রত পালনে অনন্যমনা হয়ে রইলেন। উপোসথ ব্রত পালনের শেষ দিনে উত্তরা যখন বুদ্ধদেবের জন্য আহার্য প্রস্তুত করতে ব্যস্ত ছিলেন, তখন সিরিমা সহ ভ্রমনরত উত্তরার স্বামী ঘর্মাক্ত কলেবরে উত্তরাকে পরিশ্রম করতে দেখে—'উত্তরা সম্পদসুখ ভোগ না করে অনর্থক কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনে অযথা সময় ব্যয় করেছেন'—এই চিন্তা মনে উদিত হওয়ায় তাঁর ওষ্ঠাধর ঈষৎ স্ফুরিত হল। উত্তরাও ঠিক সেই সময়েই মৃদু হাস্য করলেন এই ভেবে যে, তাঁর স্বামী এই অতুলসম্পদের এই ভাবে অপব্যবহার করছেন। সিরিমা কিন্তু এই ঘটনার অন্য অর্থ করলেন—ভাবলেন তাঁর উপস্থিতিকে অবজ্ঞা করে স্বামী-স্ত্রী মধুর হাস্য বিনিময় করলেন।

ক্রোধে দিগ্‌বিদিক্‌ জ্ঞান শূন্যা সিরিমা তখন উত্তপ্ত তৈলপূর্ণ একটি পাত্র উত্তরাকে লক্ষ্য করে সজোরে নিক্ষেপ করলেন। লক্ষ্য ভ্রষ্ট হল।

উত্তরা কিন্তু সিরিমার এই জঘন্য ব্যবহারে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হলেন না, উপরন্তু সিরিমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করলেন। উত্তরার এইরকম শান্ত ব্যবহারে অভিভূতা সিরিমা উত্তরার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

অতঃপর উত্তরা সিরিমাকে সঙ্গে নিয়ে বুদ্ধদেবের সমীপে উপস্থিত হলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করে সিরিমার জন্য বুদ্ধদেবের ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। বুদ্ধদেব উত্তরার ধীর শান্ত ও সৌজন্যপূর্ণ আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন—এই ভাবেই অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করতে হয়[3]।

অনুতপ্তা সিরিমাকে করুণাময় বুদ্ধদেব ক্ষমা করলেন এবং তাঁকে কিছু ধর্মোপদেশ দিলেন। বুদ্ধদেবের ধর্মদেশনা শ্রবণ করে সিরিমা স্রোতাপন্ন হলেন।

পালিসাহিত্যে নিষ্ঠাসহকারে উপোসথব্রত পালন কারিনী বৌদ্ধ উপাসিকাদের মধ্যে উত্তরাকে অগ্রগণ্যা বলা হয়েছে। একনিষ্ঠ সাধনায় ধ্যান অভ্যাস করে উত্তরা আধ্যাত্মিক জগতের সকৃদাগামী (সকদাগামী) স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন।

স্বয়ং বুদ্ধদেব উত্তরার ধ্যাননিষ্ঠতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছেন—ধ্যানীগণের মধ্যে উত্তরানন্দমাতার নাম উল্লেখযোগ্য[4]।

সুপ্রিয়া (সুপ্পিয়া):

বারাণসী নগরে সুপ্রিয় নামে জনৈক গৃহস্থ ও তাঁর পত্নী সুপ্রিয়া বাস করতেন[1]। বৌদ্ধসংঘে দান করে ও ভিক্ষুদের সেবা করে তাঁরা হৃদয়ে অপার আনন্দ লাভ করতেন।

বৌদ্ধ উপাসিকা সুপ্রিয়া ভিক্ষুদের স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে দৃষ্টি রাখতেন। গৃহস্থগণের পক্ষে বৌদ্ধবিহারগুলি পরিদর্শনের কোনো বাধা-নিষেধ ছিল না। সুপ্রিয়া বারাণসীর ঋষিপতনের[2] (ইসিপতন) আরামে প্রত্যহ যেতেন, এবং ভিক্ষুদের সংবাদ নিতেন। বিহারের প্রতিটি কক্ষের দ্বারদেশে উপস্থিত হয়ে সুপ্রিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন—"ভন্তে, আপনাদের মধ্যে কে অসুস্থ আছেন? কার কি খাদ্যের প্রয়োজন?" (কো ভন্তে, গিলানো কস্স কিং আহরিয়তু তি)

---

3 ধম্মপদ, কোধবগ্গো, গাথাসংখ্যা ৩
দ্রষ্টব্য:
Buddhist Legends, Burlingame, part-3, p 103

4 "...ঝায়িনং যদিদং উত্তরানন্দমাতা।"
অংগুত্তর নিকায়, ১. (পি টি. এস) পৃঃ ২৬

1 মনোরথপূরণী, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪৫৩-৪৫৫

2 ললিতবিস্তর গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এই স্থানে পরিনির্বাপিত পাঁচশত প্রত্যেক বুদ্ধের (পচ্চেকবুদ্ধ) বা ঋষির পূতদেহ পতিত হয়েছিল, সেই কারণে এই স্থানের নাম ঋষিপতন (ইসিপতন) হয়।

এইভাবে একদিন যখন সুপ্রিয়া উপাসিকা ভিক্ষুদের সংবাদ নিচ্ছিলেন, সেই সময় একজন ভিক্ষু তাঁকে জানান যে, তিনি বিরেচক গ্রহণ করেছেন, সুপ্রিয়া যেন তাঁর ভোজনোপযোগী কোনো মাংস রন্ধন করে দেন। সুপ্রিয়া ভিক্ষুটির অভিলষিত মাংস রন্ধন করে দিতে স্বীকৃতা হন এবং গৃহে প্রত্যাবর্তন করে একজন গৃহসেবিকাকে মাংস ক্রয় করে আনতে আদেশ করেন। কিন্তু ভিক্ষুদের পক্ষে ভোজনের উপযুক্ত মাংস সংগ্রহ করতে না পেরে গৃহসেবিকাটি ফিরে এল। তখন সুপ্রিয়া নিজ উরুদেশ থেকে মাংস কর্তন করে সেই মাংস রন্ধন করলেন এবং উক্ত ভিক্ষুটির আহারের জন্য সেই মাংস প্রেরণ করলেন।

উপাসক সুপ্রিয় তাঁর পত্নী সুপ্রিয়ার ভিক্ষুসংঘের প্রতি এই অপূর্ব নিষ্ঠা দেখে বিস্মিত হলেন। এরপর একদিন সুপ্রিয় বুদ্ধদেবকে তাঁদের গৃহে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। নির্দিষ্ট দিবসে বুদ্ধদেব সুপ্রিয়দের গৃহে উপস্থিত হলে সুপ্রিয় তাঁকে পরিতোষপূর্বক ভোজন করান। ভোজনাবসানে বুদ্ধদেব সুপ্রিয়ার কথা জিজ্ঞাসা করায় জানতে পারলেন যে, সুপ্রিয়া অত্যন্ত অসুস্থা, তিনি শয্যাগতা হয়ে আছেন। বুদ্ধদেবের আদেশে সুপ্রিয় বহু আয়াসে সুপ্রিয়াকে বহন করে বুদ্ধদেবের সামনে উপস্থাপন করলেন।

বুদ্ধদেব সুপ্রিয়াকে আশীর্বাদ করলেন। তাঁর মঙ্গলময় দৃষ্টিপাতে সুপ্রিয়া সুস্থ হয়ে উঠলেন[3]।

পালিসাহিত্যে সুপ্রিয়া পরোপকারিণীর পরাকাষ্ঠারূপে চিহ্নিত হয়ে আছেন।

বুদ্ধদেব শুশ্রূষাকারিণী উপাসিকাগণের মধ্যে সুপ্রিয়াকে সর্বশ্রেষ্ঠারূপে স্বীকৃতি জানিয়েছেন[4]।

---

3 মহাবগ্গো, ৬ ৯ ২১, নালন্দা সংস্করণ

উল্লেখ্য ঃ

সুপ্রিয়া উপাসিকার উপরোক্ত ঘটনার পর বুদ্ধদেব মনুষ্য মাংস ভোজন নিষেধাত্মকরূপে নিয়ম প্রবর্তন করেন।

4 " ... গিলানুপট্ঠাকীনং যদিদং সুপ্পিয়া উপাসিকা।"

অংগুত্তর নিকায়, (পি টি এস) প্রথম খণ্ড পৃঃ ২৬

কালী ঃ

জনশ্রুতির মাধ্যমে বৌদ্ধধর্মে শ্রদ্ধাবতী উপাসিকাগণের মধ্যে অবন্তী[1] রাজ্যের কুররঘরিকা কালী সর্বশ্রেষ্ঠারূপে পালিসাহিত্যে বন্দিতা হয়েছেন[2]।

একদা কালী যখন পতিগৃহ থেকে রাজগৃহে পিত্রালয়ে যান সেই সময় একদিন যখন তিনি পিত্রালয়ের অলিন্দে বসে সান্ধ্যকালীন শীতল সমীরণ উপভোগ করছিলেন, তখন সাতগীর ও হিমবত নামে দুজন যক্ষের কথোপকথন শুনতে পান। উক্ত দুই যক্ষ বুদ্ধদেব এবং বৌদ্ধধর্মের মহিমা কীর্তন করছিলেন। সেই মহিমা-কীর্তন শ্রবণ করে কালী স্রোতাপন্ন হন। বৌদ্ধগৃহস্থ উপাসিকাগণের মধ্যে কালীই সর্বপ্রথম স্রোতাপন্ন প্রাপ্তা হয়েছিলেন[3]।

সেই রাত্রেই কালী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। কালীর পুত্রের নাম সোণ রাখা হল। কালী পুত্রসহ পতিগৃহে ফিরে গেলেন। কালক্রমে কালীর পুত্র সোণ ভিক্ষু কাত্যায়নের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করেন। বারাণসীতে সোণ বুদ্ধদেবকে প্রথম দর্শন করেন। পরে সোণ যখন অবন্তী রাজ্যে ফিরে এলেন, তখন কালী তাঁকে অনুরোধ করলেন যে, বুদ্ধদেব যে ভাবে ধর্মোপদেশ দান করেন সেই ভাবে সোণ যেন ধর্মোপদেশ দেন। পুত্রের মুখে ধর্মদেশনা শ্রবণ করে কালী পরম প্রীতা হলেন।

কালী উপাসিকা একদিন মহাকাত্যায়নের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং সংযুক্তনিকায়ের অন্তর্গত কুমারি প্রশ্ন (কুমারি পঞ্হ) থেকে একটি স্তবক বা শ্লোক ব্যাখ্যা করে শোনাবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন। মহাকাত্যায়নের সঙ্গে কালীর কথোপকথন 'কালীসুত্ত' নামে পালিসাহিত্যে লিপিবদ্ধ আছে।

এক সময় কালীর পুত্র সোণ (বা সোনকটিকন্ন) কুররঘরে যখন ধর্মদেশনা করছিলেন, তখন কালী সেই ধর্মোপদেশ শ্রবণ করতে যেতেন। যদিও কালীর বাসগৃহটি খুবই সুরক্ষিত ছিল এবং কয়েকটি সারমেয় গৃহটির প্রহরায় রাত্রিকালে নিযুক্ত থাকত, তথাপি একদিন রাত্রে কালী যখন ধর্মোপদেশ শ্রবণ করতে গেছেন,

---

1 বুদ্ধদেবের সময়ে অবন্তী রাজ্য বর্তমান কালের মালোবা নিমার ও মধ্যভারতের সংলগ্ন এলাকা নিয়ে গঠিত ছিল। সম্ভবতঃ প্রাচীনকালে অবন্তী দুভাগে বিভক্ত ছিল—উত্তর ভাগের রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী (উজ্জেনী) এবং দক্ষিণ ভাগের রাজধানী ছিল মাহিষ্মতী।

বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম, ডঃ শ্রী অনুকূল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৩

2 অংগুত্তর নিকায়, ১ ২৬ নালন্দা সংস্করণ

3. "সব্ব মাতুগামনং অন্তরে পঠমকসোতপন্না সব্বজেট্ঠিকা,"

মনোরথপূরণী ১, পৃঃ ১৩৩

এবং বাড়ীতে একটি ক্রীতদাসী ছাড়া দ্বিতীয় মানুষও কেউ ছিল না, সেই সুযোগে নবশত চোর ধনবতী কালীর গৃহে চুরির উদ্দেশে আসে। উক্ত নবশত চোরের মধ্যে একদল চোর কালীর প্রতি লক্ষ্য রাখছিল এবং বাকীরা কালীর গৃহে প্রবেশের চেষ্টা করতে লাগল। এমতাবস্থায় কালীর ক্রীতদাসীটি কালীর নিকট উপস্থিত হয়ে চোরদের আগমন বার্তা কালীকে জানাল, কিন্তু কালী উপাসিকা দাসীর কথায় কর্ণপাত না করে নিবিষ্ট চিত্তে ধর্মোপদেশ শ্রবণ করতে লাগলেন।

ইতোমধ্যে চোরদের যে দলটি কালীর গৃহে প্রবেশের চেষ্টা করছিল তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় যে স্থানে কালী ধর্মোপদেশ শ্রবণ করছিলেন সেই স্থানে তারা এসে উপস্থিত হল।

চোরদের দলপতি তন্ময়চিত্তে ধর্মোপদেশ শ্রবণরতা কালী উপাসিকাকে দেখে শ্রদ্ধায় আর ভক্তিতে আপ্লুত হল এবং সে ও তার সঙ্গী সকল চোর আগ্রহের সঙ্গে ধর্মকথা শ্রবণ করতে লাগল।

ভিক্ষু সোণের ধর্মদেশনা সমাপ্ত হলে চোরদের দলপতি কালীর নিকট নিজ অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করল। অতঃপর ভিক্ষু সোণকোটিকর্ণ উক্ত নবশত চোরকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দান করেছিলেন[4]।

শ্যামাবতী (সামাবতী) :

ভদ্রীয় নগরের এক শ্রেষ্ঠীর গৃহে শ্যামাবতীর জন্ম হয়[1]। শ্যামাবতীর জন্মের কয়েক বৎসর পর দেশে এমন দুর্ভিক্ষ হল যে, শ্যামাবতীর পিতা শ্যামাবতী ও তার মাতাকে নিয়ে দেশত্যাগী হতে বাধ্য হলেন।

শ্যামাবতীর পিতা স্ত্রী-কন্যাসহ কৌশাম্বী নগরে উপস্থিত হলেন এবং একটি ক্ষুদ্র কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। কৌশাম্বী নগরে ঘোষিত শ্রেষ্ঠী নামে শ্যামাবতীর পিতার এক বন্ধু ছিলেন। তিনি দরিদ্রকে অন্নদান মানসে একটি অন্নসত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রতিদিন বহু দরিদ্র নর-নারীকে সেই অন্নসত্র থেকে অন্নদান করা হত। সহায় সম্পদহীন শ্যামাবতীর পিতা বন্ধু ঘোষিতের সঙ্গে লজ্জাবশতঃ সাক্ষাৎ করতে পারলেন না বা বন্ধুর প্রতিষ্ঠিত অন্নসত্রে অন্নপ্রার্থী হয়ে যেতেও পারলেন না, কিন্তু শ্যামবতীকে সেই অন্নসত্রে প্রেরণ করলেন।

---

4 ধম্মপদট্ঠকথা, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১০৩

1 Manorathapurani (Max Welleser) Vol 1, pp , 453-454

C f Great Women of India, Ed by Swami Madhavanand and R C. Majumder p 267.

অন্নসত্রের সম্মুখে অসংখ্য অন্নপ্রার্থী দেখে শ্যামাবতী শান্তভাবে একপাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। শ্যামাবতীর শান্ত ভদ্র আচরণ দেখে অন্নসত্র পরিচালকের দৃষ্টি শ্যামাবতীর প্রতি আকৃষ্ট হল। পরে তিনি আরও লক্ষ্য করলেন যে, সুশীলা কন্যাটি প্রথম দিন তিনজনের মত, দ্বিতীয় দিন দুজনের মত এবং তৃতীয় দিন একজনের মত খাদ্য প্রার্থনা করল। এতে কৌতূহলী হয়ে উক্ত পরিচালকটি শ্যামাবতীকে প্রশ্ন করে জ্ঞাত হলেন যে, প্রথমদিন শ্যামাবতী তাঁর পিতা-মাতা ও নিজের জন্য খাদ্য প্রার্থনা করেছিলেন, কিন্তু সেই রাত্রেই তাঁর পিতার মৃত্যু হওয়ায় দ্বিতীয় দিন দুজনের মত খাদ্য প্রার্থনা করেছিলেন। গতরাত্রে তাঁর মাতার মৃত্যু হওয়ায় তৃতীয় দিনে কেবলমাত্র নিজের জন্য খাদ্য প্রার্থনা করেছেন। প্রশ্নকারীর সন্দেহ নিরসনের জন্য শ্যামাবতী আদ্যন্ত সকল বৃত্তান্ত তাঁকে জানালেন। দয়ালু ভদ্রলোক তখন শ্যামাবতীকে কন্যারূপে নিজগৃহে আশ্রয় দিলেন।

অন্নসত্রে প্রার্থীর সংখ্যাধিক্য বশতঃ প্রার্থীরা এতবেশী কোলাহল করত যে, অন্নদান কর্মটি সমাধা করতে অযথা সময় ব্যয় হত। তখন শ্যামাবতীর পরামর্শ অনুসারে স্থির হল যে, অন্নপ্রার্থীরা একটি নির্দিষ্ট পথ দিয়ে একে একে আসবে এবং অন্ন নিয়ে অপর একটি নির্দিষ্ট পথে নির্গমন করবে। এই ব্যবস্থায় অন্নদান কর্মটি সুচারুরূপে হতে লাগল।

একদিন ঘোষিত শ্রেষ্ঠী অন্নসত্র পরিদর্শন করতে এসে অন্নসত্রে উক্তরূপ ব্যবস্থা দেখে বিস্মিত হন এবং পরিচালকটির নিকট সকল কথা জানতে পারেন। তিনি শ্যামাবতীর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে চমৎকৃত হন এবং শ্যামাবতীকে প্রশ্ন করে যখন জানতে পারলেন যে, শ্যামাবতী তাঁরই এক বন্ধুর কন্যা তখন তিনি শ্যামাবতীকে নিজের গৃহে নিয়ে গেলেন। অতঃপর শ্যামাবতী ঘোষিত শ্রেষ্ঠীর কন্যারূপে স্নেহ যত্নে তাঁর গৃহে বাস করতে থাকেন।

একদিন যখন শ্যামাবতী স্নানার্থে জলাশয়ের দিকে যাচ্ছিলেন তখন কৌশাম্বীরাজ উদয়ন রূপলাবণ্যবতী শ্যামাবতীকে দেখে মুগ্ধ হন এবং ঘোষিত শ্রেষ্ঠীর নিকট শ্যামাবতীকে বিবাহ করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু ঘোষিতশ্রেষ্ঠী এই বিবাহ প্রস্তাবে আপত্তি জানিয়ে বললেন যে তাঁদের মত গৃহস্থদের পক্ষে রাজকুলে কন্যাদান করা কর্তব্য নয়, কারণ সেখানে কন্যা নির্যাতিতা ও নিপীড়িতা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ঘোষিত শ্রেষ্ঠীর এই প্রত্যাখ্যানে রুষ্ট হয়ে রাজা উদয়ন রাজশক্তি বলে ঘোষিত শ্রেষ্ঠীকে তাঁর গৃহ থেকে বহিষ্কার করে গৃহটি অবরুদ্ধ করেন। তখন শ্যামাবতী তাঁর পালক পিতাকে পরামর্শ দিলেন যে, তিনি যেন রাজা উদয়নকে একথা বলেন— শ্যামাবতীর সঙ্গে উদয়নের বিবাহ দিতে ঘোষিত শ্রেষ্ঠীর কোন আপত্তি থাকবে না যদি উদয়ন শ্যামাবতীর পাঁচশত সহচরীর ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণের শর্ত স্বীকার

করেন। উদয়ন এই শর্তে স্বীকৃত হলেন এবং শ্যামাবতীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ[3] হল। শ্যামাবতী-উদয়নের প্রধানা মহিষীর পদে প্রতিষ্ঠিতা হলেন[1]।

কিছুকাল পরে উদয়ন মাগন্দিয়া নামে আর একটি সুন্দরী তরুণীকে বিবাহ করেন। মাগন্দিয়া বুদ্ধদেবের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করতেন কারণ একসময় চুলমাগন্ধিয়ার পিতামাতা মাগন্দিয়াকে বিবাহ করার জন্য বুদ্ধদেবকে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু বুদ্ধদেব সে অনুরোধ রক্ষা করতে সম্মত হন নি[4]। এই ঘটনার আত্মাভিমানে আঘাত লাগায় মাগন্দিয়া বুদ্ধদেবের প্রতি অসূয়া পরায়ণা ছিলেন। সেই সময় বুদ্ধদেব যখন কৌশাম্বী নগরে আগমন করেন তখন ঘোষিত শ্রেষ্ঠী কর্তৃক যোগ্য সম্মান সহ সম্বর্ধিত হন। ঘোষিত শ্রেষ্ঠী তাঁর যে আরাম বুদ্ধ প্রমুখ বৌদ্ধসংঘে দান করেন, পালিসাহিত্যে তা ঘোষিতারাম নামে পরিচিত। বুদ্ধদেব কৌশাম্বী নগরে থাকাকালীন ঈর্ষান্বিতা মাগন্দিয়া কটুবচন দ্বারা বুদ্ধদেবকে অপদস্থ করার উদ্দেশে দুর্জন দুর্বৃত্তকে নিযুক্ত করেন কিন্তু তারা বিফল হয়[5]।

ক্ষুদ্রউত্তরা[6] (খুজ্জুত্তরা) নামে শ্যামাবতীর এক ক্রীতদাসী সুমন নামে এক মালাকারের নিকট থেকে শ্যামাবতীর জন্য পুষ্পমাল্য ক্রয় করত। সে একদিন সুমনের গৃহে বুদ্ধদেশিত ধর্মোপদেশ শ্রবণে স্রোতাপন্ন হয়। বুদ্ধবাণীও সে অবিকল ভাবে স্মরণে রাখতে পারত। একদিন শ্যামাবতীর অনুরোধে সে বুদ্ধবচন অবিকল ভাবে আবৃত্তি করে। ক্ষুদ্রউত্তরার মুখে সেই আবৃত্তি শ্রবণ করে শ্যামাবতী বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবতী হন।

এরপর প্রতিদিন ক্ষুদ্রউত্তরা বুদ্ধদেবের ধর্মদেশনা যেমন ভাবে শুনে আসত শ্যামাবতীর নিকট অবিকল সেই ভাবেই আবৃত্তি করত। এইভাবে বুদ্ধদেবের ধর্মদেশনা শ্রবণ করতে করতে শ্যামাবতীর হৃদয়ে বুদ্ধদেবকে দর্শন করার অভিলাষ জাগ্রত হয়ে উঠল, কিন্তু উদয়ন তখন বুদ্ধদেবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না; সুতরাং স্বামীর নিকট শ্যামাবতী বুদ্ধদর্শনের অভিলাষ ব্যক্ত করতে পারলেন না।

ক্ষুদ্র উত্তরার পরামর্শে তখন রাজপথে চলমান বুদ্ধদেবকে গবাক্ষের ছিদ্রপথে চক্ষুস্থাপন করে দর্শন করতেন। মাগন্দিয়া শ্যামাবতীর এই আচরণ লক্ষ্য করে বৌদ্ধধর্মে শ্রদ্ধাশীলা শ্যামাবতীর ক্ষতি সাধনে তৎপর হলেন।

শ্যামাবতী যে পরপুরুষ বুদ্ধদেবের প্রতি অনুরক্তা সে কথা উদয়নকে জানিয়ে প্রমাণ স্বরূপ গোপনে উদয়নকে শ্যামাবতীর বুদ্ধদেব দর্শনের পূর্বোক্ত আচরণ

2 Buddhist Legends, Burlingame, part 1, p 276,
3 Jataka Book, E B Cowell, Vol-III, p 244
4 Buddhist Legends, Burlingame, part 1, p 276
5 Ibid, p 199
6 Buddhist Legends Burlingame, part 3, pp 81-84

লক্ষ্য করালেন এবং আরও নানা প্রকার মিথ্যার সাহায্যে শ্যামাবতীর অসতীত্ব প্রমাণ করালেন।

'শ্যামাবতী বিশ্বাসঘাতিকা', 'অসতী' এই চিন্তায় ক্ষিপ্ত হয়ে উদয়ন সহচরীবৃন্দ সহ শ্যামাবতীকে হত্যা করার সংকল্পে ধনুর্বাণ হস্তে প্রস্তুত হলেন। অবিচলিতা শ্যামাবতী মৈত্রীভাবনা চিত্তে শান্তভাবে উদয়নের রুদ্রমূর্তির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দণ্ডায়মানা হয়ে রইলেন। কি এক আশ্চর্য শক্তি প্রভাবে শ্যামাবতীর প্রতি শরনিক্ষেপ তো দূরের কথা, উদয়ন ধনুটি পর্যন্ত উপযুক্ত ভাবে ধারণ করতে বা হস্ত থেকে মুক্ত করতেও অসমর্থ হলেন।

নিজের শক্তিহীনতায় হতবুদ্ধি উদয়ন কি করবেন স্থির করতে পারলেন না। স্বামীর অবস্থা দেখে শ্যামাবতী অত্যন্ত বিচলিত হলেন এবং শুভ ইচ্ছাশক্তির (Power of Goodwill) প্রয়োগ দ্বারা উদয়নকে তাঁর পূর্বোক্ত অবস্থা থেকে মুক্ত করলেন[7]।

কৌশাম্বীরাজ উদয়ন তখন শ্যামাবতীর সম্বন্ধে নিজের ভ্রান্ত ধারণার জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলেন এবং শ্যামাবতীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। শ্যামাবতীর প্রেরণায় উদয়ন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। মৈত্রী ভাবনাকারিণী বৌদ্ধ গৃহস্থ উপাসিকাগণের মধ্যে শ্যামাবতী সর্বশ্রেষ্ঠারূপে বুদ্ধদেব কর্তৃক স্বীকৃতা হয়েছেন[8]।

---

7 Dhammapada Commentary, on verse 21-23

8 Anguttara Nikaya, Vol 1, P T S , p 26

গ্রন্থপঞ্জী

প্রবোধচন্দ্র বাগচী

বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য

বিধুশেখর ভট্টাচার্য

ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ ও ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষ (মূলসহ বঙ্গানুবাদ)

ভিক্ষু শীলভদ্র

(১) থেরীগাথা (বঙ্গানুবাদ)

(২) দীঘ নিকায়, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড (বঙ্গানুবাদ)

ধর্মাধার মহাস্থবির

(১) বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন

(২) মিলিন্দ প্রশ্ন (বঙ্গানুবাদ)

ধর্মরত্ন মহাস্থবির

মহাপরিনিব্বান সুত্তং (মূলসহ বঙ্গানুবাদ)

শীলালংকার মহাস্থবির

ধম্মপদট্ঠকথা, প্রথম খণ্ড (মূলসহ বঙ্গানুবাদ)

ডঃ বিমলাচরণ লাহা

বৌদ্ধ রমণী

প্রবোধচন্দ্র সেন

ধর্মপদ পরিচয়

ক্ষিতিমোহন সেন

প্রাচীন ভারতে নারী

সাধনকুমার ভট্টাচার্য

সাহিত্য তত্ত্ব

স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত

উপনিষৎ গ্রন্থাবলী, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়ভাগ (মূলসহ বঙ্গানুবাদ)

E R Mary Martin—

Women in Ancient India

N K Dutta—

Widow in Ancient India

(Dr A C Woolner Commemorative Volume)

K M Kapadia—
Marriage and Family in India

Y. B. Mathur—
Women's Education in India.

P. Thomas—
Indian Women through the Ages.

Ed. by Nilkantha Sastri—
A Comprehensive History of India.

C. A. P Rhys Davids—
1 The Psalms of the Brethren
2. The Psalms of the Sisters
3 The Book of Kindred Sayings

W. Stede—
Sumangala Vitasini (P T. S.)
Udana (English Translation of Udana), P. T S.

Edward J Thomas—
The Life of Buddha

E Westermarek—
History of Human Marriage

J S. Speyer—
Avadana Satakam, Vols. I—II

K. S. Hazra—
Royal Patronage of Buddhism, 1384

V. M Smith—
Oxford History of India

H. Warren—
Buddhism in Translation

Hemchandra Roy Chowdhury—
Political History of Ancient India.

I. B. Horner—
Women under Primitive Buddhism.

Dr Beni Madhab Barua—
1 Asoka and his Inscription, parts I & II
2 History of pre-Buddhistic Indian philosophy

B. C Law—
1 The Buddhist Conception of Spirits

2 India as depicted in Early Texts of
Jainism and Buddhism
3 A Manual of Buddhist Historical Tradition

A S Altekar—
1 The Position of Women in Hindu Civilization
2 Education in Ancient India

Y B Mathur—
1 Women's Education in India

A L Basham—
1 The Wonder that was India

B W Burlingame—
1 Buddhist Legends (three parts)

J J Meyer—
1 Sexual Life in Ancient India

Dr Nalinaksa Dutta—
1 Early Monastic Buddhism—Vol I

Sukumar Dutta—
1 Early Buddhist Monaciam

Radhakumud Mookherjee—
1 Asoka
2 Ancient Indian Education

Ed by R C Majumder—
1 Vedic Age
2 The Age of Imperial Unity

Ed by Madhavananda Swami & R C Majumder—
1. Great Women of India

R C Majumder—
1 Corporate Life in Ancient India

Max Walleser—
Monorathapurani, Vols I, III & IV

Miss Durga N Bhagvat—
Early Buddhist Jurisprudence

N K Bhagvat—
1 Nidanakatha
2 Theragatha

Paul Caraus—
The Gospel of the Buddha

E. Conze—
Buddhism

H Oldenberg—
1. Vinaya Pitakam, Vols. I—V
2. Buddha . His Life, His Doctrine, His Order.

Gokul De—
Significance of Jataka

Ed by V Fousboll—
The Jataka, Vols I—VII

E B Cowell—
1. Jataka Book, Vols I—VI
2 Divyavadana

Bhikshu Dharmarkshita—
Jataka Atthkatha

Ed by H C Norman—
Dhammapadatthakatha, Vols I—V P T. S.

Ed by H Smith—
Khuddakapathatthakatha

Ed by W, Giger—
Mahavamsa

Ed by, B C Law—
Dipavamsa

Mary E Lilley—
Theri Apadana (P T S)

P Maxmuller—
The Secred Books of the East, Vols. XVIII & XX

Ratilal N Mehta—
Pre-Buddhist India

T. W Rhys Davids—
Buddhist India

E Hardy—
Anguttara Nikaya, Vols III—V P T. S

M Leon Feer—
Samyutta Nikaya, Vols I, II, IV (P. T S.)

Meena Talim—
Women in Early Buddhist Literature, 1972

D K Barua—
(1) An Analytical Study of the Four Nikays, 1971
(2) Viharas in Ancient India, 1969

K L Hazra—
Buddhism in India as described by the Chinese Pilgrims, 1983

S Chaudhuri—
Contemporary Buddhism in Bangladesh, 1982

B N Chaudhury—
Buddhist Centres in Ancient India, 1973

S C Sarkar—
A Study on the Jatakas and Avadanas, 1981

G De—
Democracy in Early Buddhist Sangha, (C U,)

B C Law—
History of Pali Literature, Vols I & II

Rabindra Nath Basu—
A Critical Study of the Milindapanha, 1978

Gayatri Sen Majumdar—
Buddhism in Ancient Bengal, 1983

Kshanika Saha—
Buddhism and Buddhist Literature in Central Asia, 1970

I B Horner—
Milinda's Questions, Vols I & II, London, 1964

R K Tripathi—
Social and Religious Aspects in Bengal Inscriptions, Calcutta, 1987.

M Winternitz—
A History of Indian Literature, Vols I & II (C U,)

G S P Misra—
The Age of Vinaya

Richard Fick—
The Social Organization in North-east India in Buddha'stime, C U 1920

N Dutta—
Gilgit Manuscripts, Vol III Part 2, 1942

P L Vaidya (Editor)—
Lalita-Vistara (Mithila Institute), 1958

B C Law—
Some Jaina Canonical Sutras, 1949

মহাস্থবির প্রজ্ঞালোক ও ভিক্ষু অনোমদর্শী—
ধম্মপদং, ১৯৫৩।

সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ—
বুদ্ধদেব, কলিকাতা ১৯০৪।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—
বৌদ্ধধর্ম।

আশা দাশ—
বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি ১৯৬৯।

নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—
মৌর্যযুগের ভারতীয় সমাজ, ১৯৪৫।

অমূল্যচন্দ্র সেন—
বুদ্ধকথা, ১৯৫৫।

নীহাররঞ্জন রায়—
প্রাচীন বাংলার দৈনন্দিন জীবন, ১৩৫৬।

ধর্মানন্দ কোসম্বী—
ভগবান বুদ্ধ।

সুকুমার দত্ত—
মহাপরিনিব্বাণ সুত্ত, বঙ্গানুবাদ।

বেণীমাধব বড়ুয়া—
(১) মধ্যম নিকায়, ১ম খণ্ড, বঙ্গানুবাদ।

ধর্মাধার মহাস্থবির—
মধ্যম নিকায়, ২খণ্ড, বঙ্গানুবাদ।

বেণীমাধব বড়ুয়া—
বৌদ্ধ পরিণয় পদ্ধতি।

অঘোর নাথ গুপ্ত—
শাক্যমুনিচরিত ও নির্বাণতত্ত্ব, ১৩৩৪।

ধর্মপাল ভিক্ষু—
জাতক নিদান।

Malalasekera—
Dictionary of Pali Proper Names, Vols I & II.

J. Hastings—
Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. 8

Devaprrsad Guha—

Marriage in Buddhist Literature, (Presidency College Magazizne, 1935-37)

B C Law—

Buddhist Bhikshunis in Inscriptions (Epigraph ca Indica , Vol XXV)

A C Gopani—

Female education as evidenced in Buddhist Literature (N I. A , Vol 3)

S. Dutta—

Buddhist Nuns of India, March of India, Aug 1956

Miss P. C Dharma—

Status of Women during Epic Period, J I H 1949.

সুকুমার সেনগুপ্ত —

উপক্রমণিকা (ধর্মাধার মহাস্থবিরের মিলিন্দপ্রশ্ন)

অশোক কুমার মুখোপাধ্যায় —

অবেস্তীয় সমাজে নারীর স্থান (আদ্যাপীঠ মাতৃপূজা, ১৯৮৮ ;)

সুকুমার সেনগুপ্ত —

বৌদ্ধভারতে নারীর স্থান (সবিতা, ১৯৪০-৪১)

অশোক কুমার মুখোপাধ্যায় —

শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিতে নারী (স্বরবৃত্ত, ১৩৯৬)

ঈশান চন্দ্র ঘোষ—জাতক

পদ্মাতত্ত্ব (বঙ্গানুবাদ জাতক-১ম ৬ষ্ঠ খণ্ড)

আশা রায়—

বৌদ্ধধর্ম প্রসঙ্গে, ১৩৭০।

শ্রীসুকুমার সেন —

রামকথার প্রাক্-ইতিহাস, ১৯৭৭।

বিষয়-সূচী

শুদ্ধিপত্র

লাইন	পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৩	৯	মল্লিকাকে	বাসভক্ষীয়বাকে
১৯	১৩	পুস্তকাভয়	পাণ্ডুকাভয়
৫	১৭	বিহাহ	বিবাহ
১২	১৭	গত্যন্তর	পত্যন্তর
১২	১৭	গত্যন্তর	পত্যন্তর
২০	২০	বৈষম্য	বৈধব্য
৪	৬৯	গদ্রুধম্মা	গরুধম্মা